
মৃত্তিকার মৃত্যু
অভিরূপ সরকার

মৃত্তিকার মৃত্যু

মৃত্তিকার মৃত্যু

অভিরূপ সরকার

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দীপ
MRITTIKAR MRITYU
by Abhirup Sarkar
রচনাকালঃ ২৮ মে ২০২২ - ১৭ অগস্ট ২০২৩
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৪
প্রচ্ছদ সুরজিৎ চৌধুরী
প্রকাশক শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

আমার মাসতুতো ভাই
শ্রীজিৎ মল্লিককে
যার সঙ্গে ডিটেকটিভ গল্প পড়তে শুরু করেছিলাম

ঋণ স্বীকার

এই উপন্যাসের প্রাথমিক খসড়ায় যেসব ফাঁক-ফোকর ছিল, নানা সুজনের পরামর্শে সেগুলি ভরাট করার চেষ্টা করেছি। পাণ্ডুলিপি পড়ে যাঁরা সুপরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের তালিকাটি বিরাট, তাই বিশদে জানানোর অবকাশ নেই, তবু তার মধ্যে মহুয়া সেনগুপ্ত এবং অগ্নিরূপ সরকারের কথা না বললেই নয়। সুপরামর্শদাতাদের প্রতি আমার ঋণ অপরিশোধ্য। এবং এত সুপরামর্শ সত্ত্বেও যেসব ত্রুটি রয়ে গেল, তার দায়, বলাই বাহুল্য, আমার নিজের।

টের পাই, ফরাসি ঔপন্যাসিক জর্জ সিমেনো আমাকে অনেক দিন ধরে প্রভাবিত করছেন। সিমেনো যেমন তাঁর ডিটেকটিভ চিফ ইন্সপেক্টার মেগ্রে-র চোখ দিয়ে নিবিড়ভাবে প্যারিস শহর ও তার আশেপাশের গ্রামাঞ্চলকে দেখেন, আমিও তেমনি আমার গোয়েন্দা আদিত্য মজুমদারের চোখ দিয়ে কলকাতা ও তার সংলগ্ন মফস্বলকে দেখবার চেষ্টা করেছি। সিমেনোর যেমন প্যারিস, আমার উপন্যাসগুলির অন্যতম প্রধান চরিত্র কলকাতা। সিমেনোর উপন্যাসগুলির কাছে আমার ঋণের কথা লিপিবদ্ধ থাকুক।

পরিশেষে জানাই, এই নিয়ে আমার পাঁচটি গোয়েন্দা-গ্রন্থ প্রকাশ করে দীপ প্রকাশন আমাকে ঋণী করেছেন। এই প্রকাশন সংস্থার আনুকূল্য ছাড়া আমার পক্ষে গোয়েন্দা কাহিনি লিখে যাওয়া সম্ভব হতো না ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

একটা জলভরা মেঘ খুব ধীরে ধীরে আকাশ পেরোচ্ছিল। এক ঝলক দেখলে মনে হবে সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তবেই তার যাত্রা টের পাওয়া যায়। তার গতি পুব থেকে পশ্চিমে। পুবে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, পশ্চিমে বিবাদী বাগ। মাঝে বিপিনবিহারী গাংগুলি স্ট্রিট, অর্থাৎ বউবাজার। জনাকীর্ণ, কর্মচঞ্চল, কোলাহলময়। বউবাজারের ওপর দিয়ে মেঘটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। এত লোক রাস্তায় অথচ মেঘটাকে কেউ খেয়াল করছে না। করতেই পারত। হলুদ রোদ্দুরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে রাস্তা জুড়ে লম্বা ছায়া ফেলছে মেঘটা। সারা বিকেল আদিত্য মেঘটার ওপর নজর রাখছে।

এখন চৈত্র মাস। ভরা গ্রীষ্ম। দুপুরে শহরটা ঝলসে যাচ্ছিল। বিকেলের দিকে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। শুধু মেঘটার জন্যে নয়। কয়েক বার গঙ্গার দিক থেকে দমকা হাওয়া এসেছিল। হয়ত সন্ধের মুখে দু'এক পশলা বৃষ্টি নামবে। কালবৈশাখী।

আদিত্যর হাতে কাজ নেই। তিন-চার মাস ধরেই নেই। তবু অভ্যাসবশত আপিসে এসে সন্ধে অব্দি বসে থাকে। বই পড়ে। ইন্টারনেটে দেশ-বিদেশের খবর কাগজ। ইউ টিউবে গান। আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারলে ভাল হতো। সঙ্গে ছাতা নেই। বৃষ্টি নেমে গেলে ভিজতে হবে। কিন্তু দুপুরবেলা আদিত্যর বন্ধু গৌতম ফোন করেছিল। বলল, একজনকে পাঠাচ্ছি, একটু সাহায্য করিস। আর বিশেষ কিছু বলল না। কাকে পাঠাচ্ছে, কেন পাঠাচ্ছে, যাকে পাঠাচ্ছে সে কখন আসবে, কিছু না। শুধু বলল, মিটিং আছে, পরে কথা হবে। গৌতম এখন লালবাজারের ব্যস্ততম পুলিশ-কর্তাদের একজন। মন্ত্রীদের নেকনজরে।

সেই থেকে আদিত্য ঠায় বসে আছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামল। দু'বার কফি খাওয়া হল। তিনবার সিগারেট। সিগারেটটা কিছুতেই ছাড়া যাচ্ছে না। তবে বাড়িতে সিগারেট খাওয়া বন্ধ। কেয়া ভীষণ রাগারাগি করে। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই আদিত্য আপিসেই রেখে যায়। বাড়ি ফেরার সময়, ইস্কুলে পড়া বালক ধূমপায়ীদের মতো, চুয়িংগাম চিবিয়ে বাড়িতে ঢোকে।

কালো মেঘ পশ্চিম আকাশটা দখল করে নিয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার যাতায়াত বাড়ছে।

আদিত্য আবার কফির জল বসাবে কিনা ভাবছিল, দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল। মাস চারেক হল ওটা লাগানো হয়েছে। কেয়া বলে, কলিং বেলটা অপয়া । আপিসের দরজায় ওটা লাগানোর পর থেকে একটা মক্কেলও আসেনি। আজ হয়ত কলিং বেলের সেই দুর্নাম ঘুচবে। আদিত্য দরজা খুলে দেখল, মক্কেল-টক্কেল নয়, বাড়িওলার কর্মচারী বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছে। গতকাল আসার কথা ছিল, তাই চেকটা লেখাই রয়েছে। সেটা এনে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে যাবে এমন সময় আদিত্য খেয়াল করল কর্মচারীটির পেছনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। বেশ লম্বা, ছিপছিপে, করিডরের আধো-অন্ধকারে মুখটা ভাল করে বোঝা যায় না। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে লোকটা আদিত্যর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

‘কিছু বলবেন?’ কর্মচারী চেক নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ানোর পর আদিত্য লোকটাকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি। বলছি।' এইটুকু বলেই লোকটা চুপ করে গেল ।

আদিত্য লোকটাকে ভাল করে দেখছে। করিডোরের অন্ধকারটা খানিক চোখ-সওয়া হয়ে এসেছে তার। লোকটাকে দেখে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। গালে তিন-চারদিনের না-কামানো দাড়ি, মাথার চুল অবিন্যস্ত,

চোখের তারা দুটো ঘন ঘন দিক-বদল করছে। পাগলদের যেমন হয়। অথচ পরনের জামা-প্যান্ট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এমন কি দামীও বলা যায়। লোকটা পাগল হলেও ঠিক রাস্তার পাগল নয়।

'আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?' আদিত্য আবার জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। খুঁজছি। আদিত্য মজুমদারকে খুঁজছি।' লোকটা তাড়াতাড়ি বলে উঠল। যেন তার উপস্থিতির কৈফিয়ত দিচ্ছে। তারপর আদিত্যর দরজায় সাঁটা নেমপ্লেটটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এটাই তো আদিত্য মজুমদারের অফিস?'

'আমিই আদিত্য মজুমদার। এটাই আমার অফিস। আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন। ভেতরে আসুন।' আদিত্য দরজাটা আর একটু খুলে একপাশ হয়ে দাঁড়াল, যাতে লোকটা ঢুকতে পারে।

একটু পরে, যখন লোকটা পিঠ টানটান করে আদিত্যর উল্টোদিকের চেয়ারে এগিয়ে বসেছে, তার পিঠ এবং চেয়ার ঠেসানের মধ্যে অন্তত তিন ইঞ্চির দূরত্ব, একটা বিদ্যুতের সুতো পশ্চিম আকাশটাকে আদ্যোপান্ত চিরে দিয়ে মিলিয়ে গেল। আর তার দু'তিন সেকেন্ড পরে কান ফাটানো মেঘের গর্জন। আকাশের দেবতা বিলক্ষণ চটেছেন। আদিত্য তার চেয়ারে না বসে তাড়াতাড়ি গিয়ে জানলার দুটো পাল্লা বন্ধ করে দিল। মনে হয় এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে।

'বলুন, কী ব্যাপার। আমাকে কেন খুঁজছেন?' আদিত্য নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বলল।

'আমাকে অ্যাডিশানাল কমিশানার গৌতম দাশগুপ্ত সাহেব পাঠিয়েছেন। বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করে আমার সমস্যাটা বলতে। বললেন, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন ।

আদিত্য উত্তর না দিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। আরও তথ্যের জন্য অপেক্ষা করছে।

'এক গ্লাশ জল হবে? গলাটা শুকিয়ে গেছে।' লোকটা কুণ্ঠিত গলায় বলল। আদিত্য বুঝতে পারছে না জল চাওয়া নিয়ে এত কুণ্ঠা কেন। জল এনে দিয়ে সে লোকটাকে বলল, 'আপনি আপনার সমস্যাটা ভাল করে বলুন। না হলে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারব না।'

'আমি ঠিক গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। সব এলোমেলো হয়ে যায়। আচ্ছা ইন্টারনেটে আপনার যে ফোন নম্বরটা দেওয়া আছে সেটা বোধহয় বদলে গেছে। তাই আসার আগে ফোন করতে পারিনি।' লোকটা আবার চুপ করে গেল। তাকে অসহায় দেখাচ্ছে।

আদিত্য অবশ্যই মোবাইল নম্বরটা বদলেছে। তার মনে পড়ে গেল ইন্টারনেটের কোনও কোনও সাইটে এখনও তার পুরোনো নম্বরটা রয়ে গেছে। সে লজ্জিতভাবে বলল, 'হ্যাঁ নম্বরটা বদলেছে। কিন্তু কোথাও কোথাও পুরোনো নম্বরটাই রয়ে গেছে। ভেরি সরি।'

লোকটা আর কোনও কথা বলছে না। ঘরে স্তব্ধতা।

'কফি খাবেন?' ঘরের আবহাওয়াটা সহজ করার উদ্দেশ্যে আদিত্য বলল। 'কফি? হ্যাঁ, তা...' লোকটা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছে।

আদিত্য উঠে গিয়ে কফির জল বসাতে বসাতে লোকটাকে দেখছিল। ফরসা রঙ পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ নাক, ভাসা ভাসা চোখ। আদিত্য আন্দাজ করল লোকটার বয়েস বছর চল্লিশ হবে। মনে হয়, এক সময় রীতিমত সুপুরুষ ছিল।

বাইরে কুপকুপে অন্ধকার। চারদিক তোলপাড় করে বৃষ্টি নেমেছে। জানলায় বউবাজার স্ট্রিটের ঝাপসা অবয়ব। আদিত্য তন্ময় হয়ে বৃষ্টি দেখছিল। বৃষ্টি দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল লোকটা ঘরে রয়েছে। দু'কাপ কফি বানিয়ে ফের নিজের চেয়ারে ফিরে এসে আদিত্য বলল, "আমি বরং আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি উত্তরগুলো থেকে আপনার সমস্যাটা বুঝে নেব।'

লোকটা কিছু বলল না । প্রশ্ন শোনার জন্যে সরাসরি আদিত্যর মুখের দিকে তাকাল ।

'আপনার নাম কি?' আদিত্য পেন-নোটবই খুলে জিজ্ঞেস করল।

'আমার নাম অশনি রায়।'

'কোথায় থাকেন ?'

'সাদার্ন অ্যাভিনিউ। সাদার্ন অ্যাভিনিউ আর ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ের কাছে। মানে ওই শরৎ বোস রোড, মানে ল্যান্সডাউন রোডটা যেখানে সাদার্ন অ্যাভিনিউতে গিয়ে পড়েছে তার খুব কাছে।'

'কী করেন?'

প্রশ্নটা শুনে লোকটা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আগে একটা চাকরি করতাম। এখন কিছু করি না।'

'কী চাকরি করতেন ?

'একটা বিদেশি ব্যাঙ্কে চাকরি করতাম।'

'কলকাতায়?'

'হ্যাঁ, এই কলকাতাতেই। সল্ট লেকে আমার অফিস ছিল।'

'চাকরি ছেড়ে দিলেন কেন?'

'চাকরি করা সম্ভব ছিল না।'

'কেন সম্ভব ছিল না? দেখুন, সব কথা আমাকে খুলে না বললে আমি আপনাকে কী করে সাহায্য করব?' শেষের কথাগুলো আদিত্য যথাসম্ভব নরম গলায় বলল। লোকটা আবার অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর থেমে থেমে বলল, 'সম্ভব ছিল না কারণ গত তিন বছর আমি জেলে ছিলাম।'

আদিত্য এই উত্তরটার জন্যে মোটেই তৈরি ছিল না। সে খানিকটা থতমত খেয়ে গেছে। খেই হারিয়ে সে কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। বৃষ্টির বেগ একই রকম আছে। ঝড়জলের মধ্যে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে একটা ট্র্যাম চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর দিকে চলে গেল। দমকা হাওয়ায় জানলার একটা পাল্লা হঠাৎ খুলে গেছে। তবে বৃষ্টির ছাঁট অন্য দিকে বলে ঘরে জল ঢুকছে না। শুধু হাওয়ারা দৌড়ে দৌড়ে এসে টেবিলের কাগজপত্র তছনছ করে দিয়ে যাচ্ছে। আদিত্য একটা বইএর নিচে আলগা কাগজগুলো চাপা দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। ঠাণ্ডা হাওয়াটা তার ভাল লাগছে। সে জানলাটা বন্ধ করতে চাইছে না।

'আপনি কেন জেলে ছিলেন? ব্যাঙ্কের টাকাপয়সায় গন্ডগোল হয়েছিল?' আদিত্য সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল।

'না, না। ব্যাঙ্কের কোনও ব্যাপার নয়। একটা খুনের দায়ে আমাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। একটা নয়, দুটো খুন হয়েছিল। তার মধ্যে একটা খুন নাকি আমি করেছিলাম। এর সঙ্গে আমার চাকরির কোনও সম্পর্ক ছিল না। আসলে আমি খুন করিনি। আই ক্যান সোয়্যার টু গড় আমি খুন করিনি। অথচ লোয়ার কোর্ট আমাকে দোষী সাব্যস্ত করল। তারপর হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে কেস ওঠার পর আমি বেকসুর খালাস হয়ে গেলাম। তবে শুনতে পাচ্ছি, পুলিশ নাকি খুব শিগগির ডিভিশন বেঞ্চে অ্যাপিল করবে। ইতিমধ্যে কিন্তু আমার তিন বছর জেল খাটা হয়ে গেছে।' অশনি রায়কে খুব অসহায় দেখাল ।

আদিত্য রীতিমত বিভ্রান্ত। 'আপনি খুন করেননি অথচ খুনের দায় আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল?'

'আমি একটি মেয়েকে চিনতাম। তার নাম রূপলেখা। রূপলেখা দত্ত। সে খুন হয়নি। আর একজন খুন হয়েছিল। তার নাম মৃত্তিকা মিত্র। তার সঙ্গে তার স্বামী পার্থ মিত্রও খুন হয়েছিল। স্বামীকে আমি চিনতাম না। এই মৃত্তিকা মিত্রকে খুব সামান্য চিনতাম। ব্যাঙ্কের কাজের সূত্রে দু'একবার কথা হয়েছিল। আমাকে মৃত্তিকা মিত্রর স্বামীর খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে দেওয়া হল। বলা হল রূপলেখা দত্তর আসল নাম মৃত্তিকা মিত্র।' অশনি রায়কে এখনও খুব বিপন্ন দেখাচ্ছে।

বলাই বাহুল্য, লোকটা কী বলতে চাইছে আদিত্য এক বর্ণও বুঝতে পারেনি। শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছে সুসংহত কোনও বর্ণনা দেওয়া অশনি রায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। টুকরো টুকরো করে ব্যাপারটা জানতে হবে। সে বলল, 'রূপলেখা দত্ত বলে যাকে আপনি চিনতেন তার সঙ্গে আপনার কোথায় আলাপ হয়েছিল?'

'কোথায়? কেন ব্যাঙ্কে? আমি তখন ক্রেডিট-এর চার্জে ছিলাম। রূপলেখা একটা লোন নিতে চাইছিল। পঞ্চাশ লাখ টাকার ক্যাশ ক্রেডিট। রূপলেখার একটা বিউটি পার্লার ছিল। সেটাকে এক্সটেন্ড করতে চাইছিল। তার জন্যে লোন। ওটার ব্যাপারে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

'ক্যাশ ক্রেডিট মানে?

'মানে, পঞ্চাশ লাখের লিমিট। কোনও সময় তার থেকে বেশি ধার নিতে পারবে না। মাঝে মাঝে ধার কিছুটা শোধ করে দিলে পরে আবার সেই অ্যামাউন্টটা ধার নিতে পারবে। কিন্তু টোটাল আউটস্ট্যান্ডিং লোন কখনই পঞ্চাশ লাখ ক্রস করবে না।'

আদিত্য টের পেল চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেলেও অশনি রায় তার পুরোনো পেশার খুঁটিনাটিগুলো ভোলেনি। সে খেই ধরিয়ে দেবার জন্য বলল, 'তার মানে ওই ক্যাশ ক্রেডিটের ব্যাপারে রূপলেখা দত্ত আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসত।'

"ঠিক তা নয়। লোনটার ব্যাপারে রূপলেখা আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। ওটা নিয়ে ওর সঙ্গে একবার দু'বার কথা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত লোনটা কিন্তু রূপলেখা নেয়নি। আমাকে পরে বলেছিল যে স্পেসটায় ও বিউটি পার্লারটা এক্সটেন্ড করার কথা ভাবছিল, সেই স্পেসটাই পাওয়া যায়নি। জায়গাটার মালিক ওই জায়গাটা কোনও কারণে ভাড়া দিতে চায়নি। তাই রূপলেখাও আর শেষ পর্যন্ত লোনের অ্যাপ্লিকেশনটা করেনি।'

"তার মানে রূপলেখা দত্ত আর আপনাদের ব্যাঙ্কে আসতেন না?'

'না। লোনই যখন নেবে না, ব্যাঙ্কে আসবে কেন?'

'তাহলে আপনাদের ঘনিষ্ঠতা হল কী করে? আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে,

রূপলেখা দত্তর সঙ্গে আপনার একটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।'

'তা তো অবশ্যই হয়েছিল।'

'কী করে?'

'প্রথম দেখা হবার কিছুদিন পরে একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছে, রাত্তির প্রায় ন'টা বেজে গেছে, আমি ব্যাঙ্ক থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি, বাড়ি ফিরবো, দেখি রূপলেখা বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে। সল্ট লেকে এমনিতেই রাত্তিরের দিকে বাস-ট্যাক্সি কিছু পাওয়া যায় না, তার ওপর বৃষ্টি, আমি রূপলেখাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কোথায় যাবে। আমি তাকে রাইড দিতে পারি কিনা।'

অশনি রায়কে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন একটা পুরোনো স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

'তারপর?'

'রূপলেখা বলল, তার পার্লারটা আমাদের ব্যাঙ্কের খুব কাছে। এখান থেকে বাড়ি ফিরতে তারও সাড়ে আটটা ন'টা বেজে যায়। কিন্তু তার গাড়িটা ক'দিন হল গ্যারেজে গেছে। তার ওপর এই বৃষ্টি। বলল, একটু এগিয়ে সিটি সেন্টারের দিকে পৌঁছে দিলে সে একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাবে। তাকে কোথায় যেতে হবে বলল না।'

'আপনি রূপলেখা দত্তকে সিটি সেন্টার অব্দি পৌঁছে দিলেন?'

'না, সিটি সেন্টার অব্দি নয়, বাইপাসে চিংড়িহাটার মোড় অব্দি। সাধারণত সিটি সেন্টারে দু'তিনটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু সেই রাত্তিরে একটাও ছিল না। অত রাত্তিরে একজন ভদ্রমহিলাকে রাস্তায় ছেড়ে দেব কী করে? বললাম, আপনাকে আমি বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিই? রূপলেখা ইতস্তত করছিল। কিন্তু এদিকে বৃষ্টি ক্রমশ বেড়ে চলেছে, অত বৃষ্টিতে ট্যাক্সি পাওয়া সম্ভব ছিল না। শেষে বলল, আমাকে বাইপাস অব্দি পৌঁছে দেবেন? ওখান থেকে নিশ্চয় একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাব।'

লোকটা থামল। নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গেছে। উত্তেজিত। বিড়বিড় করছে। আদিত্য লোকটাকে একটু শান্ত হতে সময় দিল। বাইরে বৃষ্টির বেগ কমে এসেছে। বৈশাখী বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না। তবে দমকা হাওয়াটা এখনও রয়েছে।

'সেই রাত্তিরে যদি আমি রূপলেখাকে সাহায্য করার জন্যে গাড়ি না থামাতাম তা হলে আমার জীবনটা অন্য রকম হয়ে যেত।' অশনি রায় আবার নিজের থেকেই কথা বলতে শুরু করেছে। 'কী করা যাবে? আমার কপাল।' লোকটা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।

আদিত্য অপেক্ষা করছে, অশনি রায় কখন কথা বলতে শুরু করবে। সে অনেকক্ষণ চুপ করে আছে দেখে আদিত্য বলল, 'আপনার সঙ্গে রূপলেখা দত্তর আবার কবে যোগাযোগ হল ?'

'আমি নিজেই পরের দিন যোগাযোগ করলাম। রূপলেখা আমাকে তার ফোন নাম্বারটা দিয়েছিল। আমিও তাকে আমার ফোন নাম্বারটা দিয়েছিলাম। আমি দুপুরে লাঞ্চের আগে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম, সে ঠিক আছে কিনা ।

'মানে, আপনি জানতে চাইলেন ট্যাক্সি তাকে ঠিকঠাক বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল কিনা।'

'সেটা আপনি ঠিকই বলেছেন। ঠিক না থাকার কোনও কারণ ছিল না। এবং তারই উচিত ছিল আমাকে একটা ফোন করে ধন্যবাদ দেওয়া। ইন ফ্যাক্ট, আমি সারা সকাল রূপলেখার ফোনের জন্যে হন্যে হয়ে অপেক্ষা করছিলাম।'

'তার কাছ থেকে ফোন না পেয়ে আপনিই তাকে ফোন করলেন?'

'হ্যাঁ। ফ্যাক্ট ইজ, আই গট গড ড্যাম অ্যাট্র্যাক্টেড টু হার। শি হ্যাড দ্যাট সিডাকটিভ চার্ম হুইচ অ্যাট্রাক্টস মেন। তাছাড়া এর কিছুদিন আগে আমার একটা সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল। আমি মানসিকভাবে ভীষণ ভালনারেবল অবস্থায় ছিলাম।'

অশনি রায় আবার চুপ করে গেল। আদিত্য বলল, "তারপর?'

'আমি ফোন করতে রূপলেখা অনেকক্ষণ ধরে ক্ষমা চাইল। বলল, তারই ফোন করে ধন্যবাদ দেবার কথা। কিন্তু সারা সকাল এত বেশি ক্লায়েন্টদের প্রেশার ছিল যে মুখ তুলতে পারেনি। তারপর বলল, যদি আমার আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ খেতে পারি। আমি অবভিয়াসলি রাজি হয়ে গেলাম। রূপলেখা বলল, রাজারহাটের অ্যাক্সিস মল ছাড়িয়ে মিনিট দশেক ড্রাইভ করলে রাস্তার বাঁ দিকে একটা ক্যাফে হয়েছে। নাম, সল্ট অ্যান্ড পেপার। ওখানে সে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।' 'রাজারহাটের অ্যাক্সিস মল ছাড়িয়ে? সে তো অনেকটা দূরে? অত দূরে কেন?" 'আমারও এটা মনে হয়েছিল। পরে কারণটা বুঝেছিলাম। রূপলেখা যে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে যাচ্ছে এটা ও কাউকে জানাতে চায়নি। মানে আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে কেউ দেখে ফেলুক এটা ও চায়নি। কারণ ওর একজন স্বামী ছিল। অবশ্য স্বামীর সঙ্গে ওর একেবারেই বনিবনা ছিল না। ওই যে ক্যাফেটার কথা ও বলেছিল সেটা বেশ নির্জন একটা জায়গায় । আমারও ওই জায়গাটা স্যুট করেছিল। আমি তখনও জানতাম রূপলেখা আমাদের একজন ক্লায়েন্ট। একজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া অবস্থায় অফিসের কেউ দেখে ফেললে আমার অসুবিধে হতো। বিজনেস লাঞ্চ এক জিনিস। কিন্তু ওটা তো ঠিক বিজনেস লাঞ্চ ছিল না।'

অশনি রায় আবার চুপ করে গেল। দম দেওয়া গ্রামাফোনে দম ফুরিয়ে গেলে যেমন হয়।

খেই ধরিয়ে দেবার জন্য আদিত্য বলল, 'তারপর? তারপর কী হলো?"

'এর পরে অনেকবার আমরা ওই ক্যাফেটাতে গিয়েছিলাম। ক্যাফের ভেতরটায় কখনও দু'চারজনের বেশি দেখিনি। সবই কাপল। কেউ কাউকে খেয়াল করছে না। নিজেদের মধ্যেই মশগুল হয়ে আছে। আর আমরা ঠিক করেছিলাম ব্যাঙ্কের ভেতর দেখা হয়ে গেলেও একজন অন্যজনকে না চেনার ভান করব। পরে ব্যাঙ্কে রূপলেখাকে আমি দু'একবার দেখেওছিলাম, কিন্তু কখনও কথা বলিনি।'

'তারপর?'

'তারপর ধীরে ধীরে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। আমি রূপলেখার সঙ্গে থাকলে খুব শান্তি পেতাম। শি ওয়াজ সো টিমিড। নেভার ওয়ান্টেড এনিথিং ফ্রম মি। কোনও দিন একটা গিফট পর্যন্ত নেয়নি। বলত, তোমার সঙ্গে থাকাটাই আমার গিট্। আমার আগের বান্ধবীর একেবারে উল্টো। আমার আগের বান্ধবী এক্সপেক্ট করত রোজ আমি ওর জন্যে খুব দামি কোনও উপহার নিয়ে যাব। দামি মানে সত্যিকারের দামি। অল্পসল্প জিনিসে ওর মন উঠত না। সেদিক থেকে রূপলেখা ছিল আ ব্রেথ অফ ফ্রেশ এয়ার।'

রূপলেখা দত্তর বিউটি পার্লারটা কোথায় ছিল?'

'সল্ট লেকের একটা কোথাও। আমাদের অফিসের কাছে।'

'আপনি সেখানে কখনও গিয়েছিলেন ?'

'না। কখনও যাইনি। রূপলেখাই বারণ করেছিল। আমাদের সম্পর্কের কথা ওর পার্লারের কেউ জানুক এটা ও চায়নি।'

অশনি রায় আবার চুপ করে গেছে।

'তারপর কী হল? আপনি বললেন ধীরে ধীরে আপনাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল, তাই তো?' আদিত্য অশনি রায়কে মনে করিয়ে দিতে চাইছে।

'দেখুন, তিন বছর জেলে থাকার পর আমার কিছু মেন্টাল প্রবলেম হয়েছে। বেশিক্ষণ কনসেনট্রেট করতে পারি না। আমার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। এখন সেই যন্ত্রণাটা শুরু হচ্ছে। আমার পক্ষে আর বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলি, আই অ্যাম ইনোসেন্ট। গৌতম দাশগুপ্ত সাহেব বিশ্বাস করেন আই অ্যাম ইনোসেন্ট। তাই উনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আই শ্যাল রিমেন গ্রেটফুল যদি আপনি আমার কেসটা নেন। আপনার যা ফিজ আমরা দেব। আমরা মানে আমার বাবা দেবেন। আমার বাবার নাম আর ফোন নাম্বার আমি লিখে এনেছি।' অশনি রায় পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর চোখ বুজে টেবিলে মাথা রাখল। একটানা অতগুলো কথা বলে গিয়ে সে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

মিনিট পাঁচেক ওইভাবে থাকার পর লোকটা দাঁড়িয়ে উঠে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটা কথাও আর বলল না।

আদিত্য কী করবে বুঝতে পারছে না।

(২)

লোকটা চলে যাবার পর মিনিট পাঁচেক চুপ করে বসে রইল আদিত্য। একবার গৌতমের নম্বরটা লাগাল। ফোনটা বেজে বেজে থেমে গেল। নিশ্চয় সাইলেন্ট মোডে দিয়ে গৌতম দরকারি মিটিং করছে। একটু পরে গৌতম মেসেজ পাঠাল, মিটিং চলছে। রাত্তিরে ফোন করব।

টেবিলের ওপর রাখা চিরকুটটার দিকে আদিত্যর নজর পড়েছে। চিরকুট নয়, একটা ভিজিটিং কার্ড। লেখা রয়েছেঃ ডাঃ অসীমাভ রায়, কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট, এম ডি (ক্যাল), এম আর সি পি (লন্ডন)। কার্ডের ওপরের ডান দিকে দুটো ঠিকানা লেখা। ওপরেরটা চেম্বারের, ঠিকানাটা হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের। তার নিচে শরৎ বোস রোডের বাড়ির ঠিকানা। তারও নিচে ল্যান্ডলাইন এবং মোবাইল নম্বর। আদিত্যর মনে হল, ডাঃ অসীমাভ রায় নামটা সে আগে শুনেছে।

বাইরে এখনও বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। খুব জোরে নয়, তবে ভিজিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। অর্থাৎ এক্ষুনি বেরোনো যাবে না। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আদিত্য ভিজিটিং কার্ডে লেখা মোবাইল নম্বরটা ডায়াল করল। ফোনটা বেজেই যাচ্ছে। আদিত্য তবু ধরে আছে। ঠিক করেছে, যতক্ষণ না ফোনটা কেটে যাচ্ছে ততক্ষণ ধরে

থাকবে। একবারে শেষ মুহূর্তে, সম্ভবত কেটে যাবার ঠিক আগে, একটি মহিলা ফোন ধরলেন। ‘ডক্টর রায়েজ চেমবার। মে আই হেল্প ইউ?' ইংরেজি উচ্চারণে জড়তা নেই, আবার অনর্থক সাহেবিপনাও নেই।

‘ডক্টর রায়ের সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?' আদিত্য বাংলাতেই বলল । ‘উনি পেশেন্ট দেখছেন। এখন কথা বলা সম্ভব নয়।' মহিলার গলাটা খুব একটা উৎসাহব্যাঞ্জক শোনাল না।

আদিত্যর ভয় হল এক্ষুনি বুঝি উনি ফোনটা কেটে দেবেন। সে তাড়াতাড়ি বলল, ‘আমি একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে ফোন করেছিলাম। ব্যাপারটা খুব আরজেন্ট। ওঁর ছেলে সংক্রান্ত।'

ওদিকে কিছুক্ষণ নীরবতা। আদিত্য মনে মনে দেখতে পেল ভদ্রমহিলা ফোনটা হাতে ধরে ভুরু কুঁচকে ভাবছেন। অবশেষে তাঁর সাড়া পাওয়া গেল। ‘একটু ধরুন, আমি দেখছি।'

আদিত্য ফোন ধরে আছে তো ধরেই আছে, ওপারে সাড়াশব্দ নেই। এরা তার কথা ভুলে গেল নাকি? ফোনটা রেখে দিয়ে আবার ফোন করবে? বাইরে বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে। বৃষ্টির জন্যে যারা এতক্ষণ আটকে পড়েছিল, তারা বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। লোক থইথই বউবাজার। উল্টোদিকের চায়ের দোকানে আপিস-ফেরত বাবুরা ভিড় করে খাচ্ছে। খোলা জানলা দিয়ে চপ-কাটলেট ভাজার গন্ধ ভেসে আসছে। সেই গন্ধে আদিত্যর খিদে পেয়ে গেল। এরা কোবরেজিটা বেশ করে। বাড়ির জন্যে দুটো কোবরেজি নিয়ে গেলে কেমন হয়? কেয়া কি খুব রেগে যাবে? ইদানীং কেয়া খুব স্বাস্থ্য-সচেতন হয়েছে।

হঠাৎ ওপার থেকে সাড়া পাওয়া গেল। ‘আমি ডক্টর অসীমাভ রায় বলছি। কী ব্যাপার বলুন?' রাশভারি গলা। কোবরেজির মধুর চিন্তা থেকে কঠিন বাস্তবে ফিরে আসতে আদিত্যর কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল।

‘আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। আমার নাম আদিত্য মজুমদার। আপনার ছেলে অশনি রায় একটু আগে আমার কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছিলেন। কিন্তু ওঁর সমস্যাটা কী ভাল করে বলার আগেই উনি খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে আমার অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে আপনার ফোন নম্বরটা দিয়ে বলে গেলেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তাই ফোন করছি।'

‘আপনার কাছে যাবার কথা আমার ছেলে আমাকে বলেছিল। তবে আজকেই চলে যাবে জানতাম না। আপনার নামই তো অ্যাডিশানাল কমিশানার রেকমেন্ড করেছেন?

‘হ্যাঁ, গৌতম দাশগুপ্ত আমার অনেক দিনের বন্ধু।

‘শুধু অ্যাডিশানাল কমিশানার রেকমেন্ড করেছেন বলে নয়। আপনার কথা আমি খবর কাগজে পড়েছি। আপনার এক্সপার্টিজটা আমাদের খুবই দরকার।'

‘কিন্তু তার আগে তো আপনাদের, মানে আপনার ছেলের সমস্যাটা আমাকে জানতে হবে।'

‘দেখুন, এখন তো আমি পেশেন্ট দেখছি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না। কালও ব্যস্ত থাকব। পরশুদিন রবিবার। রবিবার আমি পেশেন্ট দেখি না। আপনি কি সকালের দিকে আমাদের বাড়িতে একবার আসতে পারবেন? এই ধরুন দশটা নাগাদ। আমার ছেলেও থাকবে।'

‘অবশ্যই যাব।'

‘তা হলে রবিবার দেখা হচ্ছে।' ডাঃ অসীমাভ রায় হঠাৎ ফোন রেখে দিলেন। কারও কারও কোনও ভনিতা না করে হঠাৎ ফোন রেখে দেওয়া স্বভাব।

গৌতম যখন ফোন করল তখন আদিত্যদের রাত্তিরের খাওয়া হয়ে গেছে। কেয়া শোবার ঘরে আই প্যাড স্ক্রোল করছে। আদিত্য পড়ার ঘরে বসে ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখছে অশনি রায় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কিনা।

মাস কয়েক হল কেয়ার একটা আই প্যাড হয়েছে। আদিত্যই দিয়েছে। রাত্তিরে খাবার পর কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেয়া তাতে নানান হাবিজাবি দ্যাখে। ইমেল পড়ে, উত্তর দেয়। রান্নার রেসিপি মুখস্থ করে। ফেসবুকে মন্তব্য করে, লাইক দেয়। কিছু ভিডিও ক্লিপ আসে সেগুলো হাঁ করে দ্যাখে। মাঝে মধ্যে

ইউ টিউবে বাংলা সিনেমাও দ্যাখে। এই সময়টা তার নিজের। আদিত্য তখন পড়ার ঘরে বসে গান শোনে, ক্বচিৎ-কদাচিত সিনেমাও দ্যাখে। সবই পুরোনো হলিউড।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি?' গৌতমের গলাটা প্রফুল্লই শোনাল।

'না, না। এখনই কী ঘুমোবো? সবে তো সাড়ে দশটা।' আদিত্য দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল।

'তোকে আজ খুব বোর করেছি। না বলে-কয়ে একটা পাগল-ছাগল লোককে তোর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আসলে, আমার আজ একদম সময় ছিল না। বসিরহাটের দিকে কাল রাত্তিরে একটা ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম হয়েছে। সেটা কমিউনাল ফিউড-এর দিকে চলে যাচ্ছিল। তাই নিয়ে সারাদিন মিটিং। এই একটু আগে ছাড়া পেলাম। এখনও বাড়ি ফিরতে পারিনি। গাড়িতে।'

'তার মানে তো তুই খুবই টায়ার্ড। তা হলে আজ থাক। কাল সুবিধে মতো আমাকে একটু ব্রিফ করে দিস।'

'আরে না, না। তত কিছু টায়ার্ড নই। গাড়িতে যেতে যেতে তোকে খানিকটা বলি। পরে আরও ভাল করে কথা হবে। প্রথমে বলি, ওই ছেলেটাকে আর একটু পরে, মানে তোকে ভাল করে ব্রিফ করার পর, তোর কাছে পাঠানো যেত। কিন্তু ওর এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, এক্ষুনি একটা মেন্টাল সাপোর্ট না পেলে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যাবে।'

'ওকে দেখে তো মনে হলো একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন অলরেডি হয়ে গেছে। যাই হোক, তুই বল। খানিকটা অবশ্য ওর কাছে শুনেছি। কিন্তু ও কথা শেষ না করেই হঠাৎ বেরিয়ে গেল। বলল, ওর খুব অসুস্থ লাগছে।'

'আমি একটুও অবাক হচ্ছি না। আসলে ছেলেটার ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে। লোকটা না বলে ছেলেটাই বলছি। বয়েস সদ্য চল্লিশ ছুঁয়েছে। দেখে অবশ্য বেশি মনে হয়।

গৌতম থামল। বোধহয় গুছিয়ে নিচ্ছে। আদিত্য টেলিফোনে ভিজে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। গৌতম নিশ্চয় এসি না চালিয়ে গাড়ির জানলা খুলে রেখেছে। বৃষ্টি না থাকলেও দক্ষিণের হাওয়াটা এখনও আছে।

'তিন বছর আগেকার কথা। ভি আই পি বাঙ্গুরের দিকে যে অনেকগুলো ফ্ল্যাটবাড়ি হয়েছে তারই একটাতে তখন সদ্য লোক আসতে শুরু করেছে। বেশিরভাগটাই ফাঁকা। এইরকমই সদ্য-সমাপ্ত, আধফাঁকা একটি বহুতলের ফ্ল্যাটে একটা জোড়া খুনের ঘটনা সেই সময় মিডিয়ায় বেশ হইচই ফেলে দিয়েছিল।'

'এটা কোন মাস তোর মনে আছে?'

'মাসটা ঠিক মনে নেই। তবে সময়টা ছিল শীতকাল। হয় ডিসেম্বর, না হয় জানুয়ারি, আর না হয় ফেব্রুয়ারি। আমার এক্সাক্ট ডেট মনে থাকে না। নিশ্চয় শীতকাল ছিল, কারণ সিসি টিভিতে দেখা গিয়েছিল খুনের জায়গা থেকে অশনি রায় একটা মেরুন সোয়েটার পরে বেরিয়ে আসছে। পরে ওই সোয়েটারটা ওর বাড়ি থেকে পাওয়া গিয়েছিল। ফরেন্সিক পরীক্ষায় সোয়েটারে খুন হওয়া মহিলার রক্তের ছিটেফোঁটারও হদিশ মিলেছিল। তোর কি ঘটনাটার কথা মনে আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঘটনাটার কথা আমার ভালই মনে আছে। আমার যতদূর মনে পড়ছে মাসটা ছিল ফেব্রুয়ারি। আমি তাও ভেরিফাই করে নিলাম। তারপর?'

'খুনটা হয়েছিল রাত্তির এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে, অন্তত পুলিশের তাই অনুমান। সিসি টিভিতে দেখা গিয়েছিল মেন সাসপেক্ট অশনি রায় রাত্তির পৌনে বারোটা নাগাদ খুন হওয়া দম্পতির ফ্ল্যাট থেকে বেরোচ্ছে। তবে পরদিন সকালের আগে খুনের কথা জানা যায়নি। কাজের মাসি খুনটা আবিষ্কার করেছিল। তার কাছে ফ্ল্যাটের একটা চাবি থাকত, কারণ কর্তা-গিন্নির ঘুম থেকে উঠতে দেরি হত। কাজের মাসি সিকিউরিটিকে খবর দেয় এবং সিকিউরিটি পুলিশকে ফোন করে।

‘স্বামী-স্ত্রী, মানে যারা খুন হয়েছিল, তারা কী করত?’

‘স্বামীর একটা ডিসট্রিবিউশনের ব্যবসা ছিল। বিভিন্ন মনিহারি জিনিস বড় বড় কম্পানির কাছ থেকে নিয়ে শহরের ছোট ছোট মনিহারি দোকানে ডিসট্রিবিউট করত। সাবান, তেল, টুথপেস্ট, কেক-বিস্কুট-পাঁউরুটি, এইসব। ব্যবসাটা খুব একটা চলত বলে মনে হয় না। স্ত্রীও যেন কী একটা করত। ছোটখাট কিছু একটা।’

‘এদের নাম?'

‘স্ত্রীর নাম মৃত্তিকা মিত্র, স্বামী পার্থ মিত্র।' ‘অশনি রায়ের সঙ্গে এদের কী সম্পর্ক? '

‘পার্থ মিত্রর সঙ্গে অশনি রায়ের কোনও সম্পর্ক ছিল না। মৃত্তিকার সঙ্গে ছিল বলে পুলিশের অনুমান। বেশ গভীর সম্পর্কই ছিল। গভীর প্রেমের সম্পর্ক। দু'একজন তার সাক্ষী ছিল। অশনি নিজে অবশ্য বলছে একটি মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সে মৃত্তিকা নয়, অন্য একটি মেয়ে। তার নাম রূপলেখা দত্ত। রূপলেখা কিন্তু খুন হয়নি। খুন হয়েছিল মৃত্তিকা মিত্র। অশনি বলছে সে মৃত্তিকা মিত্রকে খুব সামান্যই চিনত। পুলিশের ধারণা অশনি মিথ্যে কথা বলছে। অশনি বলছে সে কোনও খুন করেনি। যাদের সে চিনতই না বা সামান্য চিনত তাদের খুন করবে কেন? সে ঘটনাচক্রে ওখানে গিয়ে পড়েছিল। প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণ কিন্তু অশনির বিরুদ্ধে যাচ্ছে।'

‘অশনি ওখানে গিয়ে পড়ল কী করে?’

‘ওকে নাকি ওই রূপলেখা বলে মেয়েটি ওখানে আসতে বলেছিল। রূপলেখা নাকি বলেছিল তার স্বামী তার ওপর ভীষণ অত্যাচার করছে। অশনি যেন তাড়াতাড়ি এসে ওকে উদ্ধার করে। এই কথা বলে বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ-এর ওই বাড়িটার ঠিকানা দিয়েছিল। যেহেতু রূপলেখার বাড়িতে অশনি আগে কখনও যায়নি, তাই ও ধরে নিয়েছিল ওটাই রূপলেখার আসল ঠিকানা '

‘রূপলেখা কী বলছে?'

‘সেটাই হয়েছে মুস্কিল। ঘটনার পর থেকে রূপলেখার দেখা পাওয়া যায়নি। অতএব অশনি সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে যাচাই করার কোনও উপায় নেই।

‘তাহলে অশনি রায় ছাড়া পেল কী করে?'

‘সঙ্গত প্রশ্ন। মামলা যখন হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে তখন ব্যারিস্টার অরুণকান্তি ব্যানার্জী কেসটা টেক-আপ করেন। তিনি কিছু নতুন এভিডেন্স আদালতে পেশ করলেন। তাছাড়া ওঁর নিজের ক্যারিসমা তো ছিলই। সব মিলিয়ে যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে অশনি রায় ছাড়া পেয়ে গেল। কিন্তু সেটা সাময়িক। পুলিশের ওপর হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে অ্যাপিল করার জন্য প্রচণ্ড পলিটিকাল প্রেশার আছে। আমি এখনও ধরতে পারিনি কেন প্রেশারটা আসছে।'

‘আচ্ছা, কিছুদিন আগে কাগজে যেন দেখলাম ব্যারিস্টার অরুণকান্তি ব্যানার্জী একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। ঠিক বলছি?'

‘একেবারে ঠিক বলছিস। মাসখানেক আগে সকালে গলফ খেলে উনি ক্লাবের সামনে গাড়িতে উঠতে যাবেন এমন সময় একটা লরি এসে ওঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। লরিটাকে ধরা যায়নি। এর মানে হল, অশনি রায়ের কেসটা ডিভিশন বেঞ্চে উঠলে ওর হয়ে লড়ার কেউ নেই। তাই আমি ওকে তোর কাছে পাঠালাম।'

‘তুই এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লি কী করে?'

‘আমি নিজে অশনি রায়কে বেশ কয়েকবার ইন্টারোগেট করেছিলাম। আমার গাট ফিলিং হল, ছেলেটা নির্দোষ। তার ওপর অরুণকান্তি ব্যানার্জীর এই অ্যাক্সিডেন্টটা। এটা কি অ্যাক্সিডেন্ট, নাকি এর পেছনে কোনও ফাউল প্লে আছে? যদি ফাউল প্লে হয় তা হলে এর সঙ্গে অশনি রায়ের কেসটার একটা সম্পর্ক থাকাটা মোটেই আশ্চর্য নয়। তা ছাড়া ডিভিশন বেঞ্চে অ্যাপিল করার জন্যে পুলিশের ওপর এত পলিটিকাল

প্রেশার কেন? যেন অদৃশ্য কোনও শক্তি পুলিশকে নির্দেশ দিচ্ছে অশনি রায়কে দোষী প্রমাণ করতেই হবে। এরকম কেন হবে? সব মিলিয়ে মনে হল সেটা তোর কাছে পাঠানো দরকার। বাই দ্য ওয়ে, অশনির বাবা খুব পশারওলা ডাক্তার। তা ছাড়া ওদের পারিবারিক অবস্থাও বেশ ভাল। তোর যা ফি সেটা তুই চেয়ে নিতে একটুও সংকোচ করিস না।'

'সেটা ঠিক আছে, কিন্তু...।' আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'অশনির বাবার সঙ্গে সামনের রবিবার দেখা করার কথা। দেখা যাক কী হয়।

'আমার মনে হচ্ছে, কেসটা তোর পছন্দ হবে। আর হ্যাঁ। কেসটা সম্বন্ধে তোকে সব থেকে ভাল ধারণা দিতে পারবে ইন্সপেক্টার সুভদ্র মাজি। সে তো তোর চেনা লোক। ও-ই তো কেসটা নিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করেছিল। ওর সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করিস।'

"নিশ্চয় করব। আর কার সঙ্গে কথা বলা উচিত তোর মনে হয়?'

'সব ডিটেল তোকে সুভদ্র বলে দেবে। শোন, আমার বাড়ি এসে গেছে। পরে কথা হবে। ছেলেটাকে একটু সাহায্য করিস। ছেলেটা ইনোসেন্ট। টা টা।'

এখনও বারোটা বাজেনি। সুভদ্র মাজিকে একটা ফোন করা যেতেই পারে। সৈকত চৌধুরির খুনের মামলায় সুভদ্রর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সেই পরিচয় এখন অনেক গাঢ় হয়েছে। সুভদ্রকে আদিত্যর খুব পছন্দ। এমন ভদ্র, বিনয়ী এবং একই সঙ্গে দক্ষ পুলিশ অফিসার খুব বেশি দেখা যায় না। সব থেকে বড় কথা ওর সততা প্রশ্নাতীত। আজকাল সুভদ্র মাঝে মাঝেই আদিত্যর বাড়িতে আসে। টুকিটাকি পরামর্শ নেয় । কেয়াও সুভদ্রকে বেশ পছন্দ করে।

আদিত্য সুভদ্রর নম্বরটা লাগাল। ফোনটা বিজি। এত রাত্তিরে কার সঙ্গে কথা বলছে?

আদিত্য মোবাইল রেখে অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাল। টের পায়নি কখন কেয়া পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আদিত্য ভেবেছিল কেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে।

'শুতে যাবে না? এ কী? সিগারেট ধরিয়েছ?'

'একটা ফোন করে শুতে যাচ্ছি।' সিগারেট ধরানোর ব্যাপারে কিছু না বলাটাই আদিত্য নিরাপদ মনে করল।

'তুমি যে বলেছিলে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছ? আমাকে মিথ্যে বলেছিলে?" কেয়া তীক্ষ্ণ গলায় বলল ।

'ওই মাঝে-সাঝে একটা-দুটো। শুধু চিন্তা করার সময়।'

'এত রাত্তিরে কীসের চিন্তা?'

'একটা কাজ পেয়েছি। আজই একজন মক্কেল এসেছিল।' আদিত্য নিরীহ গলায় বলল।

'কাজ পেয়েছ বলে মনের আনন্দে সিগারেট ধরিয়ে ফেললে?'

ভাগ্যক্রমে ফোনটা বেজে উঠল বলে আদিত্যকে আর এই কঠিন প্রশ্নের উত্তরটা দিতে হল না। ফোনে ইন্সপেক্টার সুভদ্র মাজি।

'সুভদ্র? এত রাত্তিরে ফোন বিজি ছিল কেন?' আদিত্য মোবাইল ধরে বলল। 'অ্যাডিশনাল কমিশানার সাহেব ফোন করেছিলেন। বললেন, আপনি ওই মৃত্তিকা মিত্রর কেসটার ব্যাপারে জানতে চেয়ে ফোন করবেন। আমি যেটুকু জানি আপনাকে যেন সবটা বলি। অ্যাডিশনাল কমিশানার সাহেবের ফোন করার দরকার ছিল না। আপনি জানতে চাইলে আমি এমনিই বলে দিতাম।'

'হ্যাঁ, বুঝেছি। ব্যাপারটা আমার খুব ভাল করে জানা দরকার। তুমি নিশ্চয় জান, খুব শিগগির পুলিশ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে অ্যাপিল করবে। তার আগে একটা থরো ইনভেস্টিগেশন দরকার। তুমি কি এখনও সেটার চার্জে আছ?'

'না, না। অনেক দিন হল কেসটা থেকে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি শুধু প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশনটা করেছিলাম। কেস লোয়ার কোর্টে ওঠার সময় থেকেই আমি কেসটার চার্জে নেই।'

'তোমাকে সরিয়ে দেওয়া হল কেন?'

'সেটা তো বলতে পারব না। মনে হয়, ওপর থেকে নির্দেশ এসেছিল। অ্যাডিশানাল কমিশানার সাহেব হয়ত বলতে পারবেন।

'তুমি যতটুকু জান, আমাকে বলবে? অশনি রায় আমার কাছে এসেছিল। আমাকে ওর প্রোটেকশনের জন্যে এনগেজ করেছে। গৌতমও চাইছে ব্যাপারটা আর একটু ইনভেস্টিগেটেড হোক।'

'আমারও মনে হয় সেটা হওয়া উচিত। আপনি ইনভেস্টিগেট করলে সব থেকে ভাল হবে। আমি যতটা জানি অবশ্যই বলব। তবে দাদা, অত কথা টেলিফোনে হবে না। একদিন আপনাদের বাড়ি গিয়ে সময় নিয়ে বলতে হবে। কবে যাব?'

'কবে আসবে? দাঁড়াও দেখছি।' আদিত্য কথা বলতে বলতে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল।'

কেয়া আদিত্যর পেছনে এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। আদিত্য কিছু বলার আগে বলে উঠল, 'সুভদ্রকে বল সামনের মঙ্গলবার সকালে আসতে। দুপুরে এখানে খেয়ে নেবে। সেদিন পয়লা বৈশাখ, ও নিশ্চয় ছুটি পেয়ে যাবে।'

পয়লা বৈশাখের নেমন্তন্ন পেয়ে সুভদ্র মাজি বেজায় খুশি।

(৩)

আদিত্য আজ বুদ্ধি করে ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে। সঙ্গে ছাতা থাকলে ডবোল লাভ । প্রথমত, আদিত্য লক্ষ করেছে, ছাতা নিয়ে বেরোলে কোনও অলিখিত নিয়মে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়। দ্বিতীয়ত, নেহাতই যদি বৃষ্টি নেমে যায়, চিন্তার কিছু নেই। ছাতা খুলে রাস্তা দিয়ে অকুতোভয়ে হাঁটো। অবশ্য খুব জোরে বৃষ্টি নামলে ছাতায় কাজ হবে না। তখন কোনও দোকানে বা অন্য কোনও ছাউনির নিচে অপেক্ষা করতে হবে।

এই সব কটা সম্ভাবনার জন্যেই আদিত্য মনে মনে তৈরি ছিল, কিন্তু যেটা ঘটল তার জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বৃষ্টি একটা নামল বটে কিন্তু সেটা হালকা বৃষ্টি নয় যে ছাতা খুলে এড়ানো যাবে, আবার ঝমঝমে বৃষ্টিও নয় যে একটা আশ্রয় খুঁজে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। এই দুই-এর বদলে আকাশ থেকে একটা আশ্চর্য শিলাবৃষ্টি শুরু হল। আদিত্য তখন মেট্রো ধরবে বলে শ্যামবাজারের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

আদিত্যর ছাতার ওপর চড়চড় করে শিল পড়ছে। একবার ভাবল শিলাবৃষ্টির মধ্যে দিয়েই পা চালিয়ে চলে যায়, অশনি রায়ের বাবা অসীমাভ রায়ের কাছে দশটার মধ্যে পৌঁছতে হবে। তারপর মনে হল, ধুত্তোর, দু'চার মিনিট দেরি হলে কী যায় আসে? রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শিলাবৃষ্টি দেখলে কী এমন ক্ষতি হবে? শিলাবৃষ্টি তো রোজ রোজ হচ্ছে না।

একটা গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আদিত্য এখন শিলাবৃষ্টি দেখছে। চড়বড় করে শিল পড়ছে রাস্তার ওপরে। পড়েই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলায় এরকম শিলাবৃষ্টি হলে আদিত্য শিল কুড়োতো। কুড়িয়েই মুখে। ঠাণ্ডা বরফের মতো শিল মুখের ভেতর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত। এখনও ফুটপাথবাসী শিশুরা মহা আনন্দে শিল কুড়িয়ে যাচ্ছে। মুখে পুরছে। তাদের আনন্দটা, গাড়িবারান্দার নিচে যারা বৃষ্টি থামবার জন্যে অপেক্ষা করছিল, তাদের মধ্যেও সংক্রামক ভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

দূরে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে ঘোড়ায় চড়া নেতাজির মূর্তিটাকে বৃষ্টিতে ঝাপসা দেখাচ্ছে। যেন সারা কলকাতা শহরটাই শিলাবৃষ্টির আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে গেছে। গাড়িবারান্দার নিচে চায়ের দোকান। সকলেই চা খাচ্ছে। ভাল ব্যবসা করছে দোকানদার। আদিত্যও এক ভাঁড় চায়ের অর্ডার দিল। সকলেই খুশি-খুশি, যেন সকলের জন্যে আকাশ থেকে অপ্রত্যাশিত একটা উপহার এসেছে। শুধু বিপুল বপু একটা ষাঁড়, যে অন্যদের

সঙ্গে গাড়িবারান্দার নিচে আশ্রয় নিয়েছিল, হঠাৎ জলদগম্ভীর স্বরে একটা হাম্বা ডাক ছেড়ে তার অসুবিধের কথা জানিয়ে রাখল।

এই পড়ে পাওয়া আনন্দটাকে আরও বাড়িয়ে নেবার জন্যে আদিত্য ভাবল একটা সিগারেট ধরাবে। তার সঙ্গে সিগারেট নেই, যে কটা ছিল কাল রাত্তিরে কেয়া সব কটা ফেলে দিয়েছে। অবশ্য গাড়িবারান্দার নিচে সিগারেটের দোকানও আছে। সিগারেট কিনতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কেয়ার মুখটা মনে পড়ে গেল।

কাল রাত্তিরে ঘুমোতে যাবার আগে কেয়া বলেছিল, "তুমি যদি আবার সিগারেট খাও, দেখো আমি ঠিক মরে যাব।'

বলাই বাহুল্য, আদিত্য এসব দিব্যি-টিবিতে বিশ্বাস করে না। কিন্তু কেয়ার অসহায় মুখটা মনে পড়ে গেল বলে তার আর সিগারেট কেনা হল না ।

এই সব ভাবতে ভাবতে শিলাবৃষ্টি থেমে গেছে। বৃষ্টিও ধরে এসেছে প্রায়। ছাতা খুলে আদিত্য রাস্তায় নামল।

মেট্রো থেকে নেমে আদিত্য ভাবছিল, কোন দিক দিয়ে যাবে? রাসবিহারী অ্যাভিনিউ দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে ডান দিকে বেঁকে যাবে, নাকি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড ধরে দক্ষিণ দিকে খানিকটা এগিয়ে সরাসরি সাদার্ন অ্যাভিনিউ ধরে নেবে? দুটো রাস্তাই তার পছন্দ। সে মনে মনে ঠিক করল যাবার সময় রাসবিহারী দিয়ে যাবে, ফেরার সময় সাদার্ন অ্যাভিনিউ।

ডাঃ অসীমাভ রায়ের সঙ্গে আজ সকালেই কথা হয়েছে। উনি বলে দিয়েছেন, সাদার্ন অ্যাভিনিউ-শরৎ বোস রোড মোড়ের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা পেট্রল পাম্প আছে। সেটাকে ডানহাতে রেখে ওই একই ফুটপাথ ধরে মিনিট তিনেক পশ্চিম দিকে এগোলেই তাঁদের দোতলা বাড়ি। সামনে ড্রাইভওয়ে।

এদিকটা মনে হয় তেমন বৃষ্টি হয়নি, রাস্তা প্রায় শুকনো। বৃষ্টি আজকাল খুব ছোট ছোট অঞ্চলে আটকে থাকছে। লেক মার্কেটের কাছে রাস্তায় রবিবারের বাজার। গ্রীষ্মের সবজি শীতের তরি-তরকারিদের হটিয়ে বাজার দখল করে নিয়েছে। ফুলকপি-বাঁধাকপি-পালং প্রায় উধাও, তাদের বদলে কচি পটল, নবীন ভিন্তি, তরুণী ঝিঙে। হলুদ কুমড়োর পাশে লাল টমেটো, সবুজ নিমপাতা। বেশ দেখাচ্ছে। রবিবার সব দোকানপাট বন্ধ। শুধু পাশাপাশি দুটো ওষুধের দোকানে ভিড় উপচে পড়ছে। দেখতে দেখতে আদিত্য দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে পৌঁছে গেল ।

ডানদিকে বাঁক নিয়ে খানিক দূর এগোলেই একটা গলির মোড়ে সেই বিখ্যাত কচুরির দোকান। দূর দূর থেকে বাবুরা গাড়ি চড়ে এখানে কচুরি খেতে আসেন। কচুরি ভাজার গন্ধে হাওয়া ভারি হয়ে আছে। কচুরির পাশে জিলিপি, ছোট ছোট মালপোয়া। খেলে অবধারিত অম্বল। কিন্তু অম্বলের কথা কেউ ভাবছে বলে মনে হয় না। কচুরির দোকান পেরোতে পেরোতে আদিত্য ভাবছিল এই গলিটার নাম কচুরি সরণি রাখলে ঠিক হতো।

মিনিট দশেক পরে যখন আদিত্য সবে রায় বাড়ির বৈঠকখানায় গিয়ে বসেছে, বসে গৃহস্বামীর অপেক্ষা করছে, তখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। সে অবশ্য রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অসীমাভ রায়কে ফোন করে বলে দিয়েছিল তার পৌঁছতে একটু দেরি হবে। তাও এই দেরিটা হল বলে আদিত্যর খারাপ লাগছে।

ঘরটা বেশ বড়। আসবাবগুলো পুরোনো এবং দামী। বনেদি বাড়িতে যেমন হয়। মিনিট পাঁচেক হয়ে গেল গৃহস্বামীর দেখা নেই। গৃহস্বামীর ছেলেটাই বা কোথায় গেল? ইতিমধ্যে উর্দি পরা বেয়ারা এসে চা ও দু'খণ্ড কেক দিয়ে গেছে। চা ও কেক খাওয়া শেষ হয়ে গেল, অসীমাভ রায় বা অশনি রায় কারও দেখা নেই। পৌনে এগারোটা বেজে গেল। এগারোটা। দেয়াল ঘড়ি থেকে একটা কোকিল বেরিয়ে এসে এগারোবার কুহু কুহু করল। তবু বাপ ব্যাটার দেখা নেই। আদিত্য উসখুস করছে। ভাবছে, ঘরের বাইরে বেরিয়ে বেয়ারাটাকে

যদি দেখতে পায় জিজ্ঞেস করবে। এই ভেবে সে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় হনহন করে বছর সত্তরের এক শুভ্রকেশ সুদর্শন বৃদ্ধ ঘরে ঢুকলেন।

'আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখলাম বলে অত্যন্ত লজ্জিত।' টেলিফোনের সেই গমগমে গলা। আদিত্য শোনা মাত্রই চিনতে পারল।

'না, না। আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। আমি বসে বসে চা-কেক খাচ্ছিলাম।' আদিত্য হাসল।

'আমার সত্যিই কোনও উপায় ছিল না। হসপিটাল থেকে ফোন এসেছিল। আমার এক পেশেন্টের অবস্থা ক্রিটিকাল। অন্য দিন হলে হসপিটালে চলে যেতাম। কিন্তু আপনাকে বসিয়ে রেখে তো আর যেতে পারি না। প্যারামিটারগুলো শুনে শুনে টেলিফোনে আমার জুনিয়ারকে ইন্সট্রাকশান দিচ্ছিলাম কী করতে হবে। এখন পেশেন্টের অবস্থা একটু স্টেবিলাইজ করেছে।'

আদিত্য আবার হাসল। কী বলবে সে বুঝতে পারছে না।

'বেয়ারাটাকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছি যাতে আমাদের কথাগুলো সে আড়ি পেতে শুনতে না পারে। আজকাল কাউকেই বিশ্বাস করতে পারি না। ও বাড়ি থাকলে ওকে দিয়ে বলে পাঠাতাম আমার আসতে একটু দেরি হবে।'

'প্লিজ আর বলবেন না। এবার কিন্তু আমি সত্যিই লজ্জা পাচ্ছি। আপনি ভীষণ ব্যস্ত একজন ডাক্তার। এরকম আনসিন এমার্জেন্সি তো আপনার হতেই পারে।' আদিত্য কুণ্ঠিত ভাবে বলল। তারপর একটু থেমে বলল, "কিন্তু অশনিবাবুকে তো দেখছি না। উনি বাড়ি নেই?'

প্রশ্নটা শুনে ডাঃ অসীমাভ রায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'বাবলু ঘুমোচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন। আদিত্য অসীমাভ রায়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। যেন তার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তরটা সে এখনও পায়নি।

'আপনি তো জানেন, বাবলুর কিছু মানসিক সমস্যা আছে। সে জন্য তাকে ওষুধ খেতে হয়। ফলে সে বেলা বারোটার আগে উঠতে পারে না। আমিও তাকে তুলি না। যত বেশি ঘুমোবে, তত তার নার্ভটা সুদড হবে। তাছাড়া আজ আমি যখন আপনার সঙ্গে কাজের কথাগুলো বলব, তখন বাবলুর না শোনাই ভাল। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলে ওর নার্ভের ক্ষতি হতে পারে। আমাদের কথা শেষ হয়ে গেলে ওকে ডেকে নেব। তার মধ্যে আমার বেয়ারা নাদের আলিও হয়ত ফিরে আসবে। তখন আমরা একটু চা খাব।'

জানলা দিয়ে নিরুত্তেজ রোদ্দুর ঘরে ঢুকেছে। একটা আকাশও দেখা যাচ্ছে, তার এক কোণে কৃষ্ণবর্ণ খণ্ডিত মেঘমালা । হয়ত এদিকটাতেও এবার বৃষ্টি নামবে। আদিত্যর মনে পড়ল এই ঘরে ঢোকার সময় সে তার ছাতাটা বেয়ারার হাতে দিয়েছিল। সে সেটাকে কোথায় রেখেছে কে জানে?

'কীভাবে শুরু করলে ভাল হবে জানি না। আমি যে সিকোয়েন্সে ব্যাপারগুলো জেনেছি সেভাবেই বলছি। তবে তার আগে আমার ছেলে বাবলু মানে অশনি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার।'

অসীমাভ রায় থামলেন। নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছেন। আদিত্যর সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। ইচ্ছেটা দমন করে সে পকেট থেকে নোটবই আর পেন বার করল।

'বাবলু লেখাপড়ায় খারাপ ছিল না। সাংঘাতিক ট্যালেন্টেড হয়ত নয়, কিন্তু পরিশ্রমী, বাবা-মার বাধ্য। আমার খুব ইচ্ছে ছিল বাবলু বড় হয়ে ডাক্তার হোক। ওর মা কিছুতেই সেটা হতে দিল না। ডাক্তার হিসেবে আমার নিজের ব্যস্ততা যত বেড়েছে তত পরিবারকে আমি কম সময় দিতে পেরেছি। সঙ্গত কারণেই এ-নিয়ে আমার স্ত্রীর প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। তারই জের টেনে ও বলত, বাবলু কিছু কম টাকা রোজকার করলেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওর যেন একটা ঠিকঠাক পারিবারিক জীবন থাকে। বাবলু ডাক্তার হলে সেটা সম্ভব হবে না।

'ডাক্তার হবার বদলে বাবলু ইঞ্জিনিয়র হল। তারপর এম বি এ। বিদেশি ব্যাঙ্কে চাকরি। খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করছিল। তবে ওর মা যে ভেবেছিল বাবলু বাড়িতে অনেকটা সময় দিতে পারবে, সেটা ঘটল না। বিদেশি ব্যাঙ্কের চাকরিতে ভীষণ চাপ । কোনও দিনই রাত্তির দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারত না। এটা নিয়ে ওর মায়ের বেশ দুঃখ ছিল। কিন্তু আমি বোধহয় মূল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছি।'

'না, না, আপনি যতটা পারেন বলুন। আমার সবটা শোনা দরকার।' আদিত্য নোটবই থেকে মুখ তুলে বলল।

'বাবলুর এক বান্ধবী ছিল। বাবলুর সঙ্গে কলেজে পড়ত। আমরা ধরে নিয়েছিলাম ওর সঙ্গে বাবলুর বিয়ে হবে। বাবলুও তাই বলেছিল। আমরা মনে মনে বিয়ের তোড়জোড়ও খানিকটা শুরু করে দিয়েছিলাম। বাবলুর তখন আঠাশ প্লাস বয়েস। সেই সময় আমাদের পরিবারে প্রথম মিসহ্যাপটা ঘটল। বাবলুর মায়ের একটা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হল। আমি তখন একটা কনফারেন্সে হায়দ্রাবাদে। ফিরে আসার আগেই সব শেষ। নিজের মুখেই বলছি, আমি কলকাতার টপ কার্ডিয়োলজিস্টদের একজন। আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবার জন্য পেশেন্টদের দু'তিন মাস অপেক্ষা করতে হয়। অথচ আমার নিজের স্ত্রী যে এত অসুস্থ সেটাই আমি জানতাম না! জানা উচিত ছিল। নিশ্চয় জানা উচিত ছিল। হার্টের অসুখ তো এক দিনে হয় না। আমি আমার স্ত্রীর প্রতি একদম নজর দিইনি। এটাই সত্য। লজ্জা! লজ্জা!' অসীমাভ রায়ের গলাটা বুজে এসেছে।

আদিত্য চুপ করে আছে। বলার তো কিছু নেই।

'বাবলু ওর মায়ের খুব ক্লোজ ছিল। মায়ের ওরকম হঠাৎ করে চলে যাওয়াটা ও একেবারেই মেনে নিতে পারেনি। প্রথম মাস ছয়েক খেতে পারত না, ঘুমোতে পারত না, অফিসে কাজ করতে পারত না। তারপর মনে হয় একটু একটু করে স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। বান্ধবী অন্বেষাকে আঁকড়ে ধরে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল। আমি ওকে খুব বেশি সময় দিতে পারতাম না। অন্বেষাই ছিল ওর মেন্টাল সাপোর্ট। মানসিকভাবে বাবলু কোনও দিনই খুব একটা ইনডিপেনডেন্ট ছিল না। ওর মা ওকে ছোটবেলা থেকে ভীষণ প্রোটেক্ট করে রাখত বলে এটা হয়েছিল। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম অন্বেষাও ওকে ওই প্রোটেকশানটা দেবে। অন্বেষাকে নিয়ে বাবলু হ্যাপি হবে। মায়ের মৃত্যুর জন্যে অবভিয়াসলি ওদের বিয়েটা পিছিয়ে গিয়েছিল। রোজই ভাবতাম, বাবলু বুঝি এবার ওর বিয়ের কথাটা বলবে। কিন্তু দেখতে দেখতে অনেকটা সময় কেটে গেল। বাবলু আর বিয়ের কথা বলে না। তারপর আমাদের পরিবারে দ্বিতীয় মিসহ্যাপটা ঘটল।'

অসীমাভ রায় আবার থামলেন। ঘরের বাইরে কোনও শব্দ হচ্ছে কিনা কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, "আপনি একটু বসুন। আমি দেখে আসি বাবলু উঠে পড়ল কিনা।' তিন-চার বছরের বাচ্চা অসময়ে ঘুম থেকে উঠে পড়লে বাবার যেমন অস্বস্তি হয়, অসীমাভ রায়ের গলাটা সেই রকম শোনাল।

আবার একা ঘরে আদিত্য। বাইরে একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে। জানলা দিয়ে ধুলো ঢুকছে। আদিত্যর ফোনটা ভাইব্রেট করছে। কেয়া।

'কখন আসবে?'

'এখনও ক্লায়েন্টের বাড়িতে। কথা বলছি।'

'আজ কাঁকড়া রাঁধছি, মনে আছে তো? দুপুরে এক সঙ্গে খাব।'

'মনে আছে, মনে আছে। আমি ঠিক চলে আসব। এখন রাখছি।' আদিত্য মোবাইলটা বন্ধ করে পকেটে রাখল। ডাঃ অসীমাভ রায় ফিরে এসেছেন।

'আপনি দ্বিতীয় মিসহ্যাপের কথা বলছিলেন।' আদিত্য খেই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

'হ্যাঁ, সেকেণ্ড মিসহ্যাপ। অন্বেষা হঠাৎ জানাল সে বাবলুকে বিয়ে করতে পারবে না। সে আর বাবলু নাকি কমপ্যাটিবল্ নয়। একেবারে বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু। আসল কথা, অন্বেষার অ্যামেরিকায় বিয়ে ঠিক হয়ে

গিয়েছিল। অ্যামেরিকা যাবার সুযোগটা অন্বেষা হাতছাড়া করতে চায়নি। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই অন্বেষা বিয়ে করে অ্যামেরিকা চলে গেল। বাবলু একেবারে ডিভাসটেটেড্।'

'এই সময় নাগাদই কি অশনিবাবুর সঙ্গে ওই মহিলার আলাপ হয়? অশনিবাবু আমাকে সেই রকমই বলেছিলেন।' আদিত্য নোট নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, এই সময়ই বাবলুর সঙ্গে ওই মহিলার দেখা হয়। পুরোটাই ওই মহিলার আগে থেকে প্ল্যান করা। কীভাবে সেটা বলছি। তার আগে বলি, ওই মহিলার সঙ্গে বাবলুর একটা সম্পর্ক তৈরি হবার পেছনে আমার একটা পরোক্ষ ভূমিকা আছে। সেটা না বললে মৃত্তিকা মিত্র এবং তার স্বামী খুন হবার ব্যাপারটা ভাল করে বোঝা যাবে না।'

চোখে কৌতূহল নিয়ে আদিত্য মুখ তুলে তাকাল। অসীমাভ রায় চিন্তায় ডুবে আছে। যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে।

'আমার স্ত্রী চলে যাবার কয়েক বছর আগে মনোময় দাস বলে একজন আমার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিল। বয়েস তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, সদ্য বিয়ে করেছে, বাড়ির অবস্থা যেমন ভাল, হার্টের অবস্থা তেমনি খারাপ। আসলে ছোটবেলায় ছেলেটির অনেকবার রিউম্যাটিক ফিভার হয়েছিল। ওদের ব্যবসায়ী পরিবারে কারও ধারণাই ছিল না রিউম্যাটিক ফিভার হার্টের কতটা ক্ষতি করতে পারে। আবার এটাও হতে পারে যে দুর্বল হার্ট নিয়েই মনোময় জন্মেছিল।

'মনোময়ের বাবা আর কাকা একসঙ্গে ব্যবসা করত। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে দু'জনেই মারা যায়। মনোময় বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান আর তার কাকার কেবল এক মেয়ে। কিন্তু মনোময়দের পরিবারে মেয়েরা ব্যবসার অংশ পায় না। ফলে মনোময়ের ঘাড়ে পুরো ব্যবসার দায়িত্ব এসে পড়ল। তখন তার বয়েস সদ্য আঠাশ পেরিয়েছে। মনোময়ের মা তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন। বউমার নাম বনানী, সুন্দরী এবং শক্ত চরিত্রের মেয়ে। সে এসে সংসারের হাল ধরল। আমার গল্প এই বনানী দাসকে নিয়ে।

'আমি টানা দু'তিন বছর মনোময়ের চিকিৎসা করেছিলাম। তাতে যে তার খুব একটা উপকার হয়েছিল বলতে পারি না। মাঝে কয়েক মাসের জন্যে বনানী তার স্বামীকে নিয়ে ভেলোর গেছিল। সেখানেও অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। ফিরে এসে আবার আমার কাছে আরও তিন বছর। ছেলেটা একটু একটু করে মরেই যাচ্ছিল আর স্বামীকে ওই ভাবে একটু একটু করে মরে যেতে দেখে বনানী দাস নিজে একটু একটু করে পাগল হয়ে যাচ্ছিল। একটা সময় আমার মনে হল, ওপেন হার্ট সার্জারি করলে হয়ত মনোময় আরও কিছু দিন বেঁচে যেতে পারে। আমি বনানীকে সেই কথা বললাম। স্বামীর অপরেশন করাতে বনানী রাজিও হল। অপরেশন করল আমারই বন্ধু সমীরণ, ডাঃ সমীরণ সান্যাল। কিন্তু মনোময় বাঁচল না। আর তারপরই সমস্যা শুরু হল।

'বনানীর ধারণা হল আমার জন্যেই তার স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে। সার্জারি করার আসলে কোনও দরকার ছিল না। আমি টাকার লোভে সার্জারি করিয়েছি। সার্জারি করার জন্য সমীরণ যে ফি পেয়েছিল, আমি নাকি তার ভাগ পেয়েছি। কিছুদিন আমি ভাল কথায় বনানীকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, ওকে কিছুতেই বোঝানো গেল না। উলটে ও আমাকে সোশাল মিডিয়ায় ইনটিমিডেট করতে শুরু করল। এতে আমার প্রফেশানালি ভীষণ ক্ষতি হচ্ছিল, তবু আমি চুপ করেই ছিলাম। শেষে বনানী আমার নামে কেস করে দিল। লোয়ার কোর্টে কেস দাঁড়াল না, হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চেও না। বনানী বুঝল আইনের পথে ও আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তাই ও ডিভিশন বেঞ্চে আর অ্যাপিল করল না। কিছুদিন ও আমাকে ভয় দেখিয়ে কয়েকটা চিঠি লিখল। তারপর একেবারে চুপ করে গেল। আমি ভাবলাম সমস্যাটা বোধহয় মিটে গেল।'

'আদিত্যবাবু কতক্ষণ এসেছেন?"

আদিত্য মুখ ফিরিয়ে দেখল রাত্রিবাসের ওপর ড্রেসিং গাউন চাপানো অশনি রায় দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

অশনি রায় তার বাবার পাশে সোফায় এসে বসেছে।

'নাদের কোথায়? বাড়িতে কোথাও দেখতে পেলাম না। একটু চা খেতাম।' অশনি রায় তার বাবাকে বলল।

'নাদেরকে আমি একটা কাজে পাঠিয়েছি। একটু অপেক্ষা কর, ও চলে আসবে।' অসীমাভ রায় ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে বললেন ।

'আমি কফি করছি। আর কেউ কফি খাবে?' অশনি রায় আলাদা আলাদা করে আদিত্য এবং তার বাবার দিকে তাকাল ।

'আমি কফি খাব না। নাদের ফিরলে চা খাব।' অসীমাভ রায় জানালেন।

'আমিও চা-ই খাব।' আদিত্য একটু ইতস্তত করে বলল।

'আমি তাহলে নিজের জন্যে একটু কফি করে আনছি।'

অশনি রায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আদিত্য একটু আশ্চর্য হয়েই লক্ষ করল নিজের বাড়ির পরিবেশে অশনি রায়কে প্রায় স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। এটা অবশ্য অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ওঠার ফলও হতে পারে।

'সমস্যাটা আসলে মিটল না?' অশনি রায় ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আদিত্য পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাইল।

'মিটল তো না-ই, বরং বহুগুণ ভয়ঙ্করভাবে ফিরে এল। বনানী একটা অন্য নাম নিয়ে বাবলুর সঙ্গে ভাব জমাল। বাবলুর মনটা তখন খুব নরম রয়েছে। তাকে পটানো খুব সোজা।'

'কী নাম নিয়ে ভাব জমাল? রূপলেখা দত্ত?'

'হ্যাঁ। রূপলেখা দত্ত। ওই নামে বাবলুদের ব্যাঙ্কে একজন ক্লায়েন্ট ছিল। তাকে আর তার স্বামীকে বনানী নিশ্চয় চিনত। যত দূর জানি, বনানী একবারই ব্যাঙ্কের ভেতরে বাবলুর সঙ্গে দেখা করেছিল। তখন সে তার নাম বলেছিল রূপলেখা দত্ত । বলেছিল, ব্যাঙ্কে তার একটা বড় অ্যাকাউন্ট আছে। এর পরে যতবার সে বাবলুর সঙ্গে দেখা করেছে সব ব্যাঙ্কের বাইরে।'

'তারপর?'

অসীমাভ রায় আবার শুরু করার আগেই অশনি এক কাপ কফি হাতে ঘরে ফিরে

এসেছে।

'বাবা নিশ্চয় বলছে বাবার পেশেন্টের স্ত্রী সেই বনানী দাস প্রতিশোধ নেবার জন্যে রূপলেখা সেজে আমার সঙ্গে অ্যাফেয়ার করেছিল। ওটা বাবার পেট থিয়োরি। আমার কিন্তু এটা মনে হয় না।' অশনি রায় তার বাবার পাশে বসতে বসতে বলল।

'আগে আপনার বাবার কথাটা শোনা যাক। তারপর আপনার কথাটা শুনব।' আদিত্য অসীমাভ রায়ের দিকে তাকাল।

'আমার আর খুব বেশি কিছু বলার নেই। শুধু এইটুকু বলার যে বনানী লোক দিয়ে মৃত্তিকা এবং তার স্বামীকে খুন করিয়েছিল। এবং তারপর ফোন করে বাবলুকে মৃত্তিকার বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিল। বলেছিল ওটা তার বাড়ি। বাবলু ওখানে পৌঁছে দ্যাখে বাড়ির ভেতর একটি পুরুষ এবং একজন মহিলা মরে পড়ে আছে। তাই দেখে বাবলু ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে। কিন্তু ইতিমধ্যে সিসি ক্যামেরায় বাবলুর ছবি উঠে গেছে। তাই দেখে পুলিশ বাবলুকে গ্রেপ্তার করল। বনানী জানত সরাসরি আমার কোনও ক্ষতি করার থেকে আমার ছেলের কোনও ক্ষতি করতে পারলে আমি আরও অনেক বেশি কষ্ট পাব।'

'কিন্তু একজনের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে বনানী দু'জন নিরপরাধ লোককে খুন করল?'

'ঠিক বলেছেন। আমার মনে হয় বাবার থিয়োরিতে এটাই সব থেকে বড় ফাঁক।' এবার অশনির গলা ।

'ফাঁক নেই, কোনও ফাঁক নেই।' ডাঃ অসীমাভ রায় দৃঢ় গলায় বললেন। 'বনানী যদি সরাসরি বাবলুর কোনও ক্ষতি করত তাহলে তো ওর ওপরেই সন্দেহ পড়ত। সেটা হোক ও চায়নি।'

'পুলিশ কি বনানীর খোঁজ করেছিল?'

'আমি আমার সন্দেহের কথা পুলিশকে বলেছিলাম। তারপর পুলিশ কি করেছিল আমি বলতে পারব না। তবে কোর্টে কখনও পুলিশ বনানীকে সাক্ষী হিসেবে ডাকেনি।'

'আপনাদের উকিলও ডাকেনি ?"

'হ্যাঁ, আমার উকিল, ব্যারিস্টার অরুণকান্তি ব্যানার্জী বনানীকে ডেকেছিলেন। ইন ফ্যাক্ট, আমি যেটা বলছি, অরুণ খুনের মোটিভ হিসেবে কোর্টে সেটাই বলেছিল। কোর্ট থেকে সমনও গিয়েছিল বনানীর নামে। কিন্তু বনানীর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি।'

'বনানীর কোনও পুরোনো ঠিকানা আপনার কাছে আছে?'

'আট-দশ বছর আগেকার একটা ঠিকানা বোধহয় আছে। একটু খুঁজতে হবে। খুঁজে পেলে আপনাকে মেসেজ করে দিচ্ছি। তবে কোর্ট থেকে যখন সমন গিয়েছিল, এই ঠিকানায় বনানীকে পাওয়া যায়নি।'

'বনানীর স্বামীর কীসের ব্যবসা ছিল ?'

'ধর্মতলায় ওদের একটা রঙের দোকান ছিল। দাস অ্যান্ড সনস। অনেক পুরুষের দোকান। তবে মনোময় দাস মারা যাবার পরে দোকানটা বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এখন সেখানে একটা টিভির দোকান হয়েছে।'

'আমার মনে হয় আসল ঘটনাটা একটু আলাদা। আমি আমার কথাগুলো একটু বলব? জানেন তো হঠাৎ হঠাৎ আমার একটা ব্ল্যাক-আউট হয়ে যায়। সেরকম কিছু হবার আগে আমার কথাগুলো বলে নিতে চাই।' অশনি রায়ের গলাটা ঈষৎ ব্যাকুল শোনাল।

'বলুন, বলুন। আদিত্য অশনি রায়ের দিকে তাকিয়ে বলল। সে এখনও নোট নিচ্ছে।

'দেখুন, ওই মহিলা, আমি তাকে রূপলেখা বলেই রেফার করছি, আমার সঙ্গে অল্প দিনের মধ্যেই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। সেই ঘনিষ্ঠতার বর্ণনা দিয়ে আপনাকে বোর করব না। শুধু দু'একটা কথা বলা জরুরি। বছর তিনেক আমাদের সম্পর্কটা হবার পর ওই খুনের ঘটনাটা ঘটে। আমরা বাইরেই মিট করতাম। রূপলেখা কখনও আমাকে বলেনি তার বাড়ি কোথায়।'

'তার মানে আপনি ওই ঘটনার আগে রূপলেখা দত্তর ফ্ল্যাটে কখনও যাননি।' 'না, যাইনি। অবভিয়াসলি, রূপলেখার স্বামী ওই ফ্ল্যাটেই থাকত। যাব কী করে? অ্যাকচুয়ালি রূপলেখাও চাইত না আমি ওর বাড়ির কাছাকাছি কোথাও যাই। তাই ও কোথায় থাকে আমাকে কখনও জানায়নি। হয়ত ভাবত, ওর বাড়ির কাছাকাছি গেলে পাড়ার লোক আমাদের একসঙ্গে দেখতে পেয়ে যাবে। তাই আমি কখনও রূপলেখাকে বাড়ি পৌঁছে দিইনি। ওর বাড়ির ঠিকানাও নিইনি। বাড়ি ফেরার সময় ওকে একটা উবারে উঠিয়ে দিতাম।'

'তার মানে, ফ্ল্যাট বাড়িটার সিকিওরিটি বা অন্য কেউ আপনাকে চিনত না?' 'পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের সময় একজন দরোয়ান আমাকে আইডেনটিফাই করেছিল। সে বলেছিল ঘটনার দিন রাত্তিরে সে আমাকে ওই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে।' 'আপনার বাবা বললেন, ঘটনার রাত্রে একটা ফোন পেয়ে আপনি মৃত্তিকা মিত্রর বাড়িতে যান। এটা একটু ডিটেলে বলবেন ? '

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই তো ভাল করে বলতে চাই। ঘটনাটা ঘটার কিছু দিন আগে থেকে রূপলেখা বলছিল আমাদের সম্পর্কটার কথা ওর স্বামী জানতে পেরেছে। এটা নিয়ে বাড়িতে খুব অশান্তি চলছে। মাঝে মাঝেই ওর স্বামী ওর গায়ে হাত তুলছে। এই গায়ে হাত তোলা ব্যাপারটা আমার সঙ্গে রূপলেখার আলাপ হবার আগেও ঘটত। অন্য কোনও অছিলায়। হয়ত স্বামীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই রূপলেখা আমার দিকে ঝুঁকেছিল।'

'এক মিনিট।' আদিত্য নোট নেওয়া থামিয়ে বলল। 'আপনি বললেন, রূপলেখা আপনাকে বলেছিল ওর স্বামী আপনাদের সম্পর্কটার কথা জানতে পেরেছে। কী করে জানতে পেরেছে রূপলেখা কিছু বলেছিল?'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। রূপলেখা বলেছিল, ওর স্বামী ওর মোবাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটগুলো দেখতে পেয়েছিল। আমাদের একসঙ্গে তোলা কয়েকটা ইনটিমেট সেলফি ছিল, সেগুলোও দেখেছিল।'

'মোবাইলটা কি পুলিশ উদ্ধার করেছিল?'

'হ্যাঁ... রূপলেখার ওই মোবাইলটা মৃত্তিকা মিত্রর ফ্ল্যাটের একটা লুকোনো জায়গা থেকে পুলিশ খুঁজে বার করেছিল।'

'রূপলেখা দত্তর মোবাইল মৃত্তিকা মিত্রর ফ্ল্যাটে গেল কী করে?'

'জানি না। আমি সত্যিই জানি না। মোবাইলটা খুঁজে পাবার পর পুলিশ বলছে মৃত্তিকাই মোবাইলটা লুকিয়ে রেখেছিল পাছে তার স্বামী টের পায়। পুলিশ আরও বলছে, রূপলেখার মোবাইল মৃত্তিকার ফ্ল্যাটে খুঁজে পাওয়ার মানে মোবাইলটা মৃত্তিকার। সে রূপলেখা দত্তর নামে মোবাইলটা রেজিস্টার করিয়েছিল এবং সেই মোবাইল থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করত। অর্থাৎ রূপলেখা দত্ত নাম নিয়ে মৃত্তিকাই আমার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল যার জেরে তার স্বামীকে আমার হাতে খুন হতে হয়।'

'রূপলেখার মোবাইলে কি আপনাদের ইনটিমেট ছবিগুলো ছিল?'

'পুলিশ যখন মোবাইলটা পেয়েছিল তখন তার মধ্যে আমার সঙ্গে রূপলেখার কোনও ছবি ছিল না। কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটগুলো ছিল। স্বামীর সঙ্গে অশান্তি হবার পর রূপলেখা ছবিগুলো ইরেজ করে দিয়েছিল। চ্যাটগুলো করেনি। আমার পক্ষে সেটা মোস্ট আনফরচুনেট।'

'ঠিক আছে। তারপর কী হল বলুন।'

'মোবাইলের কল লিস্ট এবং ওই চ্যাটগুলো দেখে পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করল। তার আগে আমার গাড়ির নম্বর থেকে পুলিশ আমাকে ট্রেস করেছিল। গাড়িটা অনেকক্ষণ রাস্তায় পার্ক করা ছিল। রাস্তার সিসি ক্যামেরায় সেটার ছবি উঠে গিয়েছিল।'

'তারপর কী হল?'

'তারপর আর কী? ওই যে বললাম, পুলিশ ধরে নিল খুন হওয়া মহিলা আমার অতি পরিচিত। যেহেতু মোবাইলে আমাদের ছবিগুলো আর ছিল না আমি কিছুতেই প্রমাণ করতে পারলাম না যে মহিলার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল সে অন্য একজন।'

'আপনার মোবাইলে ছবি বা চ্যাটগুলো ছিল না?'

'আমার মোবাইলেও চ্যাটগুলো ছিল। ছবিগুলো ছিল না।'

'কেন?'

'রূপলেখার সঙ্গে ওর স্বামীর অশান্তি হবার পর যখন ও ওর মোবাইল থেকে আমাদের ছবিগুলো মুছে ফেলল তার কয়েকদিন পরেই ও ইনসিস্ট করল আমিও যেন আমার মোবাইল থেকে ছবিগুলো মুছে ফেলি। আমি বললাম, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না? ও সরাসরি কিছু বলল না। শুধু বলল এখন ওর যা মনের অবস্থা তাতে ছবিগুলো কোথাও থেকে গেলে ওর নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যাবে। তারপর বলল, পুরুষ জাতটাকে ও আর বিশ্বাস করে না। ওর মনে হচ্ছে ছবিগুলো থেকে গেলে ও ভালনারে হয়ে যাবে। সেটা ও চায় না। তারপর ছবিগুলো মুছে দেবার জন্য ও কাকুতি মিনতি করতে লাগল। ও এত জোরাজোরি করল যে শেষ পর্যন্ত আমি ছবিগুলো মুছে দিতে বাধ্য হলাম। এর পরে আমরা আর এক সঙ্গে ছবি তুলিনি।'

'কিন্তু চ্যাটগুলো মুছে দিতে বলেনি?'

'না। বলেনি। হয়ত এই কারণে যে চ্যাট থেকে কাউকে সহজে আইডেন্টিফাই করা যায় না।'

'হুঁ, বুঝলাম । আচ্ছা বলুন, আপনি অত রাত্তিরে বাঙ্গুর এভিনিউএর ওই বাড়িটাতে গিয়ে হাজির হলেন কী করে?'

'আমি পুরো ঘটনাটা বললে আপনি বুঝতে পারবেন। যে রাত্তিরের কথা সেদিন আপনাকে বলেছিলাম, মানে যে রাত্তিরে আমি প্রথম রূপলেখাকে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়েছিলাম বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম, সেটা ছিল জুন মাসের মাঝামাঝি। কলকাতায় সবে মনসুন এসেছে। তাই অত বৃষ্টি। আর ওই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটেছিল তিন বছর পরে ফেব্রুয়ারিতে। সে বছর হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছিল কলকাতায়। ফেব্রুয়ারিতেও বেশ শীত ছিল। আমি আর রূপলেখা রাত্তির সাড়ে দশটা-পৌনে এগারোটা অব্দি এক সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। রাজারহাট নিউ টাউনে একটা নির্জন রেস্টোরান্টে ডিনার সেরে আমি রূপলেখাকে একটা উবারে উঠিয়ে দিয়েছিলাম। ও বলেছিল, ওর স্বামী আউট অফ টাউন, তাই তাড়াতাড়ি ফেরার কোনও চাপ নেই। রাত্তিরে রাস্তা ফাঁকা, রূপলেখাকে নামিয়ে দিয়ে আমি বেশ চটপট বাড়ি ফিরে আসছিলাম। যখন মা ফ্লাইওভারের কাছে পৌঁছেছি, হঠাৎ রূপলেখার ফোন। শি ওয়াজ সবিং। আমাকে বলল, আমার স্বামী আমার ওপর ভীষণ অত্যাচার করছে, তুমি তাড়াতাড়ি এস। তুমি না এলে ও আমাকে মেরেই ফেলবে। আমার ঠিকানাটা লিখে নাও। ঠিকানাটা বলতে বলতে কেউ যেন ফোনটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিল। আমি অবশ্য ঠিকানাটা শুনতে পেয়েছিলাম। ভীষণ ওয়ারিড হয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে আমি রূপলেখার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।'

'বেশ, বেশ। আচ্ছা, আমি ইন্টারনেট থেকে জানলাম পুলিশ বলছে সেই রাত্তিরে রূপলেখা দত্তর মোবাইল থেকে আপনার মোবাইলে কোনও ফোন আসেনি। তা হলে ওই এস ও এস কলটা এল কোথা থেকে?'

'ওটা এসেছিল রূপলেখাদের বাড়ির ল্যান্ডলাইন থেকে। রূপলেখাই বলেছিল ও ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করছে। আমি এটা পুলিশকে বলেওছিলাম। পুলিশ নম্বরটা ভেরিফাই করে নিয়েছিল।'

'কিন্তু আপনার কথা মতো রূপলেখা এবং মৃত্তিকা যদি আলাদা মহিলা হয় তা হলে রূপলেখা মৃত্তিকা মিত্রর বাড়ির ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করল কী করে?'

'আমি এটা নিয়ে ভেবেছি। আমার মনে হয়, রূপলেখা তার সঙ্গী বা সঙ্গীদের নিয়ে মৃত্তিকা মিত্রর বাড়ি গিয়েছিল। গিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে খুন করার পর আমাকে বাড়ির ল্যাণ্ডলাইন থেকে ফোনটা করেছিল।'

'রূপলেখা মৃত্তিকা এবং পার্থ মিত্রকে খুন করবে কেন?

'এটা আমি বলতে পারব না। শুধু বলতে পারি আমাকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে।'

বাইরে একটা পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অসীমাভ রায় বললেন, 'নাদের বোধহয় ফিরে এল। আমি একটু চা করতে বলি। এই গল্পটা আমি এতবার শুনেছি, আর একবার না শুনলেও চলবে।'

অসীমাভ রায় বেরিয়ে যেতেই আদিত্য চাপা গলায় বলল, "একটা প্রশ্ন আপনার বাবার সামনে জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হচ্ছিল। এবার জিজ্ঞেস করছি। আপনার সঙ্গে রূপলেখা দত্তর কি কোনও শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল?'

অশনি রায় মাথা নিচু করে আছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'হ্যাঁ হয়েছিল। রাজারহাটের একটা বাড়িতে রূপলেখার সঙ্গে আমি কয়েকবার শারীরিকভাবে মিলিত হয়েছিলাম।'

'আর একটা প্রশ্ন। মৃত্তিকা মিত্রকে আপনি কতটা চিনতেন?'

'খুব সামান্য চিনতাম। আমাদের ব্যাঙ্কে ওঁর কম্পানির একটা অ্যাকাউন্ট ছিল। সেই কারণে আমাদের ব্যাঙ্কে উনি মাঝে মাঝে আসতেন। ফলে মুখ চিনতাম। যতদূর মনে পড়ছে আমাকে উনি কাজের সূত্রে দু'একবার ফোনও করেছিলেন।'

'ঠিক আছে। তারপর কি হয়েছিল, বলুন।'

'আমি যখন ঠিকানা খুঁজে রূপলেখার ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম তখন রাত্তির এগারোটা বেজে গেছে। বাড়ির মেন গেট বন্ধ। একজন সিকিউরিটি গার্ড গেটের সামনে বিছানা পেতে ঘুমোচ্ছে। লোকটাকে ডেকে তুলতে হল। অত রাত্তিরে আমি ভেতরে যাব শুনে বেশ অবাক হল লোকটা। অনেক চেঁচামিচির পরে গেটটা খুলে দিল। পরে ওই লোকটাই কোর্টে আমাকে আইডেনটিফাই করে। রূপলেখা বলেছিল ওরা টপ ফ্লোরে থাকে। আমি লিফট দিয়ে উঠে রূপলেখাদের ফ্ল্যাটে বেল বাজালাম।

কী করে বুঝলেন ওটা রূপলেখাদের ফ্ল্যাট?'

'ফ্ল্যাটের দরজায় ফ্ল্যাটের নম্বর লেখা ছিল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? আমি পৌঁছবার আগেই ফ্ল্যাটের মধ্যে ওই দু'জন খুন হয়ে গিয়েছিল।'

'বাড়ির দু'জনেই যদি খুন হয়ে থাকে তাহলে দরজা খুলল কে?'

'একজন লোক দরজা খুলেছিল। আমি ধরে নিয়েছিলাম সে ওই বাড়িতে কাজ করে। মানে, চাকর বা রান্নার ঠাকুর। পরে বুঝেছিলাম আসলে সে একজন ভাড়া করা খুনি। সে-ই খুনটা করেছিল। কিন্তু খুনটা করে তখনও পালিয়ে যেতে পারেনি। লোকটাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মেমসাহেব কোথায়? ও বলল, মেমসাহেব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনি সোজা বেডরুমে চলে যান। বলে বেডরুমটা দেখিয়ে দিল। আমি লোকটাকে পাশ কাটিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেডরুমের দিকে এগোতে যাব, লোকটা পেছন দিক থেকে আমার নাকের ওপর একটা রুমাল চেপে ধরল। ক্লোরোফর্ম বা ওই রকম একটা কিছু ছিল রুমালটায়। আমি জ্ঞান হারালাম।'

'কতক্ষণ আপনার জ্ঞান ছিল না?'

'কিছুক্ষণ তো হবেই। ধরুন এই আধ ঘন্টা। আমি অবশ্য ঘড়ি দেখিনি। আন্দাজে বলছি।'

'নিজের থেকেই জ্ঞান ফিরে এল?"

'হ্যাঁ, নিজের থেকেই জ্ঞান ফিরে এল। জ্ঞান হতে দেখলাম ফ্ল্যাটের ভেতরে মেন দরজাটার সামনে পড়ে আছি। চারদিক অন্ধকার। কেউ নেই। শুধু বেডরুমের আধখোলা দরজা দিয়ে একটা আলো ভেসে আসছে।'

'বুঝতে পারছি। তা আপনি তারপর কী করলেন?'

'আমি কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালাম। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। তাও কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালাম।'

আদিত্যর মনে হল অশনি রায়ের দৃষ্টিটা বর্তমান কালে নেই। সেদিনের ঘটনাগুলো যেন সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

'আমি খানিকটা টলতে টলতে বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম।' ভূতে পাওয়া মানুষের মতো অশনি রায় বলল।

"গিয়ে কী দেখলেন? '

'দেখলাম দুটো মৃতদেহ। একটা পুরুষের, অন্যটা মহিলার। পুরুষের মৃতদেহটা মেঝেতে, কার্পেটের ওপরে। মহিলার মৃতদেহের আধখানা বিছানায়, আধখানা মাটিতে। চারদিকে থোকা থোকা রক্ত। পরে শুনেছিলাম পুরুষটিকে গুলি করে মারা হয়েছে। পিস্তলটা পাশেই পড়েছিল। কিন্তু মহিলাটিকে গুলি করা হয়নি। তার মাথা ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।'

অশনি রায় দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে। তারপর মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে চেয়ারে হেলান দিল। চোখ বন্ধ। তাকে প্রথম দিনের মতোই অসুস্থ লাগছিল। আদিত্য চুপ করে বসে আছে। মিনিট পাঁচেক পরে ডাঃ অসীমাভ রায় ঘরে ঢুকলেন। তার পেছনে পেছনে চায়ের সরঞ্জাম হাতে নাদের।

অসীমাভ রায় ছেলেকে দেখে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'আবার কী হলো?' বাবার গলা শুনে অশনি চোখ খুলে বলল, 'না, না। কিছু হয়নি। আমি একটু ঘরে গিয়ে শুচ্ছি।'

আদিত্যর মনে হল অশনি রায় আজ আর কথা বলবে না।

একটু পরে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আদিত্য অসীমাভ রায়কে বলল, 'আমাকে আপনি ঠিক কী করতে বলছেন?'

'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে আমরা যে রেসপাইটটা পেয়েছি সেটা সাময়িক। সম্ভবত পুলিশ খুব শিগগির ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে। হাই কোর্টে আমার প্রধান ভরসা ছিল আমার পুরোনো বন্ধু অরুণ, ব্যারিস্টার অরুণকান্তি ব্যানার্জী। অরুণ আর আমি এক সঙ্গে বিলেতে ছিলাম। ফ্ল্যাট শেয়ার করেছি। অরুণ আইন পড়ত, আমি ডাক্তারি। সে আর নেই। আমরা কার ওপর ভরসা করব?'

অসীমাভ রায় কিছুক্ষণ থেমে রইলেন। ভাবছেন।

'আমি চাইছি রূপলেখা দত্ত পরিচয় দিয়ে যে মেয়েটা বাবলুর ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, আপনি তাকে খুঁজে বার করুন। তাহলে আমরা ভাল করে লড়তে পারব। অরুণের মতো কাউকে অবশ্য পাব না। তবু ওই মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া গেলে আমাদের সমস্যা অনেক কমে যাবে।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

রবিবারটা আদিত্য আর কেয়া একসঙ্গে কাটাতে চায়। সোমবার থেকে কেয়ার আবার সেই জাঁতাকল। সেই সকালে ওঠা, ইস্কুল, কোচিং ক্লাশ, হা-ক্লান্ত হয়ে সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরা। সপ্তাহে দু-দিন ইস্কুলের পর বেশিক্ষণ কোচিং ক্লাশ থাকে। সেই দু-দিন ফিরতে ফিরতে রাত্তির হয়ে যায়। আদিত্যর অবশ্য তা নয়। গত কয়েক মাস, বলতে গেলে তার হাতে কোনও কাজই নেই। কিন্তু সকালে কেয়া বেরিয়ে গেলে আদিত্য টের পায় বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কিছুক্ষণ পরে সে-ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

সকালে কেয়া খুব তাড়াতাড়িতে থাকে বলে কিচ্ছু গুছিয়ে যেতে পারে না । আদিত্য রোজই লক্ষ করে সকালে কেয়া ইস্কুলে বেরিয়ে যাবার পর বাড়ির ভেতর তার চিহ্ন এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। মেঝের ওপর গত রাত্তিরে পরা বাসি রাত্রিবাস যেটা কাজের মাসিকে কাচতে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু দেওয়া হয়নি। যে শাড়িটা পরবে ভেবেছিল কিন্তু পরেনি, সেটাও পাট না করে খাটের একপাশে ফেলে গেছে। বিছানার ওপর ব্লাউজ, অন্তর্বাস, এগুলোও আলমারি থেকে নামানো হয়েছিল, পরা হয়নি। ড্রেসিং টেবিলে এলোমেলো করে রাখা প্রসাধনী। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে কেয়া নিশ্চয় আবার সব গুছিয়ে রাখবে, কিন্তু যতক্ষণ না রাখছে ততক্ষণ চারদিকে কেয়ার জিনিসপত্র ছড়ানো অথচ কেয়া নেই। ব্যাপারটা আদিত্যর ভাল লাগে না। আদিত্যর মনে হয়, কেয়ার অনুপস্থিতিতে বাড়িতে থাকার চাইতে আপিসে সময় কাটানো ভাল। মনে মনে প্রার্থনা করে, সন্ধেবেলা সে যখন বাড়ি ফিরবে তার আগেই যেন কেয়া বাড়ি ফিরে আসে।

আজ রবিবারটা এক সঙ্গে কাটানো যেত, অথচ সকালেই আদিত্যকে বেরিয়ে যেতে হল। যখন বাড়ি ফিরল তখন প্রায় তিনটে বাজে। কেয়া না খেয়ে বসে আছে। রবিবার দুপুরে এক সঙ্গে না খেতে পারলে খাবার আনন্দটাই মাটি। তার ওপর কেয়া আজ প্রচুর পরিশ্রম করে কাঁকড়া রান্না করেছে। ভাগ্যিস আদিত্য চানটা সেরে বেরিয়েছিল, তাই বাড়ি ফিরেই খেতে বসতে পারল।

রবিবার বাড়িটা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লাগে। কেয়া একজন কাজের মাসিকে রেখেছে যে প্রত্যেক রবিবার সকালে এসে সারা বাড়ি ঝাড়পোঁচ করে। আদিত্য ফেরার আগেই মাসি বাড়ি পরিষ্কার করে চলে গেছে। বাড়িতে এখন আদিত্য আর কেয়া একা ।

রবিবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আদিত্য আর কেয়া দাম্পত্যের শারীরিক শর্তটা উদগ্রীব হয়ে পালন করে। এ-ব্যাপারে তাদের আকুলতা এখনও কমেনি। অন্য সময় যে এসব হয় না তা নয়, কিন্তু রবিবার দুপুরটা প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। আদিত্যদের দাম্পত্য প্রায় দু'বছর হতে চলল।

আদিত্য ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিকেল পাঁচটা নাগাদ চোখ খুলে টের পেল কেয়া তাকে চা খেতে ডাকছে। তাদের ছোট্ট বাসায় কোনও বারান্দা নেই। বসার ঘরে দুটো বেতের চেয়ার আছে। সেখানে বসলে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। এটাই তাদের এক সঙ্গে বসে চা খাবার যায়গা। রবিবার বিকেলে রাস্তা প্রায় ফাঁকা রয়েছে। অন্য দিন যে গাড়িগুলো বড়রাস্তার ট্র্যাফিক সিগনাল এড়াবার জন্যে আদিত্যদের বাড়ির সরু রাস্তাটা দিয়ে শর্টকাট করে তারা আজ নেই। রাস্তার মাঝখান দিয়ে একটা খবর কাগজ উড়ে যাচ্ছে। তার পেছন পেছন কয়েকটা শুকনো পাতা। গাছ থেকে কিছু বটফল এসে রাস্তায় পড়েছে। সেগুলোকে মাড়িয়ে একটা হাতে-টানা রিক্সা ঠুনঠুন করতে করতে চলে গেল। এবার ঝড় উঠবে।

কেয়া একটা ট্রেতে দু-কাপ চা আর এক বাটি চানাচুর নিয়ে আদিত্যর পাশে এসে বসল। চানাচুর খাবার জন্য বাটিতে দুটি চামচ। ঠিক সেই সময় বেজে উঠল কেয়ার মোবাইল। চা খেতে খেতে আদিত্য খেয়াল করল কেয়া খুব একটা কথা বলছে না। অনেকক্ষণ ধরে শুনে যাচ্ছে। কেয়ার মুখ দেখে আদিত্য আন্দাজ করল গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে।

বেশ কিছুক্ষণ এক-তরফা শোনার পর কেয়া বলল, "তুমি ডাক্তারকে বলো এটা এমার্জেন্সি কেস, এই ভাবে ফেলে রাখা যায় না। একটা মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন। পুলিশ কখন আসবে তার ঠিক আছে নাকি?'

ওদিক থেকে কী উত্তর এলো বোঝা গেল না। কেয়া আদিত্যর দিকে তাকিয়ে টেলিফোনে বলল, "আমি আমার স্বামীকে বলছি। দেখি ও কী করতে পারে। তুমি এখন রাখো। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করো। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।'

মোবাইল নামিয়ে রেখে কেয়া আদিত্যর দিকে তাকাল। আদিত্য কেয়ার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'অমলা তরফদার ফোন করেছিল। অমলাদি আমাদের ল্যাবে কাজ করে। নন-টিচিং। ও খুব বিপদে পড়েছে। এমনিতেই মেয়েটা নানা সমস্যায় থাকে। কয়েক বছর আগে স্বামী মারা গেছে। শশুর-শাশুড়ি বেঁচে। তাদের দেখতে হয়। একটাই ছেলে। মানুষ হয়নি। বিপদটা ছেলেকে নিয়ে।'

কেয়া একটু থেমে চায়ের কাপে লম্বা চুমুক লাগাল।

'ছেলেটা কুসঙ্গে পড়েছে। মানে, যতটা কুসঙ্গে পড়া সম্ভব। মাধ্যমিকের পর স্কুল যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অমলাদি মাঝে মাঝেই কান্নাকাটি করত। এখন বলছে, ছেলে নাকি পাতাখোর মানে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট। এবং যা হয়, ড্রাগের পয়সা জোটানোর জন্যে ড্রাগ-পেডলিংও করে। পুলিশের হাতে দু-একবার ধরা পড়েছে কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে গেছে। এসব কথা অমলাদি আগে কখনও বলেনি।'

'বলার মতো কথাও নয়। কিন্তু তার বিপদটা কী?' আদিত্য একটু অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ড্রাগ ওভারডোজ। ঘুম থেকে উঠছিল না। যে ঘরে ঘুমোয় তার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। দুপুরবেলা পাড়া-পড়শি দরজা ভেঙে ঢুকে দ্যাখে খাট থেকে মাটিতে পড়ে গেছে। জ্ঞান নেই। মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোচ্ছে। ওদের পাড়াতেই একটা ছোট নার্সিং হোম আছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নার্সিং হোম এখনও অ্যাডমিট করেনি। বলছে এটা পুলিশ কেস। পুলিশ না এলে কিচ্ছু করা যাবে না। তুমি কাউকে বলে-টলে কিছু করতে পারবে?'

'এদের বাড়িটা কোথায়? কোন থানার আন্ডারে ?'

'অমলাদির বাড়ি পার্ক সার্কাস। কোন থানা জানি না।'

'অমলাদির ছেলের নাম কী?'

'এই রে! তাড়াহুড়োতে ওটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। অসুবিধে নেই, আমি ফোন করে জেনে নিচ্ছি।'

'নার্সিং হোমের নাম বলেছে?

'বেস্ট কেয়ার নার্সিং হোম। পার্ক সার্কাস বাজারের কাছে। অমলাদি বলল, বাজারের সামনের রাস্তাটা ধরে আর একটু সারকুলার রোডের দিকে এগোলে বাজারের বাঁ দিকে পড়বে।'

'ভালই ডিরেকশন দিয়েছে। শুনে মনে হচ্ছে নার্সিং হোমটা করেয়া থানার আন্ডারে। কিন্তু করেয়া থানায় তো আমি কাউকে চিনি না। লালবাজারের কাউকে দিয়ে বলাতে হবে। তারও আগে প্রশ্ন হল, আমাকে ঠিক কী করতে বলছ?'

'আমি চাইছি, ছেলেটাকে যাতে ওই নার্সিং হোম ভর্তি করে নেয় তুমি তার একটা ব্যবস্থা কর। ও ওখানে বেশিক্ষণ এমনি এমনি পড়ে থাকলে মরেই যাবে। অমলাদি ভীষণ কান্নাকাটি করছে।'

‘দ্যাখো, নার্সিং হোমদেরও তো কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। ওদেরও পুলিশি ঝামেলার ভয় থাকে। এটা তো কোনও সাধারণ রুগির কেস নয়। আমার মনে হচ্ছে, যতক্ষণ না পুলিশ ওখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, নার্সি হোম চিকিৎসা শুরু করবে না। আমি বরং লালবাজারে বলে দেখি যদি করেয়া থানা থেকে তাড়াতাড়ি ওখানে কাউকে পাঠানো যায়।'

‘তাতেই কাজ হবে গো। তুমি বললে কাজ হবে না এটা হতেই পারে না।' ‘আরে না না। দু-একজন চেনাশোনা ছাড়া আর আমাকে কে পাত্তা দেবে? আচ্ছা দেখছি গৌতমকেই ধরতে পারি কিনা।'

‘আর একটা কথা বলছি। আমার সঙ্গে ওই নার্সিং হোমে একটু যাবে ? অমলাদি একেবারে একা পড়ে গেছে। আমাকে খুব করে যেতে বলছে। আমি ওদিকটা ভাল চিনি না। একা গেলে হয়ত জায়গাটাই খুঁজে পাব না। যাবে একটু আমার সঙ্গে? অমলাদি খুব কান্নাকাটি করছে। মেয়েটা এত দুঃখী। ওর জন্যে খুব খারাপ লাগে।' ‘ঠিক আছে। যাব। কিন্তু রাত্তিরের রান্নার কী হবে? ঠিক ছিল না দু-জনে মিলে রাত্তিরে রান্না করব?'

‘আজ রাত্তিরে বাইরে খাব। আমি খাওয়াব। জান তো পার্ক সার্কাসে একটা রয়েল হোটেল হয়েছে। আমাদের একজন টিচার বরের সঙ্গে গত সপ্তাহে খেতে গেছিল। বলল, চিৎপুরের রয়েল হোটেলের মতই ভাল। আমরা হস্টেলে মাঝে মাঝে চিৎপুরের রয়েল থেকে চাঁপ আর রুমালি রুটি আনাতাম। দারুণ।' কেয়ার চোখের কোণে উত্তেজনা ঝিলিক দিচ্ছে।

বেস্ট কেয়ার নার্সিং হোমটা বড়রাস্তার ওপরে নয়। বেকবাগান রো বলে যে মাঝারি রাস্তাটা বাজারের সামনে দিয়ে এজেসি বোস রোড-সার্কাস এভিনিউ-এর দিকে চলে গেছে তার ওপরেও নয়। জায়গাটা ওই অঞ্চলে ঠিকই, কিন্তু একটা গলির মধ্যে। কেয়া একলা এলে চিনে উঠতে পারত না। আদিত্যরা তাদের উবারটা বড়রাস্তার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিল। ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছিল। পায়ে হেঁটে না গেলে নার্সিং হোমটা খুঁজে বার করা যেত না। তাও সামনে পুলিশ দাঁড়িয়েছিল বলে চিনতে সুবিধে হল।

এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায় জায়গাটা উঁচু দরের নয়। বস্তুত, একটা রং-চটা সাইন বোর্ডে বেস্ট কেয়ার নার্সিং হোম কথাটা লেখা না থাকলে বোঝাই যেত না এটা একটা চিকিৎসালয়। একতলায় গরিব মুসলমানদের জন্যে রুটি মাংসের দোকান। দোকানের সামনেই উনুন, মরা আঁচে বিফ কারি সুসিদ্ধ হচ্ছে। তার এক পাশে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। দোতলা-তিনতলা মিলিয়ে নার্সিং হোম। আদিত্য কেয়াকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, পাহারাদার পুলিশ কনসটেবলটি পথ আটকাল ।

‘কোথায় যাবেন ?

‘ওপরে। নার্সিং হোমে।'

‘কী দরকার?’

‘আমাদের রুগি ভর্তি আছে।'

‘কত নম্বর ঘরে? কী নাম?'

‘ঘরের নম্বর তো জানি না। রুগির নাম জয় তরফদার।'

‘জয় তরফদার?' পাহারওলাকে রীতিমত সন্দিগ্ধ দেখাল। ‘যাবার পারমিশন নেই।'

‘আমরা রুগির মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করব। উনি মনে হয় ওপরেই আছেন।' এবার কেয়ার ব্যাকুল গলা ।

‘কারও সঙ্গে দেখা করার পারমিশন নেই। ওপরে পুলিশ এনকোয়ারি চলছে।' পাহারওলা ভারিক্কি গলায় জানাল।

‘যিনি এনকোয়ারি করছেন তাকে একটু বলবেন আদিত্য মজুমদার এসেছে। আপনাদের ওসির কাছে আমার নামটা বলা আছে।'

'অপেক্ষা করতে হবে। মেজবাবু ওপরে আছেন। নিচে নামলে তাকে বলবেন।' 'মহা মুস্কিল হল দেখছি। এ তো কিছুতেই ওপরে উঠতে দেবে না।' আদিত্য বিড়বিড় করে কেয়াকে বলল।

'আশ্চর্য! তোমার নাম শুনেও উঠতে দিল না?' কেয়া যুগপৎ হতাশ ও ক্রুদ্ধ। 'বুঝলে না, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত আমার নামটা। গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।' আদিত্য মুচকি হেসে বলল। 'মনে হচ্ছে, একটা ফোন করতে হবে। গৌতম এখানকার ওসির নম্বরটা ফরোয়ার্ড করে দিয়েছিল।'

মিনিট পাঁচেক ফোনাফুনির পর দেখা গেল পুলিশের ইউনিফর্ম পরা এক স্ফীতোদর মাঝ-বয়সী ব্যক্তি ঈষৎ হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। নির্ঘাৎ মেজবাবু। আরও মিনিট দশেক পরে যখন দোতলার একটা ঘরে জয় তরফদারকে জায়গা দেওয়া হয়েছে এবং বাইরে বারান্দার এক পাশে সরে গিয়ে তার মা কেয়াকে ফিসফিস করে কীসব বলছে তখন মেজবাবু শশীধর মিশ্র আদিত্যকে বলল, 'কেসটা কিন্তু ধামা-চাপা দেওয়া যাবে না স্যার। ব্যাপারটা সিরিয়াস।'

শশীধর অবাঙালি হলেও মোটামুটি পরিষ্কার বাংলা বলে।

'ধামা-চাপা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা শুধু চাইছিলাম ছেলেটার যেন ঠিক মতো চিকিৎসা হয়। ছেলেটা বেঁচে গেলে তো পুলিশেরও লাভ। ও নিশ্চয় কিছু ইনফরমেশন দিতে পারবে।'

'ডাক্তার বলছে ছেলেটা বেঁচে যাবে। তবে ডাক্তার এটাও বলল কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো থেকে বেশ ভাল মতন মেমরি লস বা ডিমেনশিয়া হতে পারে। ছেলেটা কী ধরনের ড্রাগ নিত আমরা এখনও জানি না। তাই ছেলেটা সুস্থ হয়ে উঠলেও কতটা বলতে পারবে সন্দেহ আছে। তাছাড়া সম্ভবত দলের কথা ও বলতে চাইবে না। ড্রাগ পেডলার হিসেবে পুলিশের খাতায় ওর নাম আছে। আগেও ওকে আমরা ধরেছি, কিন্তু খুব বেশি কথা ওর থেকে বার করতে পারিনি।

'আপনাদের এদিকে কি ইদানীং কোনও ড্রাগ-পেডলারের দল বেশি করে অ্যাকটিভ হয়েছে ?'

এই অঞ্চলে ড্রাগের সমস্যাটা বরাবরই ছিল। এখানে কয়েকটা অরগানাইজঞ্চডঞ্চ গ্যাং আছে। এরাই ড্রাগ পেডলিং করে। এলাকা দখল নিয়ে খুন-জখম মারামারি লেগেই থাকত। কিন্তু ইদানীং মনে হচ্ছে খুন-জখম, মারামারি কম। যেন খুব হারমোনিয়াসলি ওপর থেকে কেউ ড্রাগ ব্যবসাটা চালাচ্ছে। এই লোকাল দলগুলো মনে হচ্ছে তাদের সাব-এজেন্ট হয়ে গেছে। ফলে একদিকে যেমন মারামারি কমেছে, তেমনি আবার অন্যদিকে ড্রাগ পেডলিং-এর সমস্যাটা বেড়েছে। এটা শুধু এই অঞ্চলে নয়, সারা কলকাতায়। এই নিয়ে কিছুদিন আগে লালবাজারে একটা বড় মিটিং হয়েছিল। বিভিন্ন থানা থেকে রেপ্রেসেন্টেটিভ গিয়েছিল। আমরাও গিয়েছিলাম। পুলিশ এখনও ওই বড় গ্যাংটার ব্যাপারে কোনও ক্লু পায়নি।'

'আপনি একবার এই জয় তরফদারের বাড়িতে নিশ্চয় যাবেন ?

'সে তো যেতেই হবে। হয়ত ওর ঘরে এখনও কিছু ড্রাগ মজুত আছে। সেটা বার করতে হবে তো।'

'আপনি যখন ওখানে যাবেন, আমাকে একটা খবর দেবেন? আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই। চিন্তা করবেন না। আপনার সঙ্গে যাবার পারমিশান আমি ওপরতলা থেকে জোগাড় করে নেব।'

'ঠিক আছে স্যার। ওপরওলা পারমিশান দিলে আমি বলার কে?'

অমলা তরফদারকে নিয়ে কেয়া এগিয়ে আসছে। আদিত্য এই প্রথম অমলা তরফদারকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেল। সাদামাটা চেহারা, পঞ্চাশ পেরিয়েছে। শাড়ি-জামায় ছিরি-ছাঁদ নেই, পায়ে রবারের চটি। হয়ত তাড়াহুড়োতে বাড়িতে যেটা পরে ছিল সেটা পরেই বেরিয়ে এসেছে।

'আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করতাম। এখন করা যাবে?" অমলা তরফদার আরও এগিয়ে আসতে আদিত্য বলল।

'বলুন কী বলবেন?" অমলাদির ভ্রুকুঞ্চিত মুখে কিছু উৎকণ্ঠা রয়েছে।

'কেয়া বলল, আপনার ছেলে জয় মাধ্যমিকের পর পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল। সেটা কতদিন আগে হবে?'

'জয় তিন বছর আগে একবার মাধ্যমিক দিয়েছিল। পাশ করতে পারেনি। কী বলব, আমার কপাল।'

'তারপর এই তিন বছর কী করছিল?'

'প্রথম দু-বছর কিছুই করত না। এই এক বছর হল একটা কারখানায় কাজ পেয়েছে। আমাদের বাড়ির কাছেই একটা ছোটখাট কারখানায়।'

'আপনি জানতেন আপনার ছেলে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট?'

অমলাদি উত্তর দিচ্ছে না। মাথা নিচু করে আছে।

আদিত্য আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জানতেন আপনার ছেলে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট?' 'একদিনে জানতে পারিনি। একটু একটু করে জেনেছি।'

'আপনার ছেলে যাদের সঙ্গে মিশত আপনি তাদের চিনতেন?'

'পুলিশ আমাকে এই প্রশ্নটাই বারবার করে যাচ্ছে। ওদের যেটা বলেছি, আপনাকে সেটাই বলছি। আমার ছেলের যে বন্ধুদের আমি চিনতাম তারা ওর ছোটবেলার বন্ধু।

তারা ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে খুবই আসত। আজকাল আর আসে না। কেনই বা আসবে? ওরা সকলেই এখন কলেজ-টলেজে পড়ে। আমার ছেলে তো লেখাপড়াই করে না। ওরা আমার ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে কেন? এখন আমার ছেলে কাদের সঙ্গে মেশে আমি কিছুই জানি না।'

'আজ আপনার ছেলে কি বাইরে বেরিয়েছিল? নাকি বাড়িতেই ছিল?'

'সকাল থেকে বাড়িতেই তো ছিল। নিজের ঘরেই ছিল। আড়াইটে নাগাদ ওর ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে দেখি এই অবস্থা।'

'দুপুরে ও কী খেয়েছিল?'

'আমি আর জয় একসঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়া খেয়েছিলাম। ভাত, ডাল, তরকারি, ডিমের ঝোল।'

'আর সকালে?'

'সকালে জয় পাঁউরুটি খেয়েছিল। আর ঘুগনি। আমাদের বাড়ির নিচে একটা চায়ের দোকান আছে, ওখান থেকে আনিয়ে নিয়েছিল। আমি মুড়ি খেয়েছিলাম। জয় মুড়ি খেতে পারত না। দু'বেলা জলখাবারে পাঁউরুটি খেত।' বলতে বলতে অমলা তরফদার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

তাকে দেখে আদিত্যর সত্যিই খারাপ লাগছিল।

(২)

খুব ছোটবেলায় প্রত্যেক পয়লা বৈশাখের দিন আদিত্য নতুন জামা পরে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি যেত। রাত্তিরে বাবা গিয়ে আদিত্যদের নিয়ে আসত। রাত্তিরের খাওয়াটা হত মামার বাড়িতে। আদিত্যর যতদূর মনে পড়ে বাবাকে বাটি ঘুরিয়ে খেতে দেওয়া হত। অন্তত সাত-আটটা বাটি, অর্থাৎ সাত-আটটা পদ। উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়িতে জামাই এলে ওই রকম খেতে দেওয়াই ছিল রীতি। আর একটা কারণ বোধহয় ছিল। আদিত্যর মামার বাড়িতে জামাই ষষ্ঠী হতো না। বাবা অবশ্য তাতে খুশিই ছিল। বাবা বলত, জামাই ষষ্ঠীর নামে জামাই পুজোর এই ব্যাপারটা অতি জঘন্য। আদিত্যর দাদু-দিদা তখনও বেঁচে। হয়ত তাঁরা জামাই ষষ্ঠীর খাওয়াটা জামাইকে পয়লা বৈশাখে খাইয়ে দিতেন। এই দিনটা ছাড়া বাবাকে খুব একটা শ্বশুর বাড়ি যেতে দেখেনি আদিত্য। বিশেষ কোনও উপলক্ষ থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।

মা চলে যাবার পর আদিত্যর মামার বাড়ি যাওয়া খুব কমে গেল। অন্তত পয়লা বৈশাখের দিনটা আর যাওয়া হতো না। তার বদলে সে আর বাবা পয়লা বৈশাখে সারাদিন গান শুনত। কী কী গান শোনা হবে বাবা আগে থেকে বেছে রাখত। হয়ত সারা সকাল নানারকম বিলাওল শোনা হল, আলাইয়া, দেবগিরি, ইমনি, শুক্ল। কিংবা সারং, বৃন্দাবনী, গৌড়, শুদ্ধ। আবার কখনও কখনও সারাদিন রবীন্দ্রনাথের গান, রাজেশ্বরী দত্ত, কনক দাস, মালতী ঘোষাল, অমিয়া ঠাকুর, অমিতা সেন থেকে শুরু করে জর্জ বিশ্বাস,

কণিকা-সুচিত্রা-শান্তিদেব। খুব নতুনদের গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত বাবা পছন্দ করত না। বলত, আজকালকার ছেলেমেয়েদের গলায় জোয়ারি নেই, শুনব কেন? পয়লা বৈশাখের দিন গান শোনার অভ্যেসটা আদিত্যর এখনও রয়ে গেছে।

আজ আবার পয়লা বৈশাখ ফিরে এসেছে। সকাল থেকে কেয়া রান্নাঘরে। সুভদ্র একটু পরেই এসে পড়বে। দুপুরে এখানে তার নেমন্তন্ন। আদিত্য গান শুনতে শুনতে রূপলেখা দত্ত বা বলা উচিত রূপলেখা দত্ত পরিচয় দিয়ে যে মহিলা অশনি রায়ের সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল, তার কথা ভাবছিল। এবং দুটো খুনের কথাও। অশনি রায়ের কথা যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে অনেকগুলো প্রশ্ন ওঠে যার আপাতগ্রাহ্য কোনও উত্তর নেই। প্রশ্নগুলো একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে-মড়িয়ে একটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে আছে। জটটা খুব সাবধানে একটু একটু করে ছাড়াতে হবে। প্রথম প্রশ্ন, যদি পুরো ব্যাপারটা অশনি রায়কে ফাঁসাবার একটা চক্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে জানতে হবে অশনি রায় কার পাকা ধানে মই দিয়েছিল যে তার বিরুদ্ধে ওইরকম একটা জঘন্য চক্রান্ত করা হল? যদি আপাতত ধরে নেওয়া হয় অশনি রায়কে ফাঁসানোটা কারও পক্ষে দরকার হয়ে পড়েছিল, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় ফাঁসানোটা কি অন্যভাবে করা যেত না? তার জন্যে দু-দুটো খুন করার ঝুঁকি নিতে হল? কিংবা হয়ত খুন করাটাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু অশনি রায় প্রেক্ষাপটে না থাকলে সরাসরি খুনির ওপর সন্দেহ পড়ত। হয়ত, সেই সন্দেহটা সরানোর জন্যে অশনি রায়কে বলির পাঁঠা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে, ওই দম্পতি খুন হবার ফলে কার লাভ হল? কার ওপর স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ পড়তে পারত? আরও দু-একটা প্রশ্ন। বলির পাঁঠা হিসেবে অশনিকেই বা বেছে নেওয়া হল কেন? এটা কি নিছক কাকতালীয়, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ ছিল? আরও প্রশ্ন, নকল রূপলেখা দত্ত এখন কোথায়? সে কি বেঁচে আছে? বনানী দাসের ব্যাপারটাও ভাবতে হবে। সে-ই কি তবে অশনিকে জেলে পাঠানোর জন্য দু-দুটো নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলল? বিশ্বাস করা শক্ত। তবে মানুষের চরিত্র যে কত বিচিত্র হতে পারে সেটা আদিত্য তার অভিজ্ঞতা থেকে জানে।

'কিশোরী আমোনকর বিভাস গাইছিলেন। হঠাৎ পঞ্চম থেকে কোমল ঋষভের সিঁড়ি বেয়ে এমন করে ষড়জে এসে নামলেন যে আদিত্য বেশ কিছুক্ষণ রূপলেখা দত্ত, মৃত্তিকা মিত্র, পার্থ মিত্র, অশনি রায়, জোড়া খুন, বনানী সব ভুলে গিয়ে উদাস হয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল। অবশ্য জানলা দিয়ে সে কিছু দেখছিল না, শুধু শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়েই ছিল, আর তার মাথার মধ্যে বিভাসের পাঁচটা সুর খেলা করছিল। আদিত্যর হঠাৎ মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছিল, বিভাস রাগটা কিশোরী আমোনকরের এতটাই পছন্দ যে তিনি তাঁর বড় ছেলের নাম রেখেছিলেন বিভাস ।

কলিং বেল বাজছে। নিশ্চয় সুভদ্র এসে গেছে।

'তোমার তো আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না। আগে মাঝে মাঝে ফোন করে চলে আসতে। আজকাল ফোনও কর না, আসও না।' চায়ের কাপ টেবিলে রেখে কেয়া বলল। আসলে সুভদ্র মাজির চরিত্রে একটা আশ্চর্য স্নিগ্ধতা আছে। কে বলবে পুলিশ অফিসার? তার সঙ্গে নানারকম আবোলতাবোল গল্প করলে কেয়া এবং আদিত্য দুজনেরই মনটা হালকা হয়ে যায়।

'হালে কাজের চাপটা খুব বেড়েছে বৌদি। অ্যাডিশানাল কমিশানার সাহেব একটা বড় কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। সেটা সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।'

'বড় কাজের দায়িত্ব পাওয়াটা তো ভাল কথা।' আদিত্য চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল।

'কাজটা বেশ কঠিন দাদা। আপনার সাহায্য ছাড়া হবে না। আমি ভেবেই এসেছি আপনার কাছে পরামর্শ চাইব। তার আগে এই অশনি রায়ের কেসটা বলে নিই।''এই রে, মাংসটা বোধহয় ধরে গেল। কী রকম যেন গন্ধ বেরোচ্ছে না?' প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা না করেই কেয়া তীর বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

আদিত্য খাতা বার করেছে। কলম। এই কলমটা তার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া। পুরোনো পেলিক্যান। কালির পেন। এটা নিয়ে সে বাইরে বেরোয় না। যে পেনটা নিয়ে বাইরে বেরোয় সেটাও অবশ্য কালির। আদিত্য এখনও কালির পেনেই লেখে। পুরোনো অনেক কিছুর মতো এই কালির পেনে লেখার অভ্যেসটাও সে ছাড়তে পারেনি।

'অশনি রায়ের কেসটা একেবারে প্রথম থেকে শুনতে চাই। মানে, তুমি যেটুকু জান।'

'কেসটা প্রাথমিকভাবে ইনভেসটিগেট করার দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছিল। আমি তখন লেক টাউন থানায় পোস্টেড। আগের রাত্তিরে নাইট ডিউটি ছিল। পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ বাড়ি ফেরার তোড়জোড় করছি, এমন সময় ফোন এল বাঙ্গুরের একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে স্বামী-স্ত্রী দুজনে খুন হয়েছে। বড়বাবু আমাকেই যেতে বললেন, যাবার মতো তখন আর কেউ থানায় ছিল না। গিয়ে দেখি ভয়ঙ্কর কাণ্ড। চারতলার একটা ফ্ল্যাটে শোবার ঘরে স্বামী-স্ত্রী খুন হয়ে পড়ে রয়েছে। মেঝেটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।'

'খুনগুলো কে আবিষ্কার করল?'

'কাজের মাসি। কর্তা গিন্নি দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে বলে কাজের মাসির কাছে চাবি দেওয়া থাকত। ভোরবেলা মাসি ফ্ল্যাটে ঢুকে দ্যাখে কর্তা গিন্নি মরে পড়ে আছে । সে তখন সিকিউরিটিকে খবর দেয়। বাড়িটাতে তখনও খুব বেশি লোক আসেনি। চারতলার অন্য দুটো ফ্ল্যাট প্রায় ফাঁকা। দোতলায় মাত্র একঘর বাসিন্দা ।'

'কীভাবে হয়েছিল খুনগুলো? মানে, কী দিয়ে মারা হয়েছিল দুজনকে?'

'আশ্চর্য ব্যাপার, দু'জনকে দু'ভাবে মারা হয়েছিল। মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে স্ত্রীকে খুন করা হয়েছিল। আর স্বামীকে মারা হয়েছিল গুলি করে। স্ত্রীর মাথায় একটাই আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। তাতেই মৃত্যু। হয় পেশাদার কেউ খুনটা করেছিল যে জানে মানুষকে একটা আঘাতে মেরে ফেলতে হলে ঠিক কোথায় আঘাত করতে হয়। আর তা না হলে আঘাতটা দুর্ঘটনাক্রমে এমন আলটপকা জায়গায় পড়েছিল যে মহিলার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে।'

'আর অন্য খুনটা?'

'সেখানেও কিন্তু একটা প্রফেশানাল ফিনিশ ছিল। একটাই গুলি বুকের বাঁ দিক দিয়ে ঢুকে হার্ট ভেদ করে চলে গিয়েছিল।'

'বন্দুকটা পাওয়া গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। নাইন এম এম চিনে পিস্তল। আজকাল কালোবাজারে প্রচুর পাওয়া যায়। লাসের পাশে মেঝের ওপর পড়েছিল।'

"ওটা কি চোরাই পিস্তলই ছিল।'

'তাই তো মনে হয়। বাড়ি থেকে কোনও পিস্তলের লাইসেন্স খুঁজে পাওয়া যায়নি। অশনি রায়ও বলেছিল তার কোনও বন্দুক-পিস্তলের লাইসেন্স নেই ।

'কারও ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিল পিস্তলের ওপর?

'ছিল। অশনি রায়ের হালকা ফিঙ্গারপ্রিন্ট পিস্তলের ওপর পাওয়া গিয়েছিল।' সুভদ্র একটু ইতস্তত করে বলল। 'কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্টটা এত হালকা কেন বোঝা যায়নি।' 'দ্যাখো, অশনি রায় আমাকে বলেছে, সেই রাত্তিরে ওই বাড়িটাতে ঢোকার পর ক্লোরোফর্ম দিয়ে কেউ তাকে কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান করে দিয়েছিল। এমন তো হতে পারে সেই সময় খুনী পিস্তলটা নিয়ে এসে অশনির হাতে মুঠো করে ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু অশনি তখন অজ্ঞান হয়ে ছিল, পিস্তলটা খুব শক্ত করে তার হাতে ধরানো যায়নি। তাই ফিঙ্গারপ্রিন্টটা হাল্কা পড়েছিল। এটা তো হতেও পারে, তাই না?'

'ঠিক এই যুক্তিটাই অশনি রায়ের লইয়ার ব্যারিস্টার অরুণকান্তি ব্যানার্জী দিয়েছিলেন। এটা হওয়া অসম্ভব নয়, তবে এটাই যে হয়েছিল সেকথাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। অন্তত ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টদের তাই মত।'

'আচ্ছা, আর ওই মহিলাকে যেটা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল সেটা পাওয়া গিয়েছিল ?'

'মহিলাকে সম্ভবত একটা সরু, লম্বা কাঁচের ফুলদানি দিয়ে মাথায় মারা হয়েছিল। ফুলদানিটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে মাটিতে পড়েছিল। ভাঙা কাঁচে আমরা রক্তের চিহ্ন পেয়েছিলাম। রক্তটা মহিলার। ওর জোড়া আর একটা ফুলদানি ক্যাবিনেটের ওপর ছিল। সেটা দেখে মারণাস্ত্রর চেহারাটা আন্দাজ করা গিয়েছিল।'

'খুন হওয়া পুরুষ এবং মহিলা সম্বন্ধে পুলিশ কতটুকু জানতে পেরেছিল?'

'প্রাথমিক তদন্তটা তো আমিই করেছিলাম। আমি যেটুকু জানতে পেরেছিলাম সেটা বলছি।' সুভদ্র মাজি বুকপকেট থেকে একটা নোটবুক বার করল। 'যাঁরা খুন হয়েছিলেন তাঁরা ওই ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন, বাড়ির মালিক অন্য লোক। খুন হওয়া পুরুষের নাম পার্থ মিত্র, মহিলার নাম মৃত্তিকা মিত্র। খুন হবার বছর খানেক আগে তাঁরা ওই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। ফ্ল্যাটবাড়িটা তখনও ভাল করে তৈরি হয়নি। এর আগে ওরা বেলেঘাটায় যে বাড়িটাতে থাকতেন সেখানে বাড়িওলা ওদের বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে খুব তাগাদা লাগাচ্ছিল। তাই তাড়াহুড়ো করে অর্ধেক তৈরি হওয়া এই ফ্ল্যাটটাতে ওদের এসে উঠতে হয়েছিল।'

এই ফ্ল্যাটটার মালিক কে?'

সুভদ্র তার নোটবই-এর দিকে তাকাল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় থেমে গেল। বলল, "ওই ফ্ল্যাটটি পল্লব সেন বলে এক ভদ্রলোকের। সেন বেকারির মালিক। এক সময় এদের অনেকগুলো বেকারি ছিল। পাঁউরুটি, কেক এইসব তৈরি হত। কলকাতায় বেশ বড় ব্যবসা ছিল এদের। মফস্বলেও ভাল বিক্রি হতো। ওদের কেক-রুটি-বিস্কুট কিন্তু এখন আর তেমন চলে না।"

'সেন বেকারির কথা জানি। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে সেন বেকারির আনস্লাইড্ পাঁউরুটি আসত। মাখনের মত নরম। তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। এখন আর ওই রুটি দেখতে পাই না।'

'আমি তো মফস্বলে বড় হয়েছি। আমাদের মেদিনীপুরেও কিন্তু সেন বেকারির কেক-বিস্কুট বেশ ভাল চলত। এখনও দু-একটা দোকানে পাওয়া যায়।'

'তা এই পল্লব সেনের সঙ্গে মৃত্তিকা মিত্রদের আলাপ হল কী করে?' 'আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। মৃত্তিকা মিত্রর স্বামী পার্থ মিত্রর একটা ডিসট্রিবিউটার কম্পানি ছিল। দোকানে দোকানে কেক-পাঁউরুটি-বিস্কুট এইসব ডিসট্রিবিউট করত। বেশ কিছুদিন ধরে সেন বেকারির সোল ডিসট্রিবিউটার ছিল অন্য একটা কম্পানি। কিছুদিন আগে সেই আগের কম্পানিটার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে পার্থ মিত্রর কম্পানিকে সেন বেকারির সোল ডিস্ট্রিবিউটার করা হয়েছিল। যখন ঘটনাটা ঘটে সেই সময় পার্থর কম্পানিই সেন বেকারির জিনিসপত্র শহরের এবং মফস্বলের দোকানগুলোতে পৌঁছে দিচ্ছিল। সেই সূত্রে পার্থ মিত্রর সঙ্গে সেন বেকারির যোগাযোগ। কলকাতায় সেনদের একাধিক বাড়ি আছে। এই ফ্ল্যাটটা এবং তার পাশের দুটো ফ্ল্যাট তারা কোনও এক সময় কিনেছিল। একটা ফ্ল্যাটে সেন বেকারি পার্থ মিত্র এবং তার স্ত্রীকে থাকতে দিয়েছিল। পাশের ফ্ল্যাট দুটো গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে যখন ঘটনাটা ঘটে তখন বাড়িটা পুরো তৈরি হয়নি। তাই অন্য তলাগুলো প্রায় ফাঁকাই ছিল।' 'পল্লব সেন ছাড়া সেন বেকারির আর কোনও মালিক নেই? এটা অবশ্য আমি নিছক কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করছি। আসলে সেন বেকারির ব্যাপারে আমার একটা নস্টালজিয়া আছে।'

সুভদ্র আবার তার নোটবই-এর দিকে তাকাল। বলল, 'বছর আটেক আগে পল্লব সেনের দাদা সৌরভ সেন একটা দুর্ঘটনায় মারা যান। সেই থেকে সৌরভের স্ত্রী মালবিকা সেন সেন বেকারির অর্ধেক মালিক, বাকি অর্ধেকের মালিক পল্লব সেন।'

আদিত্য মনে মনে সুভদ্র মাজির কাজের প্রশংসা না করে পারল না। ছেলেটা সব প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে। আদিত্য আবার একটা কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কেয়া ঘরে ঢুকেছে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

"আমার কিন্তু এখনও ঘন্টা খানেক লাগবে। তোমরা চা খাবে?'

'বৌদি এত কষ্ট করে রান্না করছেন, আমার কিন্তু ভীষণ লজ্জা করছে।' সুভদ্রর গলাটা আন্তরিক শোনাল।

'যা লজ্জা করার এখন করে নাও। খেতে বসে কোনও লজ্জা করা চলবে না। তোমার দাদার সঙ্গে কথা বল, আমি চা নিয়ে আসছি।' কেয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আদিত্য দেখল ঘড়িতে বারোটা পঁচিশ। তেমন কিছু বেলা হয়নি। এক কাপ চা খাওয়া যেতেই পারে।

একটু পরে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আদিত্য জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, অশনির বিরুদ্ধে কেসটা পুলিশ ঠিক কী ভাবে সাজিয়েছিল তোমার মনে আছে? মানে, কী কী প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল অশনির বিরুদ্ধে?'

সুভদ্র মাজি একটু ভাবার সময় নিল। কয়েকবার নোটবই-এর পাতা খুলে দেখল। তারপর বলল, 'প্রথমত, রাজারহাটের যে ক্যাফেটাতে অশনি তার বান্ধবীকে নিয়ে যেত তার ওয়েটার মেয়েটি অশনি এবং মৃত্তিকা দুজনকেই শনাক্ত করেছে।'

'যে মৃত্তিকা খুন হয়েছে তাকে?'

'হ্যাঁ, তাকে। তার অনেকগুলো ছবি আমরা ওই ফ্ল্যাটটাতে পেয়েছিলাম। সেটাই ওয়েটার মেয়েটিকে দেখানো হয়েছিল।'

'ক্যাফেতে আর কোনও কর্মচারি থাকত না?'

'না। নির্জন জায়গায় ছোট্ট ক্যাফে। ওই মেয়েটিই খাবার দিত আবার ওই মেয়েটিই ক্যাশে বসত। মালিক কালেভদ্রে আসত। এছাড়া একজন কুক ছিল, সে রান্নাঘর থেকে বেরোতোই না।'

'তারপর? পরের প্রমাণ? '

'পরের প্রমাণ মোবাইলের কল লিস্ট। মৃত্তিকা মিত্রর বাড়ি থেকে একটা মোবাইল পাওয়া গিয়েছিল যেটা থেকে অসংখ্যবার অশনিকে ফোন করা হয়েছিল। দু'জনের মধ্যে বেশ কিছু হোয়াটস্ অ্যাপ মেসেজও বিনিময় হয়েছিল যেগুলো পুলিশের হাতে এসেছে। তাছাড়া খুনের রাত্তিরে অশনি যে ওই ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল এবং ঘন্টা খানেক পরে বেরিয়ে এসেছিল সেটা সিসি টিভিতে যেমন ধরা পড়েছে তেমনি বাড়ির সিকিউরিটি ছেলেটাও সেটা দেখেছে।'

'এই মোবাইলটা কি ডেডবডির পাশেই পাওয়া গিয়েছিল?'

'যে মোবাইলে অশনির সঙ্গে চ্যাটগুলো ছিল এবং যেটা থেকে সাধারণত অশনির নম্বরে কল করা হতো সেটা কিন্তু ডেডবডির পাশে পাওয়া যায়নি। কিছুদিন পরে পুলিশ সেটা বাড়ির মধ্যেই একটা লুকোনো জায়গায় খুঁজে পায়। হয়ত চ্যাটগুলো ছিল বলেই মোবাইলটা লুকোনো ছিল। কিংবা হয়ত মৃত্তিকা চায়নি তার স্বামী জানুক যে অশনি রায়ের নম্বরটা তার মোবাইলে সেভ করা আছে। আরও দুটো মোবাইল মৃতদেহগুলোর পাশে পাওয়া গিয়েছিল। একটা পার্থ মিত্রর নামে রেজিস্টার্ড। অন্যটা মৃত্তিকর মিত্রর নামে। মৃত্তিকার এই মোবাইলটায় কিন্তু অশনির সঙ্গে কোনও চ্যাট ছিল না। তবে এই মোবাইলটা থেকেও অশনির নম্বরে কয়েকবার ফোন করা হয়েছিল।' 'যে মোবাইলে মেসেজগুলো পাওয়া গেয়েছিল সেটার সিমকার্ডটা কার নামে?' 'সেটাই বেশ অদ্ভূত। এই লুকোনো মোবাইলটা ছিল রূপলেখা দত্ত বলে একজনের নামে। সিমকার্ডের ঠিকানাটা অবশ্য ভুয়ো।'

'তার মানে মৃত্তিকা মিত্র রূপলেখা দত্ত সেজে একটা ভুয়ো ঠিকানাযুক্ত মোবাইল থেকে অশনিকে ফোন করত। তার আসল পরিচয় সে অশনিকে জানাতে চায়নি।'

'আপাতদৃষ্টিতে সেটাই তো মনে হচ্ছে।'

'পুলিশ কি বলছে দুটো খুনই অশনি করেছে?'

'না। পুলিশ বলছে, অশনির সামনে মৃত্তিকার সঙ্গে তার স্বামী পার্থ মিত্রর সম্ভবত কথা কাটাকাটি হয়েছিল। নিশ্চয় সেটা অশনির সঙ্গে মৃত্তিকার সম্পর্ক নিয়ে। রাগের মাথায় পার্থ ফুলদানিটা তুলে মৃত্তিকার মাথায় মারে এবং তাতেই মৃত্তিকার মৃত্যু হয়। এর ফলে অশনি পকেট থেকে পিস্তল বার করে পার্থর দিকে গুলি চালায় এবং পার্থ মারা যায়।'

'পুলিশের গল্পটা তো টাইট শোনাচ্ছে। তোমার তাহলে কেন মনে হল অশনি রায় খুনটা করেনি?'

'বলতে পারেন, প্রমাণগুলো এত নিশ্ছিদ্র বলেই সন্দেহ হল। এত প্রমাণ রেখে কেউ খুন করে নাকি? অশনিকে খুব মাথা গরম লোক বলেও মনে হয় না। তাছাড়া যে আঘাতে মৃত্তিকা মিত্র মারা যায় সেটা এত প্রিসাইজ যে একজন পেশাদারই ওরকম আঘাত করতে পারে। পার্থ মিত্রর কি সেরকম ট্রেনিং ছিল? তাছাড়া গুলিটাও প্রফেশানাল হাতের কাজ। অশনি কখনও আদৌ বন্দুক চালাতে শিখেছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সব মিলিয়ে মনে হল, কেউ অশনিকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে না তো? এইসব নিয়ে আমি যেই প্রশ্ন করতে শুরু করলাম অমনি আমাকে কেসটা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। ফলে আমার সন্দেহ আরও গাঢ় হল।'

'ব্যারিস্টার ব্যানার্জী কি এই কথাগুলোই কোর্টে বলে অশনি রায়কে বেকসুর খালাস করিয়েছিলেন?"

'আমার সঙ্গে বেশ কয়েকবার ব্যারিস্টার ব্যানার্জীর কথা হয়েছিল। সবই ইনফর্মালি কারণ আমি তার বেশ কিছুদিন আগে কেসটা থেকে সরে গেছি। আমার কতকগুলো কথা উনি ওঁর মতো করে কোর্টে বলেছিলেন। তাছাড়া একটা নতুন এভিডেন্স উনি জোগাড় করেছিলেন। ওই ফ্ল্যাটবাড়ির একটা সিসি টিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছিল বাড়ির পেছন দিকের পাঁচিল টপকে কেউ পালাচ্ছে। সময়টা মোটামুটি খুন হওয়ার সময়ের সঙ্গে ম্যাচও করে যাচ্ছে। ব্যারিস্টার ব্যানার্জী কোর্টে প্রমাণ করলেন কেউ যদি বাড়ির পেছন দিকের বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে ড্রেনপাইপ বেয়ে নিচে নেমে যায় তাহলে সে সিসি টিভিতে ধরা পড়বে না। তবে পাঁচিল টপকে বাড়ির বাইরে যাবার সময় সিসি টিভিতে তাকে দেখা যাবে। সবার ওপরে ছিল ব্যারিস্টার ব্যানার্জীর অসাধারণ ওরেটরি। ফলে ডিভিশন বেঞ্চ আসামীকে বেকসুর খালাস করে দিল।'

'মাংসটা কোথা থেকে কিনেছিলে গো?' কেয়া ঘরে ঢুকেছে।

'সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ আর গ্রে স্ট্রীটের মোড়ের দোকানটা থেকে। কেন খারাপ মাংস দিয়েছে?' আদিত্য ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'খারাপ কী বলছো, দুর্দান্ত মাংস দিয়েছে। কী তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে গেল। আমি চানে যাচ্ছি। বেরিয়ে খেতে দেব।' কেয়া আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গুরুভোজন হয়ে গেল। এতটাই যে, খাবার পরে সুভদ্র বলল, "আজ আর আমার নতুন কাজটার কথা বলছি না আদিত্যদা। এত খাওয়ার পর কথাই বলতে পারছি না। এই চেয়ারে বসে বসেই একটু চোখ দুটো বন্ধ করছি। আমার সমস্যাটা নিয়ে আরেক দিন আসব।'

(৩)

বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ-এ একসময় খুব জল জমত। আদিত্যর মনে পড়ে কয়েক বছর আগেও সে খবর কাগজে ছবি দেখেছে একটা অতিবৃষ্টির পর সারা কলকাতা শহরটা যখন শুকনো খটখটে হয়ে আসছে তখনও বাঙ্গুরে নৌকো চলছে। রাস্তাটা বাটির মতো। দক্ষিণে ভি আই পি রোড থেকে ঝাঁপ খেয়ে নিচে নেমে গেছে। তারপর অনেকটা সমতল। শেষে উত্তর-মুড়োয় পৌঁছে রাস্তাটা যশোর রোডে গিয়ে উঠেছে। উত্তর দিকের তুলনায় দক্ষিণের ঢাল বেশি। তাই ভি আই পি-র দিকটায় বেশি জল জমে। ইদানীং অবশ্য সকলে বলছে, এই অঞ্চলে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। বৃষ্টিতে জল জমলেও নাকি তাড়াতাড়ি নেমে যাচ্ছে।

যশোর রোডের দিকটা এ-ব্লক, ভি আই পি-র দিকটা বি। আদিত্য যশোর রোডে বাস থেকে নেমে দেখল রাস্তার মোড়ে একটা বাস গুমটি রয়েছে, একটা পুরোনো কালিবাড়ি। সেসব পেরিয়ে কিছুটা হাঁটলে রাস্তাটা

ইংরেজি ওয়াই-এর মতো দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা ফলা নির্জন হয়ে ঢুকে গেছে জনবসতির গভীরে। অন্যটা জমজমাট, দোকান-বাজার সমেত এগোতে এগোতে, ভি আই পি রোডে গিয়ে উঠেছে। দুভাগ হবার জায়গা থেকে জমজমাট দ্বিতীয় রাস্তাটা ধরে আরও কিছুটা হাঁটলে বাঁ দিকে পাশাপাশি দুটো বড় ওষুধের দোকান চোখে পড়বে। তার ঠিক উলটো দিকে চারতলা একটা ফ্ল্যাটবাড়ি। এখানেই তিন বছর আগে মৃত্তিকা মিত্র আর তার স্বামী পার্থ মিত্র খুন হয়েছিল। আদিত্য ঠিকানা মিলিয়ে দেখে নিল।

বাড়িটা সদ্য রঙ হয়েছে, বৈশাখের রোদ্দুরে ঝলমল করছে। চারদিকে সাদা পাঁচিল, তার মধ্যিখানে কালো লোহার গেট। নয়নাভিরাম। গেটে নীল ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি বসে বসে খবর কাগজ পড়ছে। বুড়ো মানুষ। আদিত্যর উপস্থিতি ঠাহর করে মুখ তুলে তাকাল ।

'কোথায় যাবেন?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'৪০১-এ যাব। কেউ বাড়িতে আছে?' আদিত্য সাবধানে জিজ্ঞেস করল। মৃত্তিকা মিত্রর ফ্ল্যাটের নম্বরটা আদিত্য জেনে এসেছিল।

'মেমসাহেব আছেন। কী দরকার?'

'একটা এসি বসাতে হবে। কোথায় বসবে একটু দেখে যাব। মেমসাহেব জানেন আমি আসব।' আদিত্য মুখের পেশি বিন্দুমাত্র কুঞ্চিত না করে ডাহা মিথ্যে বলল। 'ঠিক আছে। যান। ডানদিকে গেলে লিট্।' লোকটা আবার খবর কাগজে মন দিল।

সিঁড়ির নিচে লেটারবক্সের সারি। লিফটে ওঠার আগে আদিত্য গুনে দেখল সবসুদ্ধু সাতটা লেটারবক্স, প্রতিটির ওপরে ফ্ল্যাটের নম্বর লেখা। তার মানে, ফ্ল্যাটের সংখ্যাও সাত, দোতলায় তিনটে, ২০১ থেকে ২০৩, তিনতলায় তিনটে, ৩০১ থেকে ৩০৩, আর সমস্ত চারতলাটা জুড়ে একটাই ফ্ল্যাট, ৪০১। ৪০১ নম্বর ফ্ল্যাটটা বাদ দিয়ে আর সব কটা লেটারবক্সের ওপরেই অবাঙালি নাম। ৪০১ নম্বর নামাঙ্কিত লেটারবক্সে কোনও ব্যক্তির নাম নেই, শুধু বড় বড় অক্ষরে লেখা সেন বেকারি।

স্বয়ংচালিত লিফ্ট। আদিত্য লিফটে উঠে চার নম্বর বোতামটা টিপল। লিফ্ট চারতলায় পৌঁছতেই মনে মনে নিজের মুখের ওপর একটা কাঠিন্যের আস্তরণ নিয়ে এল আদিত্য। ৪০১ নম্বর ফ্ল্যাটের মেমসাহেবকে বসে আনার জন্যে এটার দরকার হতে পারে।

দু-বার বেল বাজানোর পরেও দরজা খুলছে না দেখে আদিত্য ভাবছিল কী করবে। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। হয়ত মেমসাহেব স্নানে ঢুকেছেন। আদিত্য যখন তৃতীয়বার বেল বাজানোর জন্যে কলিং বেলে হাত ঠেকিয়েছে ঠিক তখনই দরজাটা খুলে গেল। ফরসা পুতুল-পুতুল একটি মেয়ে, বয়েস বড়জোর তিরিশ পেরিয়েছে। আদিত্যর অনুমান ঠিক। মেয়েটির মাথায় তোয়ালে জড়ানো, চুল থেকে জল ঝরে পড়ছে। আদিত্যর দিকে মেয়েটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিছুটা আশঙ্কাও কি রয়েছে সেই দৃষ্টিতে?

'আমার নাম আদিত্য মজুমদার। আমি মৃত্তিকা মিত্র, পার্থ মিত্রর মার্ডার কেসটা ইনভেস্টিগেট করছি। এই ফ্ল্যাটটা একবার দেখতে চাই।' আদিত্য ভারিক্কি পুলিশি গলায় বলল যাতে মেয়েটা ধরে নেয় সে পুলিশের লোক। বেসরকারি গোয়েন্দা শুনলে অনেকেই ঢুকতে দেয় না।

মেয়েটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। আদিত্য কী বলছে, মনে হয় বুঝতে পারছে না ।

'আপনি জানেন বোধহয় তিন বছর আগে এই ফ্ল্যাটে দুটো খুন হয়েছিল। আমি সে ব্যাপারে ইনভেস্টিগেট করতে এসেছি।'

'ও সেই মার্ডার কেসটা।' মেয়েটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে। তার গলায় স্পষ্টতই একটা স্বস্তির আভাস। বোধহয় সে অন্য কিছুর ভয় করছিল। 'কিন্তু সেই কেসটা তো মিটে গেছে। আগে অনেকবার এখানে পুলিশ এসেছিল। আজকাল তো আর আসে না।' মেয়েটির গলায় একটা সারল্য আছে।

‘কেসটা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে মিটেছে, কিন্তু এবার ডিভিশন বেঞ্চে যাবে। তাই আবার ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে। হয়ত নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যেতে পারে।'

‘ঠিক আছে ভেতরে আসুন।' মেয়েটি অনিচ্ছুক গলায় বলল। তার গলায় এখন আশঙ্কার বদলে বিরক্তি। ‘আমরা আর কতবার হ্যারাড্ হব?”

‘বেশিক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করব না। কিন্তু বুঝতেই পারছেন এটা আমার কাজ, আমাকে করতেই হচ্ছে।'

মেয়েটি আদিত্যকে একজন পুলিশ অফিসার বলে ধরে নিয়েছে।

‘আপনি বসুন, আমি আসছি।' আদিত্যকে বসবার ঘরে বসিয়ে মেয়েটি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। খুব সম্ভবত পোষাক পাল্টাতে গেল।

বসার ঘরটা খুব বড় নয়। আদিত্য ভেবেছিল আরও অনেক বড় হবে, যেহেতু পুরো তলাটা জুড়ে একটা ফ্ল্যাট করা হয়েছে। একটা সোফা সেট ঘরের সিংহভাগ দখল করে রয়েছে। বাকি জায়গায় একটা ক্যাবিনেট যার নিচের দিকটায় কিছু বই দুটো আর্থার হেইলি, কয়েকটা সিডনি শেলডন, তার পাশে গীতবিতান, শরৎচন্দ্র। ক্যাবিনেটের ওপরের অংশে দু'একটা ঘর সাজানোর জিনিস, নটরাজ, গণেশ। সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো তিনজনের গ্রুপ ফটো, একটি পুরুষ, একটি মহিলা এবং একটি বালিকা। মহিলাটিকে চিনতে অসুবিধে হয় না, ইনিই একটু আগে আদিত্যকে দরজা খুলে দিয়েছেন। আন্দাজ করা যায় পুরুষটি মহিলার স্বামী এবং বালিকাটি এদের কন্যা। ‘আপনাদের এই ফ্ল্যাটটা কি পুরো চারতলাটা জুড়ে?' গৃহকর্ত্রী ফিরে আসার পর আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

‘না, না। আমাদের ফ্ল্যাটটা খুবই ছোট। পুরো তলাটার রাফলি ওয়ান-থার্ড। নিচের ফ্ল্যাটগুলো যেমন। চারতলার বাকি স্পেশটা অফিসের গোডাউন। এই ফ্ল্যাটটা আসলে আমার স্বামীর অফিস থেকে আমাদের থাকতে দিয়েছে।' ‘তার মানে আপনার স্বামী সেন বেকারিতে চাকরি করেন?'

‘হ্যাঁ, উনি সেন বেকারির ডিসট্রিবিউশান ম্যানেজার।'

‘এই ফ্ল্যাটটাতে কে কে থাকে?”

‘কে আর থাকবে? আমি, আমার মেয়ে আর আমার স্বামী। তবে আমার স্বামী খুব বেশি সময় থাকে না।'

‘কোথায় যান আপনার স্বামী?”

‘ওকে মাসের মধ্যে কুড়ি-পঁচিশ দিন বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। বেশিরভাগটাই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে। কখনও কখনও পাটনা বা রাঁচিতেও যেতে হয়। মানে, যেখানে যেখানে সেন বেকারির প্রডাক্ট বিক্রি হয় সেখানে সেখানে গিয়ে সুপারভাইজ করতে হয় মালগুলো ঠিকমতো পৌঁছল কিনা। খুব খাটনির কাজ। আমার মেয়ে তো বাবাকে পায়ই না বলতে গেলে।'

‘আপনার মেয়ে এখন কোথায়?'

‘কোথায় আবার? স্কুলে।' আদিত্যর প্রশ্নে মেয়েটি যেন অবাক হয়েছে। ‘চারটের সময় স্কুল বাসে ফিরবে।'

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে তো বটেই। এখন তো ইস্কুলেই থাকার কথা।' আদিত্য একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসল। তারপর বলল, “ম্যাডাম, আপনার নামটাই তো জানা হল না।

‘আমার নাম অনন্যা, অনন্যা সাহা । '

‘আর আপনার স্বামী?'

‘শুভব্রত সাহা।'

'আপনারা কতদিন এখানে আছেন?'

‘তা প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেল।'

‘এর আগে কোথায় থাকতেন?'

‘দমদমে, একটা ভাড়া বাড়িতে।'

'আপনার স্বামী কি তখনও সেন বেকারিতেই কাজ করতেন ? '

'অনেক আগে আর একটা কম্পানিতে কাজ করতেন। ওখান থেকে সেন বেকারিতে। তারপর যখন ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজার হলেন তখন আমরা এই কোয়ার্টারটা পেলাম।'

'বাঃ, সে তো খুব ভাল কথা।'

'লোকে বলবে ভাল কথা, কিন্তু আমার তা মনে হয় না। ডিসট্রিবিউশন ম্যানেজার হবার পর থেকে আমার স্বামী শুধু যে বাড়িতে কম থাকেন তাই নয়, সব সময় দেখি নানা দুশ্চিন্তা ওর মাথায় ঘুরছে। বাড়িতে যখন থাকে তখন মাঝে মাঝে দেখেছি মাঝরাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে বলে ঘুম আসছে না, তুমি ঘুমিয়ে পড়। আমার মনে হয় আগে আমরা অনেক ভাল ছিলাম। হয়ত টাকা-পয়সার টানাটানি ছিল। কিন্তু সংসারে সুখের অভাব ছিল না। আমি অনেকবার আমার স্বামীকে এই চাকরিটা ছেড়ে দিতে বলেছি। ও বলে, তা হয় না। কেন হয় না, আমি জানি না।' অনন্যা সাহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আদিত্য ভাবছিল, বোধহয় সব এক্সিকিউটিভের বৌদেরই এরকম সমস্যা হয়। তবে সেন বেকারি কী এমন কম্পানি যে সেখানে কাজ করার এত চাপ থাকবে? কিংবা হয়ত ছোট, ডুবন্ত কম্পানি বলেই এত চাপ। সে মুখে বলল, 'আপনাদের ভেতরের ঘরটা একটু দেখা যাবে? মানে, যে ঘরে খুনটা হয়েছিল?'

অনন্যা সাহা ইতস্তত করছে। 'শোবার ঘর তো, একটু নোংরা হয়ে আছে। আমি চান করে উঠে পরিষ্কার করতাম। তার আগেই আপনি চলে এলেন। আমি ঘরটাকে একটু গুছিয়ে নিয়ে আপনাকে ডাকছি।'

অনন্যা সাহা ভেতরে চলে গেল। আদিত্য বসে বসে চারদিক দেখছে। ভাবছে। শোবার ঘর একটা নয়। একটা সরু প্যাসেজ রয়েছে। সেটা পেরলে দু-দিকে দুটো শোবার ঘর । প্যাসেজটা আধো-অন্ধকার। সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আদিত্য তিন বছর আগেকার সেই খুনের রাত্তিরটাকে পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করছিল। অশনি রায়ের বয়ান অনুযায়ী এই প্যাসেজটা ধরে কয়েক পা এগোনোর পরে কেউ পেছন থেকে তার মুখে ক্লোরোফর্ম জাতীয় কিছু একটা চেপে ধরে তাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। সেই সময়ে কিছুটা ধস্তাধস্তি হয়েছিল নিশ্চয়। কিছুটা শব্দও হয়েছিল। তা যদি হয় তাহলে বাড়ির মালিক ও মালকিন, পার্থ মিত্র এবং আসল মৃত্তিকা মিত্র, শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল না কেন? নাকি তারা বেরিয়ে এসে দেখল অশনি রায়কে অজ্ঞান করে দেওয়া হচ্ছে। দেখে তারা আবার শোবার ঘরে ঢুকে গেল? তারপর আততায়ী ধীরে সুস্থে শোবার ঘরে ঢুকে তাদের খুন করে চলে গেল? না, অসম্ভব। এটা হতেই পারে না। অশনির কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে সেই রাত্তিরে অশনি রায় এই বাড়িতে ঢোকার আগেই পার্থ মিত্র, মৃত্তিকা মিত্র খুন হয়ে গেছে। তাদের লাশগুলো শোবার ঘরে পড়ে রয়েছে। অশনিকে অজ্ঞান করে আততায়ী পালিয়ে গেল। যাবার আগে অশনির হাতের ছাপটা পিস্তলের ওপর তুলে দিয়ে গেল। কিন্তু সেক্ষেত্রে খুন করার মোটিভ কী? অশনিকেই বা ফাঁসানো হল কেন ?

বরং খুন করার ব্যাপারে অশনি রায়ের মোটিভ বেশ জোরাল। হয়ত অশনি মিথ্যে কথা বলছে। যদি পুলিশের কথাই সত্যি হয় তাহলে ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল? পুলিশ বলছে, অশনি বাড়িতে ঢুকে দেখল মৃত্তিকা আর পার্থ ঝগড়া করছে। অশনিকে দেখে পার্থর রাগ আরও বেড়ে গেল। রাগের ঝোঁকে পার্থ দেরাজের ওপর থেকে ফুলদানি তুলে নিয়ে তার বউএর মাথায় আঘাত করল। মৃত্তিকা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তাই দেখে অশনি রায় তার পকেট থেকে পিস্তল বার করে গুলি চালাল। পার্থ মিত্রও লুটিয়ে পড়ল। ব্যাপারটা এইরকম হতেও পারত, কিন্তু আদিত্যর একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। অশনি রায়কে বাড়িতে ঢোকার জন্যে কে সদর দরজাটা খুলে দিল? যেহেতু অন্য কেউ বাড়িতে ছিল না, ধরে নিতে হবে, হয় মৃত্তিকা আর না হয় তার স্বামী পার্থ দরজা খুলে দিয়েছিল। যদি পার্থ দরজা খুলে দেয়, সে আদিত্যকে তার বেডরুম অব্দি আসতে দিল কেন? আর যদি মৃত্তিকা দরজা খুলে দেয়, তাহলে অত রাত্তিরে কে বেল বাজাল সেটা দেখার জন্যে কি পার্থ তার বউএর পেছন পেছন সদর দরজা অব্দি আসবে না? এলে, সে কি

অশনিকে বেডরুম অব্দি যেতে দেবে? অর্থাৎ একটু তলিয়ে ভাবলে মনে হয়, এই দ্বিতীয় গল্পটাতে যা কিছু হেস্তনেস্ত সদর দরজা দিয়ে ঢুকে এই বসার ঘরটাতেই হয়ে যাবার কথা। বেডরুম পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াল কী করে?

অনন্যা সাহা ফিরে এসেছে। 'চলুন।' সে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল ।

শোবার ঘরটা খুব বড় নয়। একটা ডবোল খাট ঘরের বারো আনা দখল করে রেখেছে। তাছাড়া রয়েছে একটা ড্রেসিং টেবিল আর একটা শীর্ণকায় দেরাজ, যাকে আধুনিক পরিভাষায় ক্যাবিনেট বলতে হবে। এই ক্যাবিনেটের ওপরেই কি দুটো ফুলদানি সাজানো থাকত? আর তার একটা দিয়ে মৃত্তিকা মিত্রকে খুন করা হয়েছিল?

'আপনাদের এই ফ্ল্যাটটার ফার্নিচারগুলো কি আপনাদের?' আদিত্য অনন্যা সাহাকে জিজ্ঞেস করল।

'না, না। আমাদের নয়। শুভর অফিস আমাদের ফার্নিচার সমেত এই ফ্ল্যাটটায় থাকতে দিয়েছে। মানে ফার্নিশড রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার।'

'বুঝেছি। তার মানে পাঁচ বছর আগে আপনারা যখন এখানে এলেন তখন এই ফার্নিচারগুলো অলরেডি এখানে ছিল?'

'হ্যাঁ। শুধু ড্রেসিং টেবিলটা পরে এসেছে।'

'তার মানে হল, খুন হবার সময় সম্ভবত এই খাট এবং ক্যাবিনেট এই ঘরেই ছিল।' আদিত্য বিড়বিড় করে নিজের মনে বলল।

অনন্যা সাহা উত্তর দিল না। বোধহয় আদিত্যর কথাটা ভাল করে শুনতে পায়নি। আদিত্য ভাবছিল। খাটের একদিকে ক্যাবিনেট, অন্য দিকে একটা ছোট সাইড টেবিল। সাইড টেবিলের দিকটাতে খানিকটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। অন্যদিকে ক্যাবিনেট এবং খাটের মাঝখানে জায়গা খুব কম। কষ্টেশিষ্টে একটা লোক দাঁড়াতে পারে। অশনি রায়ের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে নিশ্চয় ফাঁকা দিকটার মেঝের ওপরেই পার্থ মিত্রর মৃতদেহটা পড়েছিল। কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে ক্যাবিনেট থেকে সে ফুলদানিটা তুলল কী করে? ক্যাবিনেটটা তো খাটের অন্য দিকে। আর অন্য দিকে জায়গা এত কম যে ওখানে দাঁড়িয়ে ক্যাবিনেট থেকে ফুলদানি তুলে কারও মাথায় আঘাত করাটা শক্ত। তবে অসম্ভব নয়। তাছাড়া খুনি যখন ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিল, তখন মৃত্তিকা মিত্র কোথায় ছিল? খাটের ওপর বসে থাকলে খাটে রক্তের চিহ্ন পাওয়া যেত। সেটা কি পাওয়া গিয়েছিল? মৃত্তিকা মিত্রর মৃতদেহটা ছিল খানিকটা বিছানায়, খানিকটা মেঝেতে। কোনদিকের মেঝেতে? ক্যাবিনেটের দিকের নাকি সাইড টেবিলের দিকের ? এইসব ডিটেলগুলো সুভদ্রর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

ক্যাবিনেটের দিকে ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমের দরজা। তার পাশে বারান্দায় যাবার দরজা। আদিত্য বাথরুমের দরজাটা খুলে দেখল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একদিকে পার্টিশনের আড়ালে শাওয়ার, পার্টিশনের এপাশে কমোড। অন্যদিকে মুখ ধোবার বেসিন, টুথব্রাশ-টুথপেস্ট-শেভিং কিট রাখার জন্য অপরিসর ক্যাবিনেট। আদিত্য বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার দরজা খুলল। বারান্দাটা খুব ছোট। এটা বাড়ির পেছন দিক। বারান্দায় গ্রিল নেই। পাশ দিয়েই ড্রেনপাইপ নেমে গেছে। সুভদ্র ঠিকই বলেছিল। একটু চটপটে লোক হলে অনায়াসে বারান্দার রেলিং টপকে ড্রেনপাইপ বেয়ে নিচে নেমে পালাতে পারে। নিচে সিসি ক্যামেরা ঠিক কোথায় লাগানো আছে? সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

ঘরের ভেতরে ফিরে এসে আদিত্য বলল, "আপনাদের অন্য বেডরুমটা কি আপনার

মেয়ের ?'

'হ্যাঁ। ওটাও কি দেখবেন?'

'একবার দেখি।' আদিত্য অন্ধকার করিডোর পেরিয়ে অন্য ঘরটাতে ঢুকল। এই ঘরটা রাস্তার দিকে। বারান্দা নেই, তবে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। ঘরটা বেশ পরিপাটি করে সাজানো। সিঙ্গল খাট, পড়ার টেবিল, বুককেস।

'আপনার মেয়ে কোন ক্লাশে পড়ে?'

'এবার ক্লাশ টেন হল। সামনের বছর মাধ্যমিক।'

আদিত্য আন্দাজ করল মেয়ে মায়ের মতো অগোছালো নয়। নিজের ঘর নিজেই গুছিয়ে রাখে। সে বলল, "আমার আর কিছু দেখার নেই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন আসছি। তবে আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলার জন্য আবার আমাকে আসতে হবে। আপনার ফোন নম্বরটা বলবেন? আমি আপনাকে একটা মিসড কল দিচ্ছি। প্লিজ আমার নম্বরটা সেভ করে নেবেন। আর আপনার স্বামী কলকাতায় এলে আমাকে একটু জানাবেন। আমার নাম আদিত্য মজুমদার। ওই নামেই আমার নম্বরটা সেভ করবেন। আমি পেশায় একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। '

বেসরকারি গোয়েন্দা শুনে মেয়েটির মুখের অভিব্যক্তি কতটা পাল্টাল সেটা না দেখেই আদিত্য ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছে।

নিচে নেমে আদিত্য দেখল সেই বুড়ো সিকিউরিটি তখনও বসে বসে খবর কাগজ পড়ছে। আদিত্যর পায়ের শব্দ পেয়ে সে মুখ তুলে চাইল।

আদিত্য তার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, "শুনুন, আমি কিন্তু আসলে এসি সারাবার লোক নই। আপনি নিশ্চয় জানেন এই বাড়িতে তিন বছর আগে দুটো খুন হয়েছিল। আমি সেটা ইনভেস্টিগেট করতে এসেছি। কেসটা আবার কোর্টে উঠবে।'

আদিত্য তার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের লাইসেন্সটা পকেট থেকে বার করে দেখাল।

সিকিউরিটিকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে লোকটা বলল, "আপনি কি স্যার সিআইডি?'

আদিত্য ঠিকই আন্দাজ করেছিল। এই লোকটাও তাকে পুলিশ বলে ধরে নিয়েছে। অনিন্যা সাহা যেমন ধরে নিয়েছিল। লাইসেন্সটা কীসের, লোকটার বোঝার কথা নয়। সে লোকটার কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, 'ঢোকার সময় আমার আসল পরিচয়টা দিইনি। কথা নানাভাবে লিক হয়ে যায়।' তারপর একটু থেমে বলল, আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'

'বলুন স্যার।" বুড়োর গলাটা একটু কেঁপে গেছে।

'তিন বছর আগে যখন এই বাড়িতে খুন হয় তখন কি আপনি এখানে ডিউটি করতেন?'

'না স্যার। আমি তখন সল্ট লেকের একটা বাড়িতে ডিউটি করতাম।' 'এখানে তখন কে ডিউটি করত?'

'আমি যত দূর জানি সোমনাথ ডিউটি করত। সোমনাথ বাগ। আমাদের কম্পানিতেই কাজ করত।'

'করত মানে? এখন আর করে না?"

'না স্যার। সোমনাথ অনেক দিন হল কাজ ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক কত দিন ছেড়েছে বলতে পারব না।'

'এখন কোথায় কাজ করে বলতে পারবেন?

'না স্যার। তবে আমাদের আপিসে গেলে ওরা হয়ত বলতে পারবে।

'আপনাদের আপিসের নাম কী?'

'চাম্পিয়ান সিকিউরিটিজ। সল্ট লেকে আমাদের আপিস ।

"ঠিকানা?"

'আমি ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি।'

বুড়ো পকেট থেকে একটা জরাজীর্ণ কাগজ বার করে তার থেকে দেখে দেখে হাতের খবরের কাগজের একটা ফাঁকা জায়গায় একটা ঠিকানা লিখল। কাঁপা কাঁপা কাঁচা হাতের লেখা, কিন্তু পড়া যাচ্ছে।

আদিত্য বলল, 'আপনাদের পেছন দিকে একটা সিসি ক্যামেরা আছে না? একটু দেখব।'

'পেছন দিকে সিসি ক্যামেরা? কই না তো। পেছন দিকে কোনও সিসি ক্যামেরা নেই তো। অন্তত আমি কখনও দেখিনি। সামনে সিসি ক্যামেরা আছে। আর প্রত্যেক তলায় লিফটের সামনে একটা করে সিসি ক্যামেরা আছে। কিন্তু পেছনে তো কিছু নেই।' লোকটা বেশ অবাক হয়েছে।

একটু পরে রাস্তায় নেমে আদিত্যর ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে বলল কেউ তার ওপর নজর রাখছে। মুখ তুলে দ্যাখে চারতলার জানলা দিয়ে অনন্যা সাহা তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

(8)

গত মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখের ছুটি ছিল, আজ শুক্রবার গুড ফ্রাইডের ছুটি। ছুটি মানে অবশ্য কেয়ার ইস্কুল ছুটি। আদিত্য যেহেতু দশটা পাঁচটার চাকরি করে না তার ছুটি বলে কিছু নেই। কেয়া আগে থেকেই বলে রেখেছে শুক্রবার দুপুরে বাইরে খেতে যাবে।

সকালবেলা আকাশে একটু মেঘ ছিল, দু'এক পশলা বৃষ্টি হবার পর রোদ্দুর উঠেছে। তবে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। বেলা এগারোটা নাগাদ আকাশ আবার কালো। বেরোবে বলে কেয়া গাড়ি বলে দিয়েছিল। সেটা বারোটার সময় আসার কথা। তার আগেই বৃষ্টি নামল ।

আজকাল কেয়া খুব গাড়ি কেনার কথা বলছে। ছোটখাট একটা গাড়ি। অল্টো বা ওই রকম একটা কিছু। গাড়ি থাকলে আর রোজ রোজ উবার ডাকার ঝামেলায় যেতে হবে না। গাড়ি ভাড়াও করতে হবে না। আজকাল ফেরার সময় উবার পেতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে। কেয়া হিসেব করে দেখেছে এখন যা খরচ হচ্ছে গাড়ি কিনলে তার থেকে বেশি খরচ হবে না। গাড়ি কেনার টাকা কেয়া দেবে। আদিত্যর কাজ গাড়িটা কিনিয়ে দেওয়া।

বারোটা বেজে গেল, বৃষ্টির বেগ বেড়েই চলেছে। সাড়ে বারোটা বেজে গেল, দেখতে দেখতে একটা বেজে গেল। গাড়িটা এখনও এসে পৌঁছতে পারেনি। ড্রাইভার ফোন করে জানিয়েছে, গ্যারেজেই আটকে আছে, বৃষ্টি একটু কমলে বেরোবে। রাস্তায় জল জমতে শুরু করছে। এই বাড়িটার একটা মস্ত অসুবিধে হল বৃষ্টির ছাঁট শোবার ঘরের জানলার দিকে হলে শার্শির নিচ দিয়ে জল ঢুকতে শুরু করে। তারপর সেই জল গড়াতে গড়াতে সারা বাড়ি ছড়িয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত আজ বৃষ্টির ছাঁট অন্যদিকে। না হলে এতক্ষণে বাড়ির মধ্যে একটা পুকুর তৈরি হয়ে যেত।

আদিত্য ভেবেছিল কেয়াকে নিয়ে আজ দুপুরে রাজারহাটের সেই ক্যাফেটাতে খেতে যাবে যেখানে অশনি রায় নকল মৃত্তিকাকে নিয়ে যেত। রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে। ক্যাফের নামটা আদিত্য নোট খাতায় লিখে রেখেছিল। সল্ট অ্যান্ড পেপার গুগল করে দেখল জায়গাটা রবীন্দ্র তীর্থ-র কাছে, মূল রাস্তা থেকে একটা ছোট্ট রাস্তা বেরিয়েছে, সেখানে। বৃষ্টি না পড়লে খুঁজে খুঁজে ঠিক পৌঁছে যাওয়া যেত। এখন এই বৃষ্টির মধ্যে জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যাবে কি? অবশ্য তারও আগের প্রশ্ন, আরও কিছুক্ষণ এইভাবে বৃষ্টি হতে থাকলে আদৌ কি বেরোনো যাবে?

আদিত্য বসার ঘরের জানলা দিয়ে তন্ময় হয়ে বৃষ্টি দেখছিল। শহরটা বৃষ্টির হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছে। একটি নারী যেমন তার পুরুষের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়। যেন শহরটার আর নিজের কোনও সত্তা নেই। বৃষ্টি তাকে যেমন করে ব্যবহার করবে সে তেমনভাবে ব্যবহৃত হবে।

'আজ আর যাওয়া হবে বলে মনে হচ্ছে না।' কেয়া ঘরে ঢুকে বলল। 'আমি খিচুড়ি চাপিয়ে দিলাম।'

আদিত্যর ভালই লাগছে। একটা ছুটির দিনে জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখা, খিচুড়ি খাওয়া, ইচ্ছে হলে তারপর একটু ঘুমিয়েও নেওয়া যেতে পারে। এ তো স্বর্গসুখ। বিশেষ করে কেয়া যখন বাড়িতে। কী দরকার বিশ

মাইল ঠেঙিয়ে বাইরে লাঞ্চ খেতে যাবার? শুধু একটা কারণে মনটা খচখচ করছে। সল্ট অ্যান্ড পেপার ক্যাফেতে একবার গিয়ে কথা বলার দরকার ছিল। কাজটা হল না। বিবেকের দংশন এড়ানোর জন্যে আদিত্য মোবাইলে একটা নম্বর লাগাল। কিছু কাজ অন্তত এগিয়ে রাখা যেতে পারে।

'একটা কাজ করে দিতে হবে। হাতে সময় আছে?' ওপার থেকে সাড়া পাওয়ার পর আদিত্য বলল।

'নিশ্চয় স্যার। আপনার জন্যে আমার হাতে সর্বদা সময় আছে। বলুন স্যার, কী করতে হবে।'

'একটা লোকের হদিশ করতে হবে। নাম সোমনাথ বাগ। আগে একটা সিকিউরিটি কম্পানিতে কাজ করত। এখন কী করে, কোথায় থাকে কিচ্ছু জানি না। আগে যে সিকিউরিটি কম্পানিটাতে লোকটা কাজ করত সেটা সল্ট লেকে। ঠিকানাটা আমি তোমাকে হোয়াটস্‌অ্যাপ করে দিচ্ছি। ওইখানে গিয়েই খোঁজ নিতে হবে। এছাড়া আর কোনও লিড নেই।

"ঠিক আছে স্যার। আমি কয়েকদিনের মধ্যে খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি।' বিমল গায়েন ওপার থেকে বলল। গত তিনমাস তাকে দেবার মতো কোনও কাজ আদিত্যর হাতে ছিল না।

'তোমার এমনিতে সব ঠিকঠাক চলছে তো?'

'আপনাদের আশীর্বাদে আর ঠাকুরের কৃপায় মোটামুটি চলে যাচ্ছে স্যার। শুধু একটা চিন্তা। মেয়েটার বাচ্চা-কাচ্চা হবে। আমার জামাই তো জানেন একটা কেটারিং-এ রান্না করে। খুব ডিমান্ড। অন্য জায়গা থেকেও ওকে বায়না করে নিয়ে যায়। যা বিরিয়ানি বানায় না স্যার, একবার খেলে ভুলতে পারবেন না। তো, সে যাই হোক, জামাই তো বাড়িতেই থাকে না। ভরা পোয়াতি মেয়েটাকে দেখাশোনার জন্যে কাউকে তো বাড়িতে থাকা দরকার। সেরকম কেউ বাড়িতে নেই। আগে ওরা আমাদের পাড়াতেই থাকত। পাড়ার ছেলেকেই তো প্রেম করে আমার মেয়ে বিয়ে করল। পাড়ায় থাকলে গিন্নি রোজ গিয়ে মেয়েকে দেখে আসতে পারত।'

'কোথায় থাকে তোমার মেয়ে-জামাই?'

'কোদালিয়া জানেন? দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোদালিয়া। ওই সুভাষগ্রাম স্টেশনে নেমে যেতে হয়। ওখানে আমার জামাই-এর কিছুটা জমি ছিল। বাপ-দাদার জমি। ওর ভাগে ছ'-সাত কাঠা পড়েছে। তা সেখানে জামাই একটা ঘর তুলেছে। একটা ঘর, একটা বাথরুম আর একটা টিউবকল। ওখানেই ওরা থাকে।'

'আশেপাশে জামাই-এর জ্ঞাতিরা কেউ থাকে না?"

'থাকে। দুই কাকা থাকে। কিন্তু তাদের সঙ্গে জামাই-এর বনিবনা নেই। ওর বাবা মরে যেতে কাকারা অনেকটা জমি হাতিয়ে নিয়েছিল। তাই নিয়ে বিবাদ। হয়ত একদিন কোর্ট-কাছারি অব্দি গড়াবে।'

'হুঁ, বুঝলাম। তোমার বউকে বল এখন কিছুদিন মেয়ের কাছে গিয়ে থেকে 'আসতে।'

'সেটাই ঠিক হয়েছে স্যার। আমি না হয় ক'টা দিন হাত পুড়িয়ে রান্না করে নেব।' 'ঠিক আছে। এখন রাখছি। কিছু খবর পেলে জানিও।'

'জানাব স্যার।'

প্রকৃতির কী আশ্চর্য খেয়াল, বেলা দুটো নাগাদ বৃষ্টি থেমে গেল, আড়াইটের মধ্যে মেঘের আড়ালে রোদ্দুর উঁকি মারছে! একটু পরেই কেয়ার মোবাইলটা বেজে উঠল। ড্রাইভারের ফোন। সে গাড়ি নিয়ে নিচে অপেক্ষা করছে। তাকে বলে দেওয়া যেত আজ আর বেরোনো হবে না, কিন্তু কেয়া বলল তাহলে গাড়ির মালিক ড্রাইভারকে এক দিনের পয়সা দেবে না। ড্রাইভার কেয়াকে তাই বলছে। কেয়ার একে দয়ার শরীর তার ওপর বেরোবার ইচ্ছে ষোলো আনা । অগত্যা জামাকাপড় পালটে আদিত্যকে তৈরি হয়ে নিতে হল। আদিত্য ভাবল, বেরোতেই যখন হচ্ছে তখন সল্ট অ্যান্ড পেপার ক্যাফেতে একবার ঘুরে আসাই যায়।

বৃষ্টি আজকাল ছোট ছোট এলাকায় গণ্ডিবাঁধা থাকছে। এও প্রকৃতির খেয়াল। উল্টোডাঙা পেরিয়ে সল্টলেকে ঢুকতেই খটখটে শুকনো রাস্তা দেখা গেল। যেন বহুদিন এ-চত্বরে বৃষ্টি হয়নি। তবে মেঘেরা

আশ্চর্য কেরামতি দেখাচ্ছে। সাদা মেঘ, কালো মেঘ মিলে আকাশে একটা শহর তৈরি করেছে। শহরের পেছনে হালকা পাহাড়ের রেখা। পাহাড়ের ওপরে একটা দুর্গ দেখা যাচ্ছে না? গাড়ি দেখতে দেখতে রাজারহাটে ঢুকে পড়ল।

রবীন্দ্র তীর্থ অব্দি আদিত্যর চেনা। এর পর কোন দিকে যেতে হবে? রাস্তায় একটাও লোক নেই যে জিজ্ঞেস করা যাবে। আরও খানিকটা এগোনোর পর একটা ছোট মোড় পড়ল। মোড়ের মাথায় একটা চায়ের দোকান। খাপরার ছাউনি। যারা চা খাচ্ছে তারা সম্ভবত রাজমিস্ত্রি ও তাদের জোগাড়ে। কাছেই কোনও বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেখানে কাজ করছে। এই মিস্ত্রিরা ক্যাফে-ট্যাফের খবর জানবে বলে মনে হয় না। আদিত্যর জিপিএস ম্যাপ বলছে আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে বেঁকতে হবে।

মিনিট কয়েক চলার পর জিপিএস বাঁ দিকে বেঁকতে বলল। বাঁক নিতেই একটা মস্ত বড় জলাশয়। সাদা রাজহাঁস চরছে। আর তার উল্টোদিকে, আরে কী আশ্চর্য, ওই তো সল্ট অ্যান্ড পেপার ক্যাফে! ক্যাফের সামনে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে এত মাইল রাস্তা পেরিয়ে এই নির্জন ক্যাফেতে কেউ কেউ আসে। হয়ত নির্জন বলেই আসে ।

ক্যাফের ভেতরটা ছিমছাম। আদিত্য আর কেয়া জানলার ধারে বসল। জানলা দিয়ে রাজহাঁসদের জলে ওঠানামা দেখা যাচ্ছে।

'কী সুন্দর জায়গা গো। কী করে জানলে এটার কথা?' জায়গাটা কেয়ার পছন্দ হয়েছে।

আদিত্য বলেনি সে এখানে রথ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কলাও বেচতে এসেছে। 'একজন এই জায়গাটার কথা বলেছিল। ভাবলাম, গিয়ে দেখা যাক না, কেমন জায়গা।'

'হাঁসগুলো দেখো। কী সুন্দর। কাদের হাঁস কে জানে।'

'মনে হয় এই ক্যাফের মালিকই হাঁসগুলোর মালিক। দেখছ না, জলের ধারে লেখা রয়েছে, মেনটেন্‌ড্ বাই সল্ট অ্যান্ড পেপার ক্যাফে।

বেয়ারা এসে দুজনকে দুটো মেনু দিয়ে গেল।

'আমি কিন্তু কিছু খেতে পারব না। শুধু কফি খাব। অবেলায় বেশি খিচুড়ি খেয়ে ফেলেছি।' আদিত্য জানিয়ে রাখল।

'শুধু কফি কেন? একটা মিষ্টি খাও। লেমন টার্ট খাও না একটা।' 'তুমি কী খাবে?'

'আমি খাব একটা ক্যাফে লাতে। আর একটা চকলেট মাড পাই।' কেয়া অসম্ভব চকলেটের ভক্ত।

'ঠিক আছে। আমি তাহলে একটা লেমন টার্ট আর একটা কালো কফি, মানে কাফে আমেরিকানো ।

বেয়ারা অর্ডার নিতে এসেছিল। অর্ডার দেবার পর আদিত্য জিজ্ঞেস করল, "এই ক্যাফেটা কতদিন হল হয়েছে?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না। ম্যাডাম বলতে পারবেন।' বেয়ারা চোখের ইশারায় কাউন্টারে বসা একজন মহিলাকে দেখাল।

ক্যাফের ভেতরটা আধো-অন্ধকার বলে আদিত্য এতক্ষণ ভদ্রমহিলাকে খেয়াল করেনি। সে বলল, 'ম্যাডামের সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?'

বেয়ারা অবাক হয়েছে। কেয়াও। অবাক ভাবটা সামলে নিয়ে বেয়ারা বলল, 'আমি ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করছি।'

'তুমি ওই ম্যাডামের সঙ্গে কেন কথা বলতে চাও?' বেয়ারা চলে যেতেই কেয়া বলে উঠেছে।

'তোমাকে পরে সব বুঝিয়ে বলব। তুমি শুধু শুনে যাও।' আদিত্য দেখল বেয়ারার কথা শুনে কাউন্টারের ভদ্রমহিলা তাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছেন। ভদ্রমহিলা আধুনিকা। সুন্দরী। বয়েস চল্লিশের কোঠায়।

'আপনাদের কি কোনও অসুবিধে হচ্ছে? আমি কি কোনও সাহায্য করতে পারি?' 'আমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। চমৎকার আপনাদের অ্যাম্বিয়েন্স। খাবার অর্ডার দিয়েছি, এখনও খেয়ে দেখিনি। তবে আমি শিয়োর খাবারটা আপনাদের অ্যাম্বিয়েন্স-এর মতই ভাল হবে। আসলে আমার একটা অন্য প্রশ্ন ছিল।'

'প্রশ্ন? বলুন কী প্রশ্ন?' ভদ্রমহিলাকে কি একটু উদ্বিগ্ন মনে হল?

'আমি আদিত্য মজুমদার আর ইনি আমার স্ত্রী কেয়া।' আদিত্য দু'হাত জড়ো করে নমস্কার করল।

'আমি আর আমার স্ত্রী ভাবছিলাম আপনাদের মতো একটা ক্যাফে খুলব। এখানে নয়। আপনাদের সঙ্গে কমপিট করব না।' আদিত্য চওড়া করে হাসল। 'রাজারহাটের অন্য দিকে, সিটি সেন্টার টু পেরিয়ে, আমাদের একটা জমি কেনা আছে। সেখানে। জায়গাটা এখানকার মতই ফাঁকা। তবে আপনার যেমন সামনে একটা সুন্দর লেক আছে, আমাদের ওরকম কিছু নেই।'

ভদ্রমহিলা এখনও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

আদিত্য বলল, 'আমরা এই রাজারহাটে ক্যাফে চালানোর ব্যাপারে আপনাকে দু'একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। মানে, আপনার যদি বলতে আপত্তি না থাকে।'

'না, না। আপত্তি কীসের? বলুন কী জানতে চান। আচ্ছা তার আগে বলুন, আপনারা কি আগে আমার ক্যাফেতে এসেছেন? আমার কাস্টমারদের প্রায় সকলকেই আমি চিনি। আপনাদের আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। কারও কাছে কি আমাদের কথা শুনেছেন? আসলে, আমার ক্যাফের কথা তো খুব বেশি কেউ জানে না, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'না ম্যাডাম। আমরা আগে কখনও এখানে আসিনি। আমার এক পরিচিত এই ক্যাফেটার কথা আমাদের বলেছেন। এক সময় তিনি এখানে খুব আসতেন। তবে অনেকদিন আসেননি। আপনি কি নাম বললে চিনতে পারবেন ?

'কী নাম? সব কাস্টমারের নাম অবশ্য আমি জানি না। অনেকের শুধু মুখ চিনি। কী নাম বলুন তো?"

'অশনি রায়। মনে পড়ছে?"

আদিত্য খুব ভাল করে ভদ্রমহিলার মুখের দিকে লক্ষ রাখছিল। অশনি রায় নামটা শুনে ভদ্রমহিলার মুখে মুহূর্তের জন্যে একটা অভিব্যক্তি খেলে গেল, যাকে সতর্কতা বলা যায়। তারপর ভদ্রমহিলা একটু ম্লান হাসলেন। বললেন, "নিশ্চয় মনে পড়ছে। ও নাম কি ভোলা যায়? আপনি যখন ভদ্রলোককে চেনেন, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কেন ভোলা যায় না। উনি এখন কেমন আছেন?'

'খবর কাগজে দেখেছেন বোধহয় হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ওকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে। উনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। তবে মাথাটা সব সময় কাজ করে না।' বেয়ারা কফি-কেক নিয়ে এসেছে। ভদ্রমহিলা বেয়ারাকে বললেন, 'আমাকে একটা কফি দাও তো। আমি যেরকম কফি খাই। আর আমার জন্যে একটা চেয়ার এনে দাও।'

"ও হো, আমার নামটাই তো বলা হয়নি। আমার নাম মালা, মালা সরকার।' ভদ্রমহিলা হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গী করলেন।

'আমি আদিত্য মজুমদার, ইনি আমার স্ত্রী কেয়া।' আদিত্য দ্বিতীয়বার নিজের নাম বলে দু'হাত জড়ো করে নমস্কার জানাল। 'আপনি অশনিবাবু সম্বন্ধে কী যেন বলছিলেন?' নামটা শুনে ভদ্রমহিলা কি একটু তির্য্যক হাসলেন?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলছিলাম, অশনিবাবু যখন এই ক্যাফেতে আসতেন তখন আমি এখানকার ম্যানেজার ছিলাম। খাবারও সার্ভ করতাম। আমি আর আমাদের কুক ছাড়া আর কোনও কর্মচারি তখন ছিল না। অশনিবাবু তার বান্ধবীকে নিয়ে আসতেন। বান্ধবীর চোখ দুটো কালো চশমা দিয়ে ঢাকা থাকত। ওড়না দিয়ে মুখের আধখানাও ঢাকা থাকত। যেন উনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইতেন। আমার একটু অবাক লাগত। তারপর

ভাবতাম আমার কী দরকার? শেষে তো এই কাণ্ড হল। একটা ছবি দেখিয়ে পুলিশ আমাকে জিজ্ঞেস করল ইনিই কি অশনি রায়ের সঙ্গে সল্ট অ্যান্ড পেপার ক্যাফেতে আসতেন? আমি বললাম, হয়ত ইনিই আসতেন, তবে আমি খুব জোর দিয়ে কিছু বলতে পারব না। কারণ ওর চোখ সানগ্লাস দিয়ে ঢাকা থাকত। মুখের অর্ধেকটাও ওড়না দিয়ে ঢাকা থাকত। আর ওরা ক্যাফের ভেতরে একটা অন্ধকার কোণে গিয়ে বসতেন। আমি ভদ্রমহিলাকে খুব ভাল করে কখনই দেখিনি। পুলিশ অফিসার আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।'

'আপনি কেন মিথ্যে বলতে যাবেন? মিথ্যে বলে আপনার কী লাভ?'

মালা সরকার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, 'আপনাকে বললাম না, আমি তখন এই ক্যাফেটার ম্যানেজার ছিলাম। কিন্তু মালিক হবার স্বপ্ন দেখতাম। আগের মালিক তখন কলকাতায় থাকত। তাই এই ক্যাফেটা খুলেছিল। কলকাতায় মালিকের অন্য ব্যবসাও ছিল। আস্তে আস্তে সেই ব্যবসাগুলো মালিক দিল্লিতে নিয়ে গেল। এই ক্যাফেটাও বিক্রি করতে চাইছিল। ক্যাফেটা আমার কেনার খুব ইচ্ছে, কিন্তু টাকা কোথায়? একটা ব্যাঙ্ক লোন পাবার চেষ্টা করছিলাম। অশনি রায় তার ব্যাঙ্ক থেকে আমাকে লোনটা পাইয়ে দেবে বলল। ওই খুনের ঘটনাটা যখন ঘটল, লোনটা তখনও স্যাংশন হয়নি, প্রসেসড হচ্ছে। পুলিশ বলল অশনি রায়কে বাঁচাবার জন্যে আমি মিথ্যে কথা বলছি। অশনি রায় ছাড়া পেয়ে গেলে লোনটা আমাকে পাইয়ে দেবে। সেই কারণে আমি অশনি রায়কে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ভয় পেয়ে বললাম, এই মহিলাই অশনি রায়ের সঙ্গে আসত।

অশনি রায়ের জেল হয়ে গেল। কিন্তু পরে লোনটা আমি পেয়ে গেলাম। এটা নিয়ে আমি অনেক রাত্তির ঘুমোতে পারিনি। লোন নিয়ে ক্যাফেটা কিনলাম। এখন লোনটাও শোধ হয়ে গেছে। অবশ্য হাইকোর্টে অশনি রায়ের উকিল ব্যারিস্টার ব্যানার্জী আমাকে জেরা করে প্রমাণ করে দিলেন অশনির সঙ্গে যে মেয়েটা আসত তাকে কোনও দিনই আমি ভাল করে দেখিনি। অতএব আমার কথার কোনও দাম নেই।'

মালা সরকারের কথা শুনতে শুনতে আদিত্য ভাবছিল এই মহিলা নিজের থেকে এত কথা বলছে কেন? সে মুখে বলল, 'আপনার ব্যবসার কথাটা শুনতে চাইছিলাম। এদিকে ক্যাফে খুললে প্রসপেক্ট কেমন?'

'দেখুন, আমার ক্যাফেটা তো ভালই চলে। খুব বেশি কাস্টমার আমার নেই। কিন্তু যারা আছে তারা খুব লয়াল। এখানেই বারবার আসে। বেশিরভাগই কাপল । নির্জনতা চায়।'

কথাগুলো বলে মালা সরকার মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু আপনি এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনি কে এবং কেন এখানে এসেছেন আমি সবই জানি।'

আদিত্য কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে মালা সরকার বললেন, "আদিত্যবাবু আপনার প্রফেশন এবং এখানে আসার উদ্দেশ্য আমার অজানা নয়। তাই ব্যবসা-ট্যাবসার কথা বললে সময় নষ্ট ছাড়া আর কী হবে?'

আদিত্য হতভম্ভ। তার অবস্থা দেখে কেয়াও হাসছে। অতি কষ্টে আদিত্য বলল, 'আপনি আমার কথা কী করে জানলেন? '

'অশনি রায় আমাকে দু-দিন আগে ফোন করেছিলেন। উনিই বললেন আপনি এখানে আসতে পারেন। অনুরোধ করলেন আপনাকে যেন সব রকম সাহায্য করি।' আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আপনি তো সবই বলে দিয়েছেন। আমার শুধু একটাই প্রশ্ন আছে। লোনটা ঠিক কবে স্যাংশন হয়েছিল? অশনি রায় জেলে যাবার আগে না পরে?'

'আমার যতদূর মনে পড়ছে স্যাংশনটা আগেই হয়েছিল। তবে ডিসবার্সমেন্ট হয়েছিল পরে। মানে, প্রথম ভারডিক্টটা বেরোনোর পরে।'

‘ঠিক আছে। আমার আর একটাই কথা বলার আছে। আপনাদের কফি এবং কনফেকশনারি অতি চমৎকার।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

গত দু-তিন দিন ধরে আদিত্যর মনে হচ্ছে কে যেন তার ওপর নজর রাখছে। ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। যখন সে ফাঁকা রাস্তায় হাঁটছে তখন এই অনুভূতিটা হচ্ছে না। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে চলতে চলতে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছে তাকে অনুসরণ করে কেউ পেছন পেছন আসছে। আদিত্যর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বহুবার তাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, কয়েকবার একেবারে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। তাই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়র সাবধান বাণী সে উপেক্ষা করতে পারে না। তাছাড়া একবার-দু'বার নয়, গত দু-তিন দিনে বেশ কয়েকবার এইরকম ঘটেছে। কিন্তু, কী আশ্চর্য, যখনই সে ভিড়ের রাস্তা থেকে ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছে যাচ্ছে, তখনই মনে হচ্ছে সেই অদৃশ্য চোখ-জোড়া আর তার পেছনে নেই ।

এমন কি হতে পারে যে তাকে অনুসরণ করছে সে নিজেকে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চায়? ফাঁকা রাস্তায় পেছন পেছন এলে আদিত্য তাকে দেখে ফেলবে এটা সে এড়াতে চাইছে? কিন্তু এরকম অনুসরণ করে লাভ কি? আদিত্য যে মুহূর্তে ভিড় থেকে নির্জনে আসছে সেই মুহূর্তে সেই লোকটাকে অনুসরণ থামিয়ে দিতে হচ্ছে। আদিত্য ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না। অবশ্য এটা হতে পারে, কেউ তাকে অনুসরণই করছে না, সবই তার মনের ভুল। কিন্তু আদিত্যর স্থির বিশ্বাস তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে ভুল সংকেত দেবে না।

আজকাল কেয়া কোনও দিনই আটটার আগে ফিরতে পারে না। কেয়া বাড়িতে না থাকলে আদিত্যরও বাড়ি ফিরতে ভাল লাগে না। তাই সে একটু দেরি করে আপিস থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরে। হাঁটতে হাঁটতে নানা কিছু চিন্তা করে। কখনও কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বইএর দোকানে কিছুটা সময় কাটায়, কখনও কোনও অখ্যাত চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে রাস্তায় মানুষজনের যাতায়াত দ্যাখে। যে রাস্তা দিয়ে আদিত্য হাঁটতে হাঁটতে ফেরে তার বেশিরভাগটাই জনাকীর্ণ। এই জনাকীর্ণ অঞ্চল দিয়ে হাঁটার সময় সে টের পাচ্ছে কেউ তার ওপর নজর রাখছে। তারপর যেই সে কলেজ স্ট্রিট পেরিয়ে আরও উত্তর দিকে আসছে, রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত কমে আসছে, সে অনুভব করছে নজরদারি করা চোখ-জোড়া আর তার পেছনে নেই। আদিত্য মহা মুস্কিলে পড়েছে।

অবশেষে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। সেদিন সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ তার আপিস থেকে বেরিয়ে আদিত্য যখন বউবাজার স্ট্রিটের ভিড় ঠেলে পুব দিকে হাঁটছিল তখন হঠাৎ হলুদ চুড়িদার পরা একটি অল্পবয়সী শ্যামলা মেয়ে ভিড়ের ধাক্কায় আদিত্যর গায়ের ওপর এসে পড়ল। সরি বলে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাবার আগে মেয়েটি একটা মুখবন্ধ খাম আদিত্যর হাতে গুঁজে দিয়েছে। এই ক'টা দিন ভেবে ভেবে আদিত্য যে ব্যাখ্যাটা দাঁড় করিয়েছিল, মনে হচ্ছে সেটাই ঠিক। কোনও কারণে এই মেয়েটি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে, কিন্তু খোলাখুলি নয়, লুকিয়ে-চুরিয়ে, গোপনে। নিশ্চয় মেয়েটির ওপর কেউ নজর রাখছে। আদিত্যর সঙ্গে সে যোগাযোগ করেছে জানাজানি হয়ে গেলে মেয়েটি নিশ্চয় আশঙ্কা করছে তার ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই কোনও রকমে আদিত্যর হাতে খাম গুঁজে দিয়ে পালিয়ে গেছে। এটাও বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটি এই কাজে খুব পটু নয়। কয়েকটা দিন চেষ্টা করার পরে আজ সফল হয়েছে।

বাড়ি ফিরে আদিত্য দেখল কেয়া তখনও ফেরেনি। ইলেকট্রিক কেটলিতে কফির জল গরম করতে দিয়ে সে পড়ার টেবিলে বসে খামটা খুলল। ভেতরে একটা ছোট্ট চিরকুট। তাতে মেয়েলি হাতের লেখায় লেখা

রয়েছে – আপনার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকার। দরকারটা যতটা আমার হয়ত তার থেকেও বেশি আপনার। আজ রাত ন'টার পরে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে একটা ফোন করুন প্লিজ। এর নিচে একটা নম্বর দেওয়া আছে।

নটা বাজতে এখনও দেরি আছে। আজ সকাল থেকে খবর কাগজটা ভাল করে পড়া হয়নি। আদিত্য কফি খেতে খেতে ইন্টারনেটে খবর দেখছিল। পাতা জুড়ে নেতাদের রাজনৈতিক তরজা, ভারত-চিনের পারস্পরিক আস্ফালন, পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আশঙ্কা, ইয়োরোপীয় ফুটবলে এ-বছর কে চ্যাম্পিয়ান হবে তাই নিয়ে জল্পনা। স্ক্রোল ডাউন করতে করতে একটা খবরে আদিত্যর চোখ আটকে গেল। প্রতিবেদক লিখছেন, পশ্চিমবঙ্গে ইদানীং অল্প-বয়সীদের মধ্যে মাদকের ব্যবহার খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। দু'টি নার্সিং হোম আলাদা করে জানিয়েছে যে অতিরিক্ত মাদক ব্যবহারের ফলে অসুস্থ রুগির সংখ্যা গত ছ'সাত মাসে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কলকাতা ও মফস্বলের তিনটি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার জানাচ্ছে, তাদের চাহিদা ইদানীং এত বেড়ে গেছে যে সবাইকে তারা জায়গা দিতে পারছে না। পুলিশ দু'একটা চুনোপুঁটি মাদক বিক্রেতাকে ধরতে পেরেছে। কিন্তু ওপর থেকে যারা চক্রটা চালাচ্ছে তাদের হদিশ পায়নি। বিশেষ করে কীভাবে মাদকগুলো সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে সে ব্যাপারে পুলিশ এখনও সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

বৃষ্টি নেমেছিল, আদিত্য টেরই পায়নি। আটটার একটু পরে কেয়া বৃষ্টি মাথায় ফিরে এল। চুলে-কপালে জলের ফোঁটা চিকচিক করছে।

ভিজে শাড়ি-জামা বাথরুমে ছেড়ে রেখে শায়া আর ব্রেশিয়ার পরে কেয়া রান্নাঘরে ঢুকল। কফির জল বসাতে বসাতে বলল, 'আমি কিন্তু এবার একটা গাড়ি কিনছি।

রোজ ফেরার সময় এই উবার নিয়ে অশান্তি আর ভাল লাগে না। আজ তো উবার পেলামই না। হলদে ট্যাক্সি নিতে হল। লোকটা বলে কিনা গলিতে ঢুকবে না। বড় রাস্তায় ছেড়ে দিতে হবে। আমি বললাম এই বৃষ্টির মধ্যে আমি যাব কী করে? আমার সঙ্গে তো ছাতা নেই। শেষে পঞ্চাশ টাকা আরও এক্সট্রা দিতে বাড়ি অব্দি এল। ভাবতে পার?'

কেয়া আরও অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল কিন্তু আদিত্য শুনছিল না। সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেয়ার শরীরটা দেখছিল। কেয়া যেন পরস্ত্রী। কেয়া যেন জানলায় বসে থাকা রাজকন্যা আর সে রাখাল বালক। কাঙাল চোখ দুটো ছাড়া তার আর কিছু নেই। এমন কি বাঁশের বাঁশিটাও হারিয়ে গেছে। আছে শুধু দুটো চোখ। ভিখিরির মতো দুটো চোখ কেয়ার শরীরটাকে দেখছে। কিন্তু এখন তো সময় নয়। তাছাড়া কেয়ার মেজাজটাও ভাল নেই। এখন ওসব দিকে এগোতে গেলে ধমক খেতে হবে। আদিত্য জোর করে কম্পিউটারের খবরে মন দিল।

'কী, বললে না তো?' কেয়া শোবার ঘর থেকে অন্তর্বাস ছেড়ে বাড়ির পোশাক পরে এসেছে। দু'কাপ কফি নিয়ে সে আদিত্যর পাশে এসে বসল ।

'কী বলব?' আদিত্য নিরীহ গলায় বলল। যেন ভাজা মাছটা উলটে খেতে জানে না ।

'আমার অর্ধেক কথা তোমার কানে ঢোকে না, এটাই তোমার সব থেকে বড় প্রবলেম। কী অত ভাব কে জানে। তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম কবে তুমি আমাকে একটা গাড়ি কিনিয়ে দিতে পারবে?'

'ঠিক করেছ কী গাড়ি কিনবে?'

'সেদিন তো কথা হয়েই গেল মারুতি কিনব। তুমিই তো বললে মারুতির সার্ভিস সব থেকে সহজে পাওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে। চল তাহলে একদিন মারুতির শো রুমে। বিবাদী বাগে একটা আছে। আমার আপিসের কাছে। ওখানেই যাওয়া যাক।'

'কবে যাবে?'

'আমি তো রোজই ফ্রি। তুমি কবে যেতে পারবে?'

'সামনের বুধবার একটা ছুটি আছে। আমাদের স্কুলের ফাউন্ডেশন ডে। বুধবার যাবে?'

'যেতেই পারি। তবে গাড়ি কেনার আগে ভাবতে হবে গাড়িটা থাকবে কোথায়। সেটা কিছু ভেবেছ?'

'ভেবেছি। দুটো অলটারনেটিভ আছে। আমাদের পাড়ার অনেকে তো রাস্তাতেই গাড়ি রাখে। আমরাও রাখতে পারি। নাইটগার্ডকে একটু পয়সা দিলে ও রাত্তিরবেলা গাড়িটার ওপর নজর রাখবে। অবশ্য একদম খোলা যায়গায় রাখা তো। একটা কভার পরিয়ে রাখতে হবে।'

'আর অন্য অলটারনেটিভ?'

'আমাদের বাড়ির উল্টো ফুটপাথে একটা মোটর গ্যারেজ আছে দেখেছ? ওখানে রাখা যায়। আমি কথা বলেছি। মাসে তিন হাজার টাকা নেবে। মাথার ওপর একটা ছাউনি থাকবে।'

'ফ্লিপ সাইডগুলো ভেবে দেখেছ? মোটর গ্যারেজে রাখলে তেল চুরি হতে পারে। আর রাস্তায় রাখাটা তো সম্পূর্ণ বেআইনি।'

'তোমার মুস্কিল হচ্ছে কোনও ভাল কাজে উৎসাহ দিতে পার না, শুধু ব্যাগড়া দাও। তেল চুরি হোক, বেআইনি হোক, যাই হোক, গাড়ি আমি কিনছি। কেয়া বেশ রেগে গেছে।

'না, না। সে তো কিনবেই। আমি শুধু সমস্যাগুলোর কথাও মাথায় রাখতে বলছি। আচ্ছা গাড়িটা চালাবে কে? আমি মাঝে-সাঝে চালাতে পারি। কিন্তু তোমার রোজকার আসা-যাওয়ার ভার নিতে পারব কি? সকালে হয়ত তোমাকে পৌঁছে দিতে পারব। কিন্তু সন্ধেবেলাটা আমার কী কাজ পড়বে আমি নিজেই জানি না।'

'তোমাকে আমার পৌঁছনোর ভার নিতে হবে না। আমি সৌমিত্রর সঙ্গে কথা বলেছি। ও আমার গাড়ি চালাতে রাজি আছে।'

'সৌমিত্র আবার কে? '

'সৌমিত্রকে ভুলে গেলে? আশ্চর্য লোক বাবা! এইরকম মেমরি নিয়ে তুমি আবার গোয়েন্দাগিরি কর!' কেয়া হাত উলটে হতাশার ভঙ্গী করল।

আদিত্যর মনে হল সৌমিত্রকে ভুলে গিয়ে সে একটা বড় ধরনের অন্যায় করে ফেলেছে। সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'একবার একটু ধরিয়ে দাও না। তাহলেই মনে পড়ে যাবে।'

'সৌমিত্র, মানে সৌমিত্র কর্মকার। আমি গাড়ি ভাড়া করলে যে ছেলেটা গাড়ি নিয়ে আসে।'

'ওর নাম সৌমিত্র নাকি? তুমি তো আগে কখনও বলনি? তুমি তো ওকে গোপু বলে ডাকতে, আর ও তো তাতেই সাড়া দিত।'

'ওই গোপুরই ভাল নাম সৌমিত্র। সৌমিত্র কর্মকার। ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ ভাল নামটাই লেখা আছে।'

'সেটা আমি কী করে জানব? আমি কি ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখেছি?'

'আমি তোমাকে ওর ভাল নামটা বলিনি? নিশ্চয় বলেছি।' কেয়া হার মানার পাত্রী নয়।

'হয়ত বলেছ, আমার মনে নেই। কিন্তু ওসব কথা ছাড়। ও কি ওর মালিকের চাকরি ছেড়ে তোমার গাড়ি চালাবে বলেছে?'

'বলেছে।'

'কত নেবে কিছু বলেছে?'

'চোদ্দ বলেছিল। আমি বললাম বারো। শেষে তেরোতে রফা হয়েছে। 'ঠিকই আছে। ওর কমে আর কী হবে? তাহলে চল বুধবার গিয়ে দেখা যাক।'

ঘড়িতে যখন ঠিক ন'টা পনের বেজেছে, আদিত্য চিরকুটে দেওয়া নম্বরটা তার মোবাইলে সেভ করল। তারপর হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে নম্বরটা ডায়াল করল। ধরে নেওয়া যায়, মেয়েটি অতিরিক্ত সাবধান। না হলে সে আদিত্যকে হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করতে বলত না। হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করলে আড়ি পাতা যায় না।

'হ্যালো?" ওপার থেকে একটা স্বাভাবিক মেয়েলি গলা শোনা গেল। 'আমি আদিত্য মজুমদার বলছি।'

'আদিত্যবাবু?" মেয়েটির গলায় উত্তেজনা। গলার আওয়াজ কয়েক পর্দা নেমে গেছে। হয়ত আশেপাশে কেউ আছে যাকে এই কথোপকথন মেয়েটি শুনতে দিতে চায় না।

'হ্যাঁ, আমি আদিত্য মজুমদার বলছি। আপনি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।' 'একটু ধরবেন? আমি আগে ছাতে চলে যাই। ওখান থেকে কথা বলতে সুবিধে হবে।'

আদিত্য ফোন ধরে রয়েছে। মিনিট দুয়েক কেটে গেল। আদিত্যর বিরক্ত লাগছে। খিদেও পাচ্ছে। সে আড়চোখে দেখল কেয়া টেবিলে ডিনার সাজাচ্ছে।

'আদিত্যবাবু?' আবার মেয়েটির গলা। এবার অনেক স্পষ্ট।

'হ্যাঁ, বলুন। আমি লাইনে রয়েছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলছি। আসলে কী ভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না।' 'আপনার নাম কী? কী করেন?'

'আমার নাম মিতা অধিকারী। আমি গ্লোবাল ট্রেডিং এজেন্সি বলে একটা কম্পানিতে কাজ করি। আমাদের কম্পানি মূলত শাড়ি এক্সপোর্ট করে। আমি প্রোকিওরমেন্টে আছি। মানে আমার কাজ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে শাড়ি কেনা। তাঁতিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।'

'তা আমাকে হঠাৎ আপনার দরকার পড়ল কেন?'

'বলছি, বলছি। এর আগে আমি দারুচিনি বলে একটা শাড়ির বুটিকে কাজ করতাম । কলকাতায় দারুচিনি-র চার-পাঁচটা আউটলেট আছে। পুরো স্টকটাই লোকালি বিক্রি হয়। এক্সপোর্ট হয় না। হেড অফিসটা সল্ট লেকে। ওখানেও আমি প্রোকিয়োরমেন্টের কাজ করতাম। মানে ওই তাঁতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে শাড়ি কেনার কাজ। ঘোরাঘুরি করতে হত। তবে দরকার পড়লে রিটেল আউটলেটগুলোতেও বসতে হত। আবার মাঝে-মাঝে ব্যাঙ্কেও যেতে হতো। ছোট কম্পানি তো। খুব বেশি লোক নেই। তাই অনেক রকম কাজ করতে হতো।'

'আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না এসবের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?' আদিত্য অধৈর্য্য হয়ে পড়ছে। তার খিদেটা বাড়ছে।

'এক্ষুনি বুঝতে পারবেন। আমাকে একটু সময় দিন প্লিজ।' মিতা অধিকারী কাতরভাবে বলল। 'দারুচিনি-র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল সল্ট লেকেরই একটা ব্যাঙ্কে, ওখান থেকে কিছু লোনও নেওয়া হয়েছিল। ওই ব্যাঙ্কের ক্রেডিট ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন অশনি রায়। এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি?'

মিতা অধিকারী একটু থামল। জিরিয়ে নিচ্ছে। আদিত্যর খিদে নিমেষে উধাও হয়ে গেছে।

'দারুচিনি-র কাজে আমাকে মাঝে-মাঝেই ওই ব্যাঙ্কে যেতে হতো। অশনি রায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হতো। রায়সাহেবের সঙ্গে বেশ ভালই একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। একদিন একটা কাজে রায়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছি, কাজ শেষ হবার পর রায়সাহেব বললেন, আপনাদের বুটিক থেকে একটা শাড়ি কিনতে চাই। আমার বান্ধবীকে জন্মদিনে প্রেজেন্ট করব। জিনিসটা একটু এক্সক্লুসিভ হতে হবে। আমি বললাম সেলস পারসন হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা হল, শাড়ি পছন্দের ব্যাপারটা ভীষণ সাবজেক্টিভ। আপনার যে শাড়িটা এক্সক্লুসিভ মনে হচ্ছে আর একজনের সেটাকেই খুব খারাপ দেখতে মনে হতে পারে। তাই সব থেকে ভাল হয় আপনি যদি আপনার বান্ধবীকে নিয়ে আমাদের শর্ট স্ট্রিটের দোকানে চলে আসেন। ওখানেই স্টক সব থেকে ভাল। আমি নিজে উপস্থিত থেকে আপনাকে শাড়ি কিনিয়ে দেব।'

'উনি বান্ধবীকে নিয়ে এলেন?'

'একবার নয়। আমার যতদূর মনে পড়ছে মোট তিন-চারবার উনি বান্ধবীকে নিয়ে দারুচিনি-র শর্ট স্ট্রিট রিটেল আউটলেটে এসেছিলেন। খুব দামী কয়েকটা শাড়ি কিনেছিলেন।

‘অশনি রায়ের বান্ধবীকে আপনার মনে আছে?'

‘একটু একটু মনে আছে। ঈষৎ চাপা রঙ। চোখ সর্বদা কালো চশমায় ঢাকা থাকত । মুখের আধখানা ঢাকা থাকত ওড়নায়। ওঁর নাকি রোদ্দুরে এলার্জি ছিল। আমি ভাবতাম, দোকানের ভেতরে রোদ্দুর কোথায়? এখানে ওড়নায় মুখ ঢাকার কী দরকার?'

‘তারপর?’

‘তারপর হঠাৎ একদিন গ্লোবাল ট্রেডিং থেকে আমি একটা অফার পেলাম। এদেরও শাড়ির ব্যবসা, তবে প্রায় সবই এক্সপোর্টের জন্যে। এরা দারুচিনি-র থেকে অনেক বড় কম্পানি। আমার কাজ অবশ্য সেই একই। নর্থ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে শাড়ি প্রোকিওর করতে হবে। ধকলের চাকরি সন্দেহ নেই, কিন্তু স্যালারি, আগে যা পাচ্ছিলাম তার প্রায় ডবল। আমি রাজি হয়ে গেলাম। এখনও বাইরেই থাকি । জয়পুরে আমার অফিস। দেশের সঙ্গে যোগাযোগ কম। তবে মাঝে মধ্যে কাজের জন্য কলকাতায় আসতে হয়। কলকাতায় আমাদের হেড অফিস।'

‘তার মানে অশনি রায়ের মামলা যখন চলছিল আপনি তখন বাইরে। আপনি কি জানতেন এরকম একটা মামলা চলছে?'

‘তখন তখন জানতাম না। পরে একটু একটু করে জেনেছি। যখন পুরোটা জানতে পারলাম ততদিনে রায়সাহেবের বেশ কয়েক বছর জেল খাটা হয়ে গেছে। ইন্টারনেটে কেসটার ডিটেল পড়ার পর আমার মনে হল আমি তো এই মামলার একজন ইম্পর্টেন্ট সাক্ষী হতে পারতাম। আমি তো বেশ কয়েকবার অশনি রায়ের বান্ধবীকে দেখেছি। পুলিশকে আমি হয়ত দরকারি কিছু জানাতে পারতাম। যদিও ততদিনে দেরি হয়ে গেছে, তবু আমি আমাদের কম্পানির মালিক মুকেশ ঝুনঝুনওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি একবার পুলিশের সঙ্গে দেখা করব? মুকেশজি প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, খবরদার না। কেউ যেচে পুলিশের কাছে যায় নাকি? একবার পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ বারবার ডেকে পাঠাবে। পুলিশ ডাকলে বারবার রাজস্থান থেকে তোমাকে ছুটে আসতে হবে। তখন তোমার কাজের কী হবে ভেবে দেখেছ? পুলিশের কাছে যদি যেতে হয় তাহলে চাকরি ছেড়ে দাও। আমি তোমার জায়গায় অন্য লোক দেখি। কাজেই পুলিশের কাছে আমার যাওয়া হল না।'

‘তাহলে এখন আমার সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলতে চান? আচ্ছা তার থেকেও আগে বলুন, আমি যে অশনি রায়ের কেসটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি সেটা আপনি জানলেন কী করে?'

‘আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর আগে দিই। আপনি বোধহয় সব বাংলা কাগজ ভাল করে পড়েন না। আমি এখানে এলে গোগ্রাসে বাংলা খবর কাগজ পড়ি। ওখানে থাকতে কাজের চাপে হয়ে ওঠে না। একটা বাংলা কাগজেই দেখলাম পুলিশ সম্ভবত অশনি রায়ের বেকসুর খালাসের বিরোধিতা করে ডিভিশন বেঞ্চে অ্যাপিল করবে এবং আপনি অশনি রায়ের কেসটা হাতে নিয়েছেন। ইন্টারনেট থেকে আপনার ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার পেয়ে গেলাম। কিন্তু সরাসরি ফোন করে যোগাযোগ করতে পারলাম না। রেকর্ডেড মেসেজ বলছে এই নম্বরের কোনও অস্তিত্ব নেই। আপনি কি রিসেন্টলি ফোন নম্বর বদলেছেন?'

'হ্যাঁ, বদলেছি। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় এখনও পুরোনো নম্বরটা রয়ে গেছে।' আদিত্য ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলল।

‘আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছিল। সরাসরি আপনার ঠিকানায় এসে দেখা করতে পারছিলাম না। কেমন যেন মনে হচ্ছিল কেউ আমার ওপর নজর রাখছে। তাই বহু কষ্টে আপনার হাতে চিঠি দিয়ে এলাম। এখানে আমি কম্পানির গেস্ট হাউসে আছি। এখন ছাতে এসে কথা বলছি যাতে কেউ দেখে না ফেলে। সাবধানের মার নেই।'

‘আমি এখনও বুঝতে পারছি না আপনি কী ধরনের সাহায্য আমার কাছে চাইছেন? '

'আমি আপনার কাছে সাহায্য চাইতে যাব কেন? আমিই আপনাকে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফর্মেশন জানিয়ে সাহায্য করতে চাই। ইনফর্মেশনটা হলো, আমি কিছুদিন আগে অশনি রায়ের সেই বান্ধবীকে দেখেছি। যখন দেখেছি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। শুধু একটু চেনা চেনা মনে হয়েছিল। পরে যত ভাল করে ভেবেছি, তত কনভিন্সড হয়েছি যে তিনি অশনি রায়ের সেই বান্ধবী ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।'

আদিত্য খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে সে বলল, 'কতদিন আগে আপনি ওঁকে দেখেছেন?'

'সেটা জোর দিয়ে বলতে পারব না। আমাকে বছরে দু'তিনবার কলকাতায় আসতে হয়। সেই সময় কখনও দেখেছি। এক বছর আগেও হতে পারে। দু'বছর আগেও হতে পারে। ঠিক মনে নেই।'

'কলকাতার কোথায় ওঁকে দেখেছেন?'

মিতা অধিকারী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমি ভদ্রমহিলাকে আমাদের মালিক মুকেশ ঝুনঝুনওয়ালার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম।' আরও কিছুটা চুপ করে থেকে মেয়েটি বলল, 'আদিত্যবাবু আমার খুব ভয় করছে।'

(২)

আদিত্যর ছেলেবেলায়, যখন তাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল, নুরুল বলে এক বৃদ্ধ মুসলমান বাবুর্চি তাদের বাড়িতে রান্না করত। নুরুলের পুরো নামটা আদিত্যর মনে নেই। চেহারাটাও মনের মধ্যে আবছা হয়ে এসেছে। সাদা চুল, সাদা দাড়ি, শুধু এইটুকু মনে আছে। লোকটা আগে কোনও এক সাহেবের বাড়িতে রান্না করত। জুটমিলের বড় সাহেব। জুটমিল বন্ধ হয়ে যাবার পর সাহেব স্কটল্যান্ডে ফিরে গেল। আদিত্যর বাবা তখন বেকার নুরুলকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে। তার আগে নুরুল কাজ করত জৌনপুরের কাছে কোনও এক পড়তি নবাব-বাড়িতে। নুরুল যখন এ-বাড়িতে এল ততদিনে মা মারা গেছেন। বাবা কোথা থেকে নুরুলের সন্ধান পেল আদিত্যর জানা নেই। তবে সে ওই বয়েসেই বুঝতে পেরেছিল মা নেই বলেই বাড়ির হেঁসেলে মুসলমান বাবুর্চি ঢোকানো গেল, না হলে এটা সম্ভব হতো না।

বাড়ির রোজকার রান্না রাঁধতো বামুন ঠাকুর। কিন্তু বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান হলে, বিশেষ করে গানবাজনা থাকলে, নুরুল রান্না করত। বিরিয়ানি, কোর্মা, কালিয়া, কাবাব বিশেষ করে শেষের পদটিতে নুরুলের তুলনা ছিল না। কাবাব যে এত রকমের হতে পারে, নুরুল তাদের বাড়িতে রান্নার কাজ না করলে আদিত্য জানতেই পারত না। দেশের বাঘা বাঘা সব ওস্তাদ, যাঁরা আদিত্যদের বাড়িতে গান শুনিয়ে শ্রোতাদের ধরাশায়ী করে দিতেন, তাঁরা নিজেরাই নুরুলের কাবাব খেয়ে ধরাশায়ী হতেন। আবার কখনও কখনও মহারাষ্ট্র থেকে বিশুদ্ধ শাকাহারী গায়ক-গায়িকারা আসতেন। নুরুল তাঁদের নানা রকমের নিরামিষ কাবাব খাইয়ে কুপোকাত করে দিত।

খানদানী মোগলাই রান্না ছাড়াও নুরুল অসাধারণ বিলিতি রান্না করতে পারত। স্টেক, রোস্ট, পুডিং, সুফ্লে। এসব তার সাহেব গিন্নির কাছে শেখা। তবে নুরুল ছিল ঘোর ধর্মভীরু মুসলমান। সে চাকরিতে ঢোকার সময়ই বলে নিয়েছিল আর সব কিছু সে রান্না করবে কিন্তু পোর্ক সে ছোঁবে না। শুধু তাই নয়, যে বাড়ির রান্নাঘরে পোর্ক ঢোকে সেখানে সে চাকরি করতে পারবে না। নুরুলের অসাধারণ গুণাবলীর জন্যে আদিত্যর বাবা এই শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাল পোর্ক চপ কিংবা পোর্ক রোস্টের জন্য বাবার মন কেমন করত।

নুরুল একটা অসাধারণ ব্রেড পুডিং বানাত। এই রেসিপিটাও সেই চটকলের সাহেব গিন্নির। কিন্তু ব্রেড পুডিং বানানোর জন্যে সেন বেকারির আনস্লাইসদ্ধগ্ধ পাঁউরুটি নুরুলের চাই-ই চাই। সে বলে দিয়েছিল, সেন বেকারির পাঁউরুটি না হলে ব্রেড পুডিং-এ স্বাদ হবে না। সেই সময় সেন বেকারির পাঁউরুটি ছিল বাজারের

সেরা। শহরে এবং মফস্বলে। স্কটল্যান্ডের সাহেব-মেমও সেই পাঁউরুটির তারিফ করত। বাঙালি তখনও ব্যবসায় এতটা অবনতি করেনি।

শ্যামবাজারে মেট্রো স্টেশন থেকে নেমে বাগবাজার স্ট্রিট ধরে গঙ্গার দিকে হাঁটতে হাঁটতে আদিত্যর এইসব পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেন বেকারির বর্তমান মালিক পল্লব সেন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সময় দিয়েছেন। সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টা। সোয়া ছ'টায় তাঁকে নাকি দরকারি কাজে বেরিয়ে যেতে হবে। আদিত্য ঝুঁকি না নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। ঘড়িতে এখনও পৌনে পাঁচটাই বাজেনি।

এই গ্রীষ্মকালে এখন চড়চড়ে রোদ থাকার কথা। থাকলে হাঁটাটা কষ্টকর হতো। কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদে আজ আকাশে মেঘ আছে। এবছর প্রায় রোজই বিকেলের দিকে মেঘ করছে। আজও তাই। রাস্তায় হালকা ভিড়। কচুরির দোকানের পাশে চায়ের দোকান। লোকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কচুরি খাচ্ছে। তারপর পাশের দোকানে চা। রোল-চাউমিনের দোকানেও ভিড় আছে। আরও খানিকটা এগিয়ে 'লড়াই-এর চপ'এর জন্য বিখ্যাত সেই তেলেভাজা বিপণি। সেসব প্রলোভন পেরিয়ে আদিত্য চিৎপুর রোডে এসে পড়ল।

পল্লব সেনের বাড়িটা বাগবাজার গঙ্গার ধারে। পল্লব সেন বলে দিয়েছিলেন, বাগবাজার স্ট্রিট ধরে পশ্চিমমুখো হাঁটতে হাঁটতে চিৎপুর রোড পেরিয়ে গঙ্গার ধার অব্দি চলে আসতে হবে। সামনেই পড়বে বাগবাজার ঘাট। তার গা দিয়ে গঙ্গার ধার ঘেঁসে স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড চলে গেছে। সেটা ধরে দক্ষিণমুখো অর্থাৎ কাশী মিত্তিরের ঘাটের দিকে কয়েক মিনিট গেলেই রাস্তার ওপরে সেনেদের বনেদি বাড়ি। ওখানে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে।

পল্লব সেনের কথা শুনতে শুনতে আদিত্য খেয়াল করেছিল তিনি চিৎপুর রোডকে তার আধুনিক নাম, অর্থাৎ রবীন্দ্র সরণী, বলে উল্লেখ করছেন না। আদিত্যর মনে পড়ে গিয়েছিল অন্নদাশঙ্করের সেই ছড়া, "দ্বিধা হও, দ্বিধা হও ওগো মা ধরণী/ চিৎপুরের নাম হল রবীন্দ্র সরণী'।

একটা লোক রাস্তার চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করতেই পল্লব সেনের বাড়িটা দেখিয়ে দিল। গঙ্গার দিকে মুখ করে একটা বৃদ্ধ, অতিকায় দৈত্যের মতো বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ছাতের কার্নিশ ফুঁড়ে বট-অশত্থের চারা। বাইরের দেয়ালে শ্যাওলা ধরেছে। এই রকম ভেঙে পড়া পুরোনো বাড়ির সঙ্গে আদিত্য খুব একাত্মবোধ করে। তার ওপর সামনে গঙ্গা, ওপরে মেঘ, মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুরের তির জলের ওপর এসে পড়েছে।

আদিত্য নদীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নদীর আধখানা মেঘের ছায়ায় জিরিয়ে নিচ্ছে। বাকিটা রোদ্দুরের দখলে। দু'একটা নৌকো ভাসছে এদিক-ওদিক। কয়েকটা পাড়ে নোঙর করা। মাঝির সংসার দুলছে, ভাসছে। ঢেউএর তালে তালে নাচছে। ঢেউএ তেজ আছে। ফুলে ওঠা জলের মাংসপেশি পাড়ে আছড়ে পড়ছে। ফুল, লতাপাতা, পুজোর উপাচার, বাঁশের কাঠামো ঢেউএর টানে তীরে এসে জমা হচ্ছে। সাড়ে পাঁচটা বাজতে এখনও সাত-আট মিনিট বাকি। এই সময়টুকু গঙ্গা দেখতে দেখতে চমৎকার কেটে যাবে। আদিত্য সিগারেট ধরাল। কেয়ার বকুনিতে কয়েকদিন ধূমপান বন্ধ ছিল। গতকাল থেকে আবার চুপি চুপি শুরু হয়েছে।

যে লোকটা আদিত্যকে বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছিল তার বোধহয় চা খাওয়া হয়ে গেছে। আদিত্যকে গঙ্গার ধারে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে এগিয়ে এল।

'পল্লব সেনের সঙ্গে দেখা করবেন?" লোকটা মনে হয় গল্প করার মুডে আছে। আদিত্যর একটুও কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। সে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।' 'পাখি? না পাঁউরুটি?'

আদিত্য এবার সত্যিই অবাক হয়েছে। সে জিজ্ঞাসু চোখে লোকটার দিকে তাকাল । 'মানে বলছিলাম, আপনারও কি ওই পাখি দেখার শখ? নাকি কেক-পাঁউরুটির এজেন্সি নেবেন? এদের কেক-পাঁউরুটি কিন্তু আগেকার মতো আর নেই।'

'পাখি দেখার শখ ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

‘সে কী! আপনি পল্লব সেনের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন আর জানেন না উনি দেশের সেরা পাখি-দেখিয়েদের একজন? এদের কী যেন একটা ইংরিজি নামও আছে, ঠিক মনে পড়ছে না।'

‘বার্ড ওয়াচার।’

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই, ওই, ওটাই।'

‘আপনি কি এই পাড়াতেই থাকেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল। সে এবার সরাসরি লোকটার দিকে তাকিয়েছে। আধময়লা জামা, প্যান্টটাও পুরোনো, কিন্তু মাথার চুল এবং গালের দাড়ি বেশ পরিপাটি করে কাটা ।

‘এই পাড়াতে থাকি তো বটেই। এখানে আমাদের তিন পুরুষের বাস। একটু এগিয়ে গঙ্গার ধারেই আমার একটা সেলুন আছে। আমি নিজে আর চুল কাটি না। তিনজন সেলুনে কাজ করে। ওরাই এখন চুল-দাড়ি কাটে।'

লোকটার পরিপাটি করে চুল-দাড়ি কাটার রহস্য বোঝা গেল। ‘বললেন না তো পল্লব সেনের সঙ্গে কী দরকার।'

‘আপনিই তো বলে দিলেন। কেক-রুটির এজেন্সি নেব। বনগাঁয়।'

‘বনগাঁয়? বনগাঁর কোথায়? আমার বড় সম্বন্ধী বনগাঁয় থাকে। আমি ওদিকটা অনেকবার গেছি।'

আদিত্য প্রশ্নটা না শোনার ভান করে বলল, ‘পল্লব সেন লোক কেমন? '

প্রশ্নটা মনে হল সেলুন মালিকের পছন্দ হয়েছে। সে রহস্যময় হাসি হেসে বলল, ‘ওপর ওপর দেখলে আপনার মনে হবে লোকটা ভোলা-ভালা, পাগল-ছাগল গোছের। সারাদিন পাখি নিয়ে পড়ে আছে। হয় দুরবীন দিয়ে পাখি দেখছে আর না হয় পাখির ছবিওলা মোটা মোটা বিলিতি বইএর পাতা ওল্টাচ্ছে আর গান শুনছে। আমরা পুজোর চাঁদা বা পাড়ার অন্য কোনও সমস্যার কথা বলতে গিয়ে লোকটাকে ওই রকমই দেখেছি। পাড়ার কাজে টাকা-পয়সা দিতে অবশ্য পল্লব সেন কখনও কার্পণ্য করে না।'

‘আপনাদের এখানে পাখি-টাখি আসে নাকি?'

‘আসে বৈকি। গঙ্গার ওপরে এখনও অনেক রকম পাখি আসে। গাংচিল -টাংচিল গোছের। আমি অত নাম টাম জানি না। মাঝে মাঝেই দেখি পল্লব সেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরবীন দিয়ে পাখি দেখছে। তাছাড়া সেন বাড়ির পেছনে এখনও বেশ বড় একটা বাগান আছে। ওখানেও নানারকম পাখি আসে।'

‘তা আপনি বলছিলেন না পল্লব সেন লোকটা ওপর ওপর ভোলা ভালা? ভেতরটা কি তাহলে অন্যরকম?'

“আরে, সেটাই তো বলতে যাচ্ছিলাম। আসল কথাটা খুব বেশি কেউ জানে না। আমরা দু'একজন, যারা অনেক দিন এই পাড়ায় আছি, আমরা জানি। পল্লব সেন লোকটা আসলে এক নম্বরের শয়তান। ওর শয়তানি দেখে ওর বউ ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ওর দাদা যে অ্যাক্সিডেন্ট-এ মারা গেল সেটাও অনেকে বলে সুইসাইড। তার কারণও পল্লব সেনের কুকীর্তি। আপনাকে দেখে ভালমানুষ মনে হচ্ছে তাই বলছি। পল্লব সেন লোকটা মোটেই সুবিধের নয়। ওর সঙ্গে খুব সাবধানে ব্যবসা করবেন।'

‘আমি নিশ্চয় সাবধান হব। কিন্তু পল্লব সেনের শয়তানিটা কী ধরনের একটু খোলসা করে বলবেন?' আদিত্য মুখটা যথাসম্ভব করুণ করে বলল।

‘শয়তানি কি একটা নাকি? তবে সব থেকে বড় বদমায়েসিটা হল, বৌদির সঙ্গে লটঘট করা। পল্লব সেনের সঙ্গে ওর বৌদির খুব নোংরা সম্পর্ক আছে। সেই জন্যেই তো ওর বউটা ভেগে গেল। দাদা সুইসাইড করল। আমার এসব বলতেও খারাপ লাগে।' যদিও লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছিল কথাগুলো বলতে তার বেশ ভাল লাগছে।

কথাবার্তা আরও কতক্ষণ চলত কে জানে, আদিত্য হঠাৎ লক্ষ করল ঘড়িতে প্রায় পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। সে খুব বিনীতভাবে বলল, “আপনি আমার খুব উপকার করলেন । আমাকে কিন্তু এবার এগোতে হবে। পল্লব সেন

সাড়ে পাঁচটায় সময় দিয়েছেন।'

পল্লব সেনের বাড়ির লোহার গেটটা খুলতে খুলতে আদিত্য ভাবছিল, ভদ্রলোক তো পাড়ার চাঁদা-টাদাগুলো নিয়মিত দিয়ে দেন। তাহলে তাঁর ওপর পাড়ার লোকেদের এত রাগ কেন? নাকি এটা শুধু সেলুন মালিকের রাগ?

কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়িতে ওঠার মুখে দুদিকে দুটো ভারী পেতলের পাত্রে ফণিমনসা। পালিশ করা কাঠের হাতল। পায়ের নিচে ভারি কার্পেট। বাইরে থেকে বাড়িটাকে যেমন জরাক্রান্ত মনে হয়, ভেতরটা মোটেই তেমন নয়। গেটে নিশ্চয় আদিত্যর নাম বলা ছিল। নাম শোনা মাত্র দরোয়ান সদর দরজা অব্দি পৌঁছে দিয়েছে। ধুতি এবং হাতগুলা গেঞ্জি পরা যে পরিচারক দরজা খুলল সে আদিত্যকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিয়ে যেতে যেতে জানাল ছোটসাহেব আদিত্যর জন্যে দোতলার বসার ঘরে অপেক্ষা করছেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হালকা গানের আওয়াজ আদিত্যর কানে ভেসে এল। যত ওপরে উঠছে তত স্পষ্ট হচ্ছে গানের আওয়াজ। দোতলায় পৌঁছে আদিত্য বুঝতে পারল গলাটা রসলুন বাই-এর। ভৈরবী ঠুংরি গাইছেন। ফুলগেন্দয়া না মারো, লগত করজোয়া মে চোট।

বসার ঘরটা বেশ বড়। জানলাগুলোতে পর্দা টানা, তাই কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। মনে হয়, গঙ্গার দিক থেকে আসা পশ্চিমের রোদ্দুর যাতে ঘরে ঢুকতে না পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা। আধো-অন্ধকারে আদিত্য ঠাহর করে দেখল কোণের দিকে একটা আরাম কেদারায় কেউ একজন বসে আছে। আদিত্যকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সে বলল, 'আসুন, আসুন। বসুন। মৃত্যুঞ্জয়, ঘরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দাও।' শেষ কথাগুলো পরিচারকের উদ্দেশে।,

আদিত্য বসল। গৃহকর্তাও বসল। মৃত্যঞ্জয় আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। পল্লব সেনকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বয়েস পঞ্চাশের নিচেই হবে। বনেদি চেহারা, সুপুরুষ, গায়ের ফরসা রঙ রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাঁ কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির নিচ দিয়ে শরীরের আসল রঙটা বেরিয়ে পড়েছে।

'দাঁড়ান, গানটা বন্ধ করে দিই। পল্লব সেন আবার ওঠার উপক্রম করল। 'না, না। চলুক না গানটা।' আদিত্য প্রায় স্বতস্ফূর্তভাবে বলল। 'আপনি এইসব গান শোনেন?' পল্লব সেন যেন যাচাই করে নিতে চায় আদিত্য নেহাত ভদ্রতার খাতিরে কথাগুলো বলল নাকি সত্যিই সে গানটা শুনতে চায়।

"শুনি। খুব শুনি। তাছাড়া এই গানটা বিশেষ করে শুনতে ইচ্ছে করছে। এটার রেকর্ডের ভার্সানটা ইউ টিউবে আছে, সেটা শুনেছি। কিন্তু সেটা তো মাত্র আড়াই-তিন মিনিট। এইটা মনে হয় লাইভ রেকর্ডিং। তবে নিশ্চয় পুরোনো। রসলুন বাই-এর গলাটা বেশ ইয়াং শোনাচ্ছে।'

'আপনি তো সমঝদার লোক মশাই।' পল্লব সেনকে উল্লসিত শোনাল। 'এটা আর্লি ফিফটিজে কলকাতায় গাওয়া। তখন রসলুন বাই-এর বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু গলার দাপট দেখেছেন?'

এর পরের পনের মিনিট গান চলল। আদিত্য বুঁদ হয়ে শুনছে। আবার মাঝে মাঝে ভাবছে পল্লব সেন বলেছিল ছ'টা অব্দি সময় দিতে পারবে। ছ'টা বাজতে তো আর মিনিট পাঁচেক বাকি। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাল করে কথা বলা যাবে তো?

গান শেষ হতে পল্লব সেন বলল, 'এরকম ওজনদার গলা আর শোনা যাবে না। আখতারী বাইও নেই, রসলুন বাইও নেই। শেষ ছিলেন সিদ্ধেশ্বরী বাই। তিনিও কবে চলে গেছেন। আর কার গান শুনব?' পল্লব সেন ভারী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আদিত্য বলল, 'আপনাকে তো সোয়া ছটায় বেরিয়ে যেতে হবে। আমার কথাগুলো তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে নিই।'

'বলেছিলাম বুঝি সোয়া ছ'টায় বেরিয়ে যেতে হবে?" পল্লব সেনকে খানিকটা অপ্রস্তুত দেখাল। ‘আসলে কী জানেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আপনি লোকটা কেমন হবেন। এমন লোক আপনি হতেই তো পারতেন যার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। তাই রিস্ক না নিয়ে একটা সময় বেঁধে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি যখন রসলুন বাইএর গলা চিনতে পেরেছেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে হবে না। আপনি সময় নিয়ে বলুন কী জানতে চান।'

আদিত্য মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে। কীভাবে শুরু করবে? কীভাবে এগোবে?

‘টেলিফোনে আপনাকে বলেছিলাম আমি একজন সাংবাদিক। বাঙালির ব্যবসা নিয়ে একটা লেখা তৈরি করছি। তাই সেন বেকারি সম্বন্ধে কথা বলতে চাই।' আদিত্য শুরু করল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে আছে। তবে ব্যবসার ব্যাপারটা আমি খুব একটা জানি না। বাবা মারা যাবার পর ব্যবসাটা দাদাই দেখত। প্রায় ষোলো বছর হতে চলল দাদা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। বৌদি আমারই মতো। ব্যবসার ব্যাপারটা খুব বেশি বোঝে না। আমাদের একজন পুরোনো ম্যানেজার আছেন, দাদা মারা যাবার পর থেকে তিনিই ব্যবসাটা দ্যাখেন। আমাদের বেকারি প্রডাক্ট আগেকার মতো না হলেও এখনও কিন্তু খানিকটা চলে। বিশেষ করে মফস্বলে। মাইনে-পত্তর নিয়ে ওয়ার্কারদের খুব একটা গ্রিভান্স আছে বলে মনে হয় না। এবং আমি আর বৌদি সেন বেকারির মালিক হিসেবে প্রফিটের যে অংশটা পাই, দেখতেই তো পাচ্ছেন, তাতে আমাদের বেশ কমফরটেবলি চলে যায়। তা আপনি আমাদের ব্যবসার ব্যাপারে ঠিক কী জানতে চাইছেন?'

‘পল্লববাবু, আমি টেলিফোনে আপনাকে মিথ্যে বলেছিলাম। আমার সত্যি পরিচয়টা দিলে আপনি সম্ভবত আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হতেন না'। আদিত্য ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলল।

‘মিথ্যে বলেছিলেন?"পল্লব সেনের ভুরু দুটো ধনুকের আকার ধারণ করেছে। ‘হ্যাঁ। আসলে আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা।'

‘বেসরকারি গোয়েন্দা? সে আবার বাস্তবে হয় নাকি? তাদের তো দিশি-বিদেশি থ্রিলারে দেখা যায়। শার্লক হোমস, একুল পোয়ারো, ডরোথি সেয়ার্সের লর্ড পিটার হুইমসি, রেমন্ড চ্যান্ডলারের ফিলিপ মারলো। আমাদের দিশি গোয়েন্দা জয়ন্ত-মানিক, ফেলুদা। আর সবার ওপরে ব্যোমকেশ বক্সি।' পল্লব সেন চওড়া করে হাসলেন। মনে হচ্ছে আদিত্যর কথাটা তিনি ঠাট্টা মনে করছেন। বললেন, ‘জানেন তো শখের গোয়েন্দা জয়ন্ত-মানিকের স্রষ্টা হেমেন্দ্রকুমার রায় এই গঙ্গার ধারে আমাদের তিনটে বাড়ি পরে থাকতেন ? '

‘পল্লববাবু আমি সত্যিই একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। তবে জয়ন্ত-মানিকের মতো শখের গোয়েন্দা নই। নেহাতই পেটের দায়ে এই লাইনে এসেছি।' আদিত্য মরিয়া গলায় বলল।

আদিত্যর গলা শুনে পল্লব সেন খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেছে। বোধহয় বুঝতে পেরেছে আদিত্য ঠাট্টা করছে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, “কিন্তু আমার কাছে গোয়েন্দা কেন? আমি তো চুরি-ডাকাতি কিছুই করিনি।'

“ছি, ছি। আপনি চুরি-ডাকাতি করতে যাবেন কেন? আমি আপনার কাছে এসেছি কিছু তথ্য পাবার আশায়।' আদিত্য কাঁচুমাচু হবার ভান করল।

‘তথ্য? আমার কাছে কীসের তথ্য?'

‘আপনার নিশ্চয় মনে আছে, বছর তিনেক আগে ভি আই পি রোড সংলগ্ন বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ-এ আপনাদেরই একটা ফ্ল্যাটে আপনাদের ডিস্ট্রিবিউটার পার্থ মিত্র আর তার স্ত্রী মৃত্তিকা মিত্র খুন হয়েছিলেন। এবং খুনের অভিযোগে অশনি রায় বলে এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। সম্প্রতি হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ অশনি রায়কে বেসুর মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, পুলিশ ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করবে। অশনি রায়ের বাবা আমাকে কেসটাতে নিযুক্ত করেছেন। আমার কাজ অশনি রায়ের সপক্ষে কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করা। ডিভিশন বেঞ্চে মামলা উঠলে যেগুলো আদালতে পেশ করা যাবে।'

'আপনি রসলুন বাই-এর গান শোনেন আবার গোয়েন্দাগিরিও করেন? কী আশ্চর্য!' আদিত্য কথা শেষ করার আগেই পল্লব সেন বলে উঠল। 'আপনি যেমন পাখিও দেখেন আবার পাঁউরুটিও বিক্রি করেন।' আদিত্যর মুখ দিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাগুলো বেরিয়ে গেছে। সে ভাবছে, লোকটা নিশ্চয় খুব রেগে যাবে।

পল্লব সেন কিন্তু রাগল না। মৃদু গলায় বলল, 'আমি তো আপনাকে আগেই বললাম ব্যবসা আমি দেখি না। পাঁউরুটি বিক্রি করা আমার কাজ নয়। পাখি দেখা, গান শোনা ইত্যাদি কয়েকটা সখ আমার আছে। ওগুলো নিয়েই আমি থাকি। খুনের ব্যাপারটা আমি ততটুকুই জানি যতটা খবর কাগজ পড়ে আর পাঁচজন জানে। আমি আপনাকে খুব একটা সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না।'

'আমি আপনাকে খুনের ব্যাপার নিয়ে কিচ্ছু জিজ্ঞেস করছি না, মিস্টার সেন। আমি শুধু পার্থ মিত্র লোকটি সম্বন্ধে একটু জানতে চাইছি। উনি কত দিন আপনাদের ডিসট্রিবিউটার ছিলেন?'

পল্লব সেনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করছেন। মৃত্যঞ্জয় বলে সেই পরিচারক চা নিয়ে এসেছে।

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে পল্লব সেন বলল, 'পার্থ মিত্রকে আমি খুব একটা চিনতাম না। আমার বাবার আমলে গোবিন্দ লাহা ছিলেন আমাদের সোল ডিসট্রিবিউটার। তার ছেলে অভিজিৎ লাহা দাদার আমলে আমাদের সমস্ত প্রডাক্ট ডিসট্রিবিউট করত। কোনও কারণে আমাদের পুরোনো ম্যানেজার প্রণব মাইতির সঙ্গে অভিজিৎ লাহার খুব একটা বনতো না। ফলে, দাদা হঠাৎ চলে যাবার পরে লাহাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ফিকে হয়ে আসে। যদিও আমার মনে হয় লাহাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু আমার মতের খুব একটা দাম নেই, যেহেতু আমি ব্যবসাটা দেখি না। তবু প্রণববাবুকে বলেছিলাম। তো তিনি লাহাবাড়ির নতুন প্রজন্মের নানারকমের খুঁত বার করলেন। তারপর একদিন এই পার্থ মিত্রকে ধরে আনলেন। বললেন পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে এদের খুব ভাল ডিসট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক আছে । এদের সঙ্গে ব্যবসা করলে কম্পানির ভাল হবে। আমি আর কী বলব? রাজি হয়ে গেলাম।'

'আপনার দাদা মারা গেছেন ষোলো বছর আগে। তার মানে রাফলি ষোলো বছর আগে পার্থ মিত্রদের কম্পানিকে আপনারা ডিসট্রিবিউটার হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। আর পার্থ মিত্র খুন হয়েছে তিন বছর আগে। অর্থাৎ তেরো বছর ওর কম্পানি আপনাদের প্রডাক্ট ডিস্ট্রিবিউট করেছে। এই তেরো বছরে আপনার সঙ্গে পার্থ মিত্রর ইন্টার‍্যাকশান হয়নি?'

'হয়েছে, তবে খুবই সামান্য। আমাদের কিছু পুরোনো শেয়ার হোল্ডার আছে। প্রত্যেক বছর একটা করে এজিএম করতে হয়। সেখানে পার্থ মিত্রর সঙ্গে দেখা হতো। তাছাড়া আরও দু'একবার হয়ত কোনও কাজে পার্থ মিত্র আমার কাছে এসেছে।'

'লোকটা সম্বন্ধে আপনার কী রকম ইম্প্রেশন?'

'দেখুন, পার্থ প্রায় আমারই বয়সী। বড় জোর তিন-চার বছরের ছোট হবে। কিন্তু ওর সঙ্গে আমি একটা জেনারেশন গ্যাপ অনুভব করতাম। পার্থ ছিল আর পাঁচটা চল্লিশ-পেরিয়ে-যাওয়া আধুনিক যুবকের মতো। সেই রকম পোষাক, সেই রকম কথাবার্তা। আর আমি একেবারে সেকেলে। না হলে বলুন না আমার বয়সী ক'টা লোক খেয়াল-ঠুংরি শোনে? আসলে, আধুনিক যুবকদের সঙ্গে আমি একেবারেই মিশতে পারি না। বন-জঙ্গলে পালিয়ে যাই। দোষটা আমারই। পার্থ মিত্র যে মানুষটা খারাপ ছিল তা নয়।'

'পার্থ মিত্র খুন হবার পর আপনাদের ডিসট্রিবিউশনটা কোন কম্পানি হ্যাল্ করে?'

'আমরা নিজেরাই এখন আমাদের ডিসট্রিবিউশনটা ম্যানেজ করি। বাইরের কোনও কম্পানিকে আর আমরা এমপ্লয় করিনি। একজন ডিসট্রিবিউশন ম্যানেজার আছে। সে-ই ডিসট্রিবিউশনটা দ্যাখে।'

'আপনি কি পার্থ মিত্রর স্ত্রী মৃত্তিকা মিত্রকে চিনতেন?'

'খুব ভাল চিনতাম বলতে পারি না। দু'চারবার দেখেছি।'

'কী রকম মনে হয়েছে?

'ওই আজকালকার মেয়েরা যেমন হয়। চোখে মুখে কথা বলে। আসলে কী জানেন, আমি মেয়েদের সঙ্গে খুব একটা মিশতে পারি না। বিশেষ করে মৃত্তিকা মিত্রর মতো অ্যাগ্রেসিভ মেয়েরা আমাকে প্রচণ্ড রিপেল করে।' পল্লব সেন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'একমাত্র আমার বৌদি আমাকে বুঝতে পারে। বৌদি আমার থেকে মাত্র চার বছরের বড়। কিন্তু মাতৃস্নেহে আমাকে আগলে রেখেছে। বৌদি না থাকলে আমার কী যে হতো।' পল্লব সেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আপনার পড়শিদের কেউ কেউ কিন্তু আপনার প্রতি ততটা সদয় নন। আপনার বাড়িতে ঢোকার মুখে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। কাছেই কোথাও তার একটা সেলুন আছে। আপনার বিরুদ্ধে তার অনেক অভিযোগ।'

পল্লব সেনের মুখটা অন্ধকার হতে হতে হঠাৎ হাসিতে ভরে গেল। বলল, "ও। বুঝতে পেরেছি। কেষ্ট প্রামাণিক। আমার জমিতে একটা সেলুন করতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি তাই আমার নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়। ও একটা হনুমান। ওকে স্বচ্ছন্দে ইগনোর করতে পারেন।'

'আর এক দিন এসে আপনার গানের কালেকশানটা দেখব। আপত্তি নেই তো?' আদিত্য উঠতে উঠতে বলল।

'আপত্তি কীসের? গান এমনই জিনিস সমঝদারদের সঙ্গে শেয়ার করতে ইচ্ছে করে। আপনি একটা ফোন করে চলে আসবেন। আমি আবার মাঝে মাঝে কলকাতায় থাকি না তো।'

আদিত্য বাইরে বেরিয়ে দেখল সন্ধে নেমে এসেছে। অন্ধকার নদীতে চলমান আলোর বিন্দু। যাত্রী নিয়ে ইস্টিমার নদী পেরোচ্ছে।

(৩)

কয়েক দিন অসহ্য গরম পড়েছে। দাবদাহ। বেলা এগারোটার পর রাস্তায় বেরোনো যায় না। বাড়িতেও টেকা মুস্কিল। আদিত্যদের ফ্ল্যাটের দেয়ালগুলো বেশ পাতলা। সিলিংটাও নিচু। আজকালকার ফ্ল্যাটবাড়ি যেমন হয়। সব মিলিয়ে গ্রীষ্মের দুপুরগুলোতে বাড়িটা অসহনীয় হয়ে ওঠে। কেয়া সকাল সকাল বেরিয়ে যায় বলে গরমটা ততটা টের পায় না। গত কয়েক দিন যাবত আদিত্য কেয়ার সঙ্গেই বেরিয়ে যাচ্ছে। পুরোনো দিনের বাড়ি বলে আদিত্যর আপিসটা প্রবল গ্রীষ্মেও বেশ ঠাণ্ডা থাকে।

মনে হচ্ছে কেয়া এবার একটা গাড়ি কিনেই ফেলবে। শো-রুমে গিয়ে একটা লাল রঙের মারুতি ওয়্যাগন আর পছন্দ করে এসেছে। লাল রঙটা কেয়ার খুব পছন্দ। গাড়িটা ডেলিভারি পেতে কয়েক দিন লাগবে। এর মধ্যেই কেয়া ছক কষে ফেলেছে গাড়িটা এলে কী করবে। সকালে কেয়াকে তার ইস্কুলে নামিয়ে গাড়িটা আদিত্যকে আপিসে পৌঁছে দেবে। তারপর আবার কেয়ার ইস্কুলে ফিরে আসবে। আদিত্য বলে দিয়েছে ফেরার সময় সে কিছুতেই গাড়ি নেবে না। কিছুটা বাসে, কিছুটা হেঁটে যখন যেমন ইচ্ছে করে তেমনি করে ফিরবে। এই স্বাধীনতাটা আদিত্যর খুব ভাল লাগে। একটাই সমস্যা। গাড়িটা রাখার একটা বন্দোবস্ত হলেও ড্রাইভার এখনও পাওয়া যায়নি।

আজ আপিসের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বিমলের ফোন। পুরোনো দিনের খাড়া খাড়া অনেকগুলো সিঁড়ি। সিঁড়ি ভাঙার সময় এমনিতেই আদিত্যর কষ্ট হয়। কথা বলতে হলে আরও কষ্ট। আগে এতটা হতো না। ইদানীং হচ্ছে। এখনও সিগারেটটা ছাড়া হল না । কেয়াকে লুকিয়ে আবার দিনে দশ-বারোটা হয়ে যাচ্ছে। আদিত্য বিমলকে বলল, 'ঘরে গিয়ে কল ব্যাক করছি।'

'বল, কিছু খবর আছে?' ঘরে পৌঁছে সিগারেট ধরানোর পর আদিত্য বিমলের ফোনটা লাগাল।

'আছে স্যার। তাই তো ফোন করছি। সোমনাথ বাগের খোঁজ পেয়েছি। ও আর এখন চ্যাম্পিয়ান সিকিউরিটিজ-এ কাজ করে না। তবে ওরাই সোমনাথের নতুন কম্পানির হদিশ দিল। বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ একজন জিজ্ঞেস করল, সোমনাথ বাগকে কী দরকার? বললাম, সোমনাথ বাগের বাবা আমার বাবার বন্ধু। আমরা কুচবিহারে থাকি। আগে সোমনাথরাও থাকত। তা, ক'দিনের জন্যে কলকাতা এসেছি, তাই ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। সেই লোকটা বলল, সোমনাথরা তো নদীয়ার লোক, ওরা আবার কবে কুচবিহারে থাকত? আমি বললাম, নদীয়ায় তো পরে গেছে। আগে কুচবিহারেই থাকত। লোকটা বলল, এটা সোমনাথ কখনও বলেনি তো। লোকটার কথা শুনে মনে হল সে আমাকে ঠিক বিশ্বাস করছে না। যাই হোক, আমি কোনও রকমে ভুজুং ভাজাং দিয়ে বেরিয়ে এলাম। সোমনাথ বাগের নতুন কম্পানির নামটা তো আগেই জানা হয়ে গেছে।'

'কোন কম্পানি?'

'তিরুপতি গার্ডস। সল্ট লেকে অফিস। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম ওরা একটা সরকারি কম্পানিতে সোমনাথকে ডিউটিতে দিয়েছে। বিবাদী বাগে সেই কম্পানির অফিস। আমি এখনও সেখানে যাইনি, কারণ আমার মনে হচ্ছে চ্যাম্পিয়ান সিকিউরিটিজ-এর সেই লোকটা ইতিমধ্যে সোমনাথের সঙ্গে কথা বলেছে। আমি গেলেই সোমনাথ আমাকে চেপে ধরবে। তাই বলছিলাম, আমি যাব, নাকি আপনি যাবেন?'

'আমিই যাব। তুমি কম্পানির নাম আর ঠিকানাটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও। আর শোনো, তোমার মেয়ে কেমন আছে?'

'এখন অব্দি ঠিক আছে স্যার। এখনও পেন ওঠেনি। যে কোনও দিন উঠতে পারে। গিন্নি মেয়ের কাছে আছে।'

'কিছু হলে খবর দিও। চিন্তায় রইলাম।

মোবাইলটা টেবিলে রেখে আদিত্য কফি বানাতে যাবে, ফোনটা আবার বেজে উঠল। এক-একদিন এরকম হয়। সারাদিন ধরে নানা ফোন আসে। আবার এক-একদিন ফোনই আসে না। আদিত্য কফি বানানোর পরিকল্পনা বাদ দিয়ে টেবিলে এসে ফোনটা ধরল। গৌতম।

'আরে তোর ব্যাপারটা কী? পাত্তাই নেই। কী করিস সারাদিন?' গৌতমের গলা ওপার থেকে গমগম করে উঠেছে।

"আমার পাত্তা নেই মানে? আমাকে তো সব সময় পাওয়া যায়। তোকেই ফোন করলে পাওয়া যায় না। মিটিং-এ ব্যস্ত থাকিস।'

'আরে আমাকে তো আমি সব সময় দেখতে পাচ্ছি। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই দেখতে পাচ্ছি। তোকে কোথায় দেখছি?'

আদিত্যর সন্দেহ হল গৌতম রসিকতার চেষ্টা করছে। সে স্বাভাবিক গলায় বলল, "নিশ্চয় আমাকে কোনও কারণে তোর দরকার। বল কী দরকার।'

'ঠিক ধরেছিস। তোকে আমার দরকার। তুই তৈরি হয়ে নিচে নেমে আয়। আমি তোকে তোর অফিসের সামনে থেকে তুলে নিচ্ছি। লাঞ্চ খেতে খেতে আমার দরকারটা বলব। এখন আসতে অসুবিধে নেই তো?'

মিনিট সাত-আট পরে গৌতমের গাড়িতে বসে আদিত্য জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোথায় লাঞ্চ খেতে যাচ্ছি?'

'পার্ক স্ট্রিটে কুইজিনস বলে একটা নতুন রেস্তোরাঁ হয়েছে। যেখানে আগে স্কাইরুমটা ছিল, তার কাছাকাছি। ওখানেই যাচ্ছি। ওখানে নাকি খুব অথেনটিক কিছু ইটালিয়ান ডিশ পাওয়া যাচ্ছে। ইংরেজি কাগজে রিভিউ বেরিয়েছে।'

'রিভিউটা আমিও পড়েছি। যে খয়েরি সাহেব রিভিউটা লিখেছেন তিনি দেখলাম প্রশংসা করতে করতে একেবারে গাড়ু-গামছা হয়ে গেছেন। দেখা যাক, তাঁর আবেগটা কতটা খাঁটি।'

গাড়ি ভিড়ের রাস্তা দিয়ে শম্বুক গতিতে চলেছে। মেট্রো সিনেমা থেকে টাইগার সিনেমা অব্দি যেতে মিনিট কুড়ি লেগে গেল। এত কড়া রোদের মধ্যেও ফুটপাথের হকাররা জমিয়ে ব্যবসা করছে। মধ্যাহ্নের দারুণ অগ্নিবাণে বিদ্ধ হতে হতে লোকে অকাতরে চিনে খেলনা, জাপানি ছাতা, হাওড়ার হাটের জামাকাপড়, চটি-জুতো, প্লাস্টিকের মগ-বালতি, ইত্যাদি কিনে যাচ্ছে। মূলত হকার এবং তাদের খরিদ্দারদের ভিড়েই রাস্তায় এত জ্যাম।

'এই হকারদের সরাবার ব্যাপারে তোরা কিছু করতে পারিস না?" কথাটা বলেই আদিত্যর মনে হল প্রশ্নটা নেহাতই বালখিল্য হয়ে গেছে।

'আমাদের দেশে পলিটিক্স বলে একটা বস্তু আছে তুই জানিস না? হকারদের গায়ে হাত দেওয়া যায় নাকি?' গৌতমের গলায় তিক্ততা ছিল।

কিছুক্ষণ হল পার্ক স্ট্রিটের ট্র্যাফিক পুবমুখো। গাড়ি বাঁদিকে বেঁকে পার্ক স্ট্রিটে ঢুকে পড়েছে। রাস্তাটার সেই পুরোনো মনোপলি আর নেই। আজকাল শহরের দক্ষিণ ও পুবদিকে বেশ কিছু নতুন ভোজনালয় হয়েছে যারা পার্ক স্ট্রিটের পুরোনো রেস্টোরেন্টগুলোর সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। কিছু দূর যাবার পর কুইজিনস-কে বাঁ দিকে দেখা গেল ।

'আমি একটা বিয়ার খাব।' গৌতম মেনুর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বলল । 'তুই ?'

'আমিও বিয়ার খাব ।

আদিত্যরা এক কোণে গুছিয়ে বসেছে। জানলা দিয়ে পার্ক স্ট্রিটের বহমান জনস্রোত দেখা যায়।

আরও মিনিট কয়েক পরে বিয়ারের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল, 'এবার বল আমাকে কী কারণে দরকার।'

'হ্যাঁ, সেটা একটু ভাল করে গুছিয়ে বলছি। কিছুদিন আগে তুই আমাকে বললি কেয়ার চেনা একটি টিন-এজার ছেলে ড্রাগ ওভারডোজ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে । তুই তাকে দেখতে যেতে চাস। ব্যবস্থা করে দিতে। নিশ্চয় তোর মনে আছে?'

আদিত্য ঘাড় নাড়ল।

'টিন-এজারদের এই ড্রাগ নেবার ব্যাপারটা ইদানীং ভীষণ বেড়ে গেছে।' গৌতম বলতে লাগল। 'পুরোটা ভাল করে বলতে গেলে অন্তত পনের বছর আগে থেকে শুরু করতে হবে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তখন ড্রাগ পেডলিং ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু ড্রাগ পেডলিং নয়, তার সঙ্গে খুন, গ্যাং ওয়ার। রোজ রাত্তিরে ঝামেলা লেগে থাকত। কলকাতা এবং মফস্বল শহরগুলোর কিছু অঞ্চল ক্রমশই অবাসযোগ্য হয়ে উঠছিল। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও পুলিশ কিছু করতে পারছিল না।

'মূলত দুটো গ্যাং ড্রাগ পেডলিং করত। এবং তাদের মধ্যে মারাত্মক রাইভ্যালরি ছিল। সেই রাইভ্যালরি থেকেই নিয়মিত মারামারি, খুন জখম। একটা ছিল ইসমাইলের গ্যাং। এটা পুরোনো গ্যাং। আগে বিহার-ইউ পি অঞ্চলে অপারেট করত। ওদিক থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। অন্য গ্যাংটা বেশ নতুন । চালাত দুবে বলে কোনও এক ব্যক্তি। তার সম্বন্ধে পুলিশ প্রায় কোনও কিছুই জানতে পারেনি । শুধু এটুকু জানা গিয়েছিল যে দুবের বয়েস বেশি নয়।'

'আর ইউ রেডি টু অর্ডার?' পরিচারিকা টেবিলে এসে দাঁড়িয়েছে। দুটো মেনু কার্ড সে আগেই দিয়ে গিয়েছিল।

'আমি রিসোতো খাব।' গৌতম বলল।

‘আমি র‍্যাভিওলি খাই?' আদিত্য মেনুর দিকে তাকিয়ে ভেবেচিন্তে জানাল। ‘এনি মীট অর ফিশ ডিশ টু অর্ডার স্যার?'

‘রিভিউটাতে লিখেছিল, এরা ভাল খরগোসের মাংস করে।' গৌতম পরিচারিকার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ডু ইউ সার্ভ র‍্যাবিট?'

‘ইয়েস স্যার। ইউ মে ট্রাই আওয়ার র‍্যাবিট ক্যাকিতোরি।'

‘এই ডিসটাই তো রিভিউতে রেকমেন্ড করেছিল রে।' গৌতম উল্লসিত হয়ে বলল। ‘ডু ইউ থিংক ওয়ান অর্ডার কেন বি শেয়ার্ড বাই দ্য টু অফ আস?'

‘ইজিলি স্যার। উইথ দি রিসোতো অ্যান্ড র‍্যাভিওলি ইট উইল বি এনাফ। এনি দোলচে? সুইট ডিস?

‘উই উইল অর্ডার দ্যাট লেটার।'

পরিচারিকা মেনু কার্ড ফেরত নিয়ে চলে গেল। আদিত্য বলল, “তারপর?” ‘তারপর হঠাৎ পুলিশ একটা মেজর লিড পেয়ে গেল অ্যাবাউট দুবে গ্যাং। লিডটা এল ইসমাইলের দলের একজনের থেকে। লোকটা আগে দুবের দলে কাজ করত, পরে ইসমাইলের দলে চলে আসে। চলে এসে, দুবের দলের বেশ কিছু খবর, বিশেষ করে তাদের প্রোকিওরমেন্ট এবং ডিসট্রিবিউশান চ্যানেলগুলো সম্বন্ধে বেশ কিছু ইনফরমেশান পুলিশকে জানিয়ে দেয়। পরে অবশ্য দুবের লোকেদের হাতে লোকটি খুন হয়। কিন্তু ততদিনে পুলিশ যা জানার জেনে ফেলেছে। টু কাট আ লং স্টোরি শর্ট, দুবের দলটা তাদের সমস্ত নেটওয়ার্ক সুদ্ধু ওয়াজ কমপ্লিটলি ডেসট্রয়েড। এই সাকসেস-এর ফলে পুলিশ নিশ্চয় একটা বুস্ট পেয়ে গিয়েছিল, কারণ দুবের দলটা ভেঙে যাবার কিছুদিন পরে পুলিশ ইসমাইলের দলের কয়েকজন চাঁইকেও ধরে ফেলে। ইসমাইল নিজে আবার বিহার-ইউপির দিকে পালিয়ে যায়। পরে সে ওদিকেই আবার ব্যবসা শুরু করে। মোট কথা, এর পরের বছর দু'তিন কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য গণ্ডগোলের জায়গাগুলোতে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করেছিল। আর একটা বিয়ার খাবি?'

‘পুরো একটা খেতে ইচ্ছে করছে না। একটা নিয়ে শেয়ার করা যাক।' ‘সেটাই ভাল।' গৌতম হাত নেড়ে ওয়েটারকে ডাকল।

গেলাশে বিয়ার ঢালার একটা কায়দা আছে। গেলাশের ওপর দিকের দেয়ালে একটু একটু করে ঢালতে হয়। না হলে ফেনা উপচে পড়ে। আদিত্য মুগ্ধ হয়ে দেখছিল কী অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ওয়েটার বিয়ার ঢালছে। প্রত্যেক পেশাতেই তার নিজস্ব কিছু দক্ষতা লাগে।

বিয়ারের গেলাশে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে গৌতম আবার বলতে লাগল ।

‘দুর্ভাগ্যবশত, গত ছ’সাত বছরে আবার একটু একটু করে কলকাতা এবং মফস্বল শহরগুলোতে ড্রাগ পেডেলিং বাড়তে শুরু করেছে। পুলিশ প্রথমে বুঝতেই পারেনি ইসমাইলের দলটাই আবার ফিরে এসেছে, নাকি দুবে আবার নতুন দল নিয়ে আবির্ভূত হল, নাকি এটা সম্পূর্ণ নতুন তৃতীয় কোনও দল। আস্তে আস্তে জানা গেছে দুবেই আবার নতুন দল নিয়ে ফিরে এসেছে। ইসমাইলও ফিরে এসেছে, কিন্তু বাজারের কর্তৃত্ব দুবেরই হাতে। হাসপাতালগুলোর রেকর্ড থেকে বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন বয়সের মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে অল্পবয়সীদের মধ্যে, ড্রাগের ব্যবহার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। কিন্তু কীভাবে সেই ড্রাগ তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে, অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ সেটা বার করতে পারছে না।'

‘তার মানে গ্যাং একাধিক?' আদিত্য একটা চিনেবাদাম মুখে দিয়ে প্রশ্ন করল। 'হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আমাদের ইনফর্মাররা বলছে মেন গ্যাং একটাই। সেটাই দুবের গ্যাং। গত পাঁচ-সাত বছর এই দলটাই সারা রাজ্যে ড্রাগ পেডলিং-এর বাজারটা কনট্রোল করছে। কিন্তু পেরিফেরিতে আরও দু'চারজন আছে যারা বাজারে ঢুকতে চাইছে। তার মধ্যে ইসমাইলের দলটা সব থেকে বড়। খুচরো আরও দু'একটা আছে । ফলে কনফ্লিক্ট বাধছে। খুন-টুনও হচ্ছে মাঝে মাঝে। গত পাঁচ বছরে আমাদের কয়েকজন ইনফর্মারও খুন হয়েছে।

বস্তুত, যে দলটা বাজারের সিংহভাগ দখল করে বসে আছে, তারা অত্যন্ত সাবধানী। আমাদের ইনফর্মেশন, কোনও একটা ভাইটাল খবর যাতে বাইরে না বেরিয়ে যায় তার জন্য এরা নিজেদের দলের কয়েকজনকেও মেরে ফেলেছে। কিন্তু কী সেই ভাইটাল খবর আমরা জানি না। তবে আন্দাজ করা যায় এটা ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত কোনও তথ্য।'

গৌতম থামল। বিয়ারের গেলাশে চুমুক দিল। আদিত্য চুপ করে আছে। ভাবছে। ভাবতে ভাবতে বলল, "তা আমি এর মধ্যে আসছি কোথায় ? '

'আমরা তোর সাহায্য চাইছি। আমাদের খবর নদীয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের যে বর্ডার সেখান দিয়ে ড্রাগটা দেশে ঢুকছে। একবার নদীয়া গিয়ে দেখবি? নদীয়া জেলার একেবারে উপরের টিপটাতে। ওই করিমপুর অঞ্চলে। ওখানে মধুবনা, সাহেবরামপুর, জলঙ্গী, এর কোনও একটা জায়গায়, আমাদের বিশ্বাস, ড্রাগটা প্রসেস করার জন্য ওই গ্যাংটার একটা লুকোনো কারখানা আছে। তোর সঙ্গে সুভদ্রকে দেব। তাতে তোর কাজ করতে সুবিধে হবে। যাবি?"

আদিত্য এখনও ভাবছে। তাকে নিশ্চুপ দেখে গৌতম বলল, 'আর একটা দরকারি কথা। এক ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলে কিছুদিন আগে ড্রাগ ওভারডোজে মারা গেছে। পশ্চিমবঙ্গে ড্রাগ পেডলিং বন্ধ করার জন্য একটা মোটা টাকা উনি দান করেছেন। একটা কমিটি হয়েছে যার চেয়ারম্যান আমার মেন্টার, দাদা-স্থানীয়, একজন রিটায়ার্ড পুলিশ কমিশানার। এই কমিটি ঠিক করবে টাকাটা কীভাবে খরচ হবে। চেয়ারম্যান আমার ওপর ভার দিয়েছেন একজন ভাল প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটারকে নিয়োগ করতে যিনি পুলিশের সঙ্গে কাজ করবেন। এই কাজের জন্য তোর থেকে যোগ্য আর কে আছে? কমিটির ফান্ড থেকে তোর প্রফেশানাল ফী-টা অনায়াসে দেওয়া যাবে। অতএব তোকে বিনি পয়সায় কাজ করতে হবে না।'

'গৌতম, আমি টাকা নিয়ে ভাবছি না রে। যদিও সংসার চালানোর জন্যে টাকা আমার সর্বদাই দরকার। খুব বেশি ক্লায়েন্ট পাই না তো। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি। তুই আমাকে অশনি রায়ের যে কেসটা নিতে বললি, যেটার জন্যে অশনির বাবার কাছ থেকে আমি টাকা নিয়েছি, সেটার কী হবে? একটা কাজ করতে করতে আরেকটা কাজ ধরলে দুটোই পণ্ড হয়ে যাবার সম্ভাবনা।'

'ঠিক উলটো। শুধু একটা কাজ নিয়ে চিন্তা করতে থাকলে অনেক সময় চিন্তাটা আটকে যায়। নতুন রাস্তা দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে একটা ডাইভারশানের পর, কিছুদিন চিন্তাটা অন্যদিকে চালনা করার পর, আবার পুরোনো কাজে ফিরে এসে দেখা যায় অনেক নতুন সম্ভাবনার কথা মাথায় আসছে। কথাগুলো আমার নয়। কোনও এক বিখ্যাত ফিজিসিস্টের কথা। কোন ফিজিসিস্ট মনে পড়ছে না।'

—তুই আমাকে কাজটা দিলে সেটা স্বজনপোষণ হবে না?'

'মোটেই হবে না। তোর যা ট্র্যাক রেকর্ড তাতে অনায়াসে প্রমাণ করা যাবে এই কাজটার জন্য তোর থেকে যোগ্য কলকাতায় আর কেউ নেই।'

খাবার এসে গেছে। গৌতম বলল, "এখন তর্কাতর্কি বন্ধ করে খাবারে মন দেওয়া যাক।'

(8)

গৌতম আদিত্যকে বিবাদী-র মোড়ে নামিয়ে দিয়েছিল। আদিত্যই নামিয়ে দিতে বলেছিল। সোমনাথ বাগ যে সরকারি কম্পানিতে কাজ করে সেটা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের পাশে, একটা বহুতলের পাঁচতলায়। কী বলা যায় লোকটাকে? আদিত্য হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে, কিন্তু তখনও ঠিক করতে পারেনি লোকটাকে কী বলবে।

অফিসে ঢোকার মুখে ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি। আদিত্য লোকটাকে বলল, 'সোমনাথ বাগ এসেছে?' বলেই ভাবল লোকটা নিজেই সোমনাথ বাগ নয় তো? আদিত্যর ভাগ্য ভাল, লোকটা সোমনাথ বাগ নয়। সে বলল, "সোমনাথ? ও তো ক্যান্টিনে ভাত খাচ্ছে।'

'ক'টা অব্দি ওর ডিউটি?'

'ওর আড়াইটেতে ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। ডিউটি শেষ করে এইমাত্র খেতে ঢুকল।'

'আপনাদের কত ঘন্টার ডিউটি?'

'আট ঘন্টার। তবে সপ্তাহে রোজ। মাসে দু'দিন ছুটি। সোমনাথকে ডাকব?' আদিত্য আন্দাজ করল, সোমনাথ বাগ মফস্বল থেকে ট্রেন বা বাস ধরে কলকাতায় ডিউটিতে আসে। ডিউটি শেষ করে আপিসের ক্যান্টিনে ভাত খায়। তারপর আবার ট্রেন কিংবা বাস ধরে বাড়ি ফেরে।

'না, না। ডাকতে হবে না। এখান দিয়েই তো বেরোবে। তখন কথা বলে নেব।' আদিত্য আপিস থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। সামনেই লিফট। লিফট পেরিয়ে একটা জানলা আছে। সেখান থেকে বিবাদীর জনস্রোত দেখা যায়। পাঁচতলা থেকে বেশ লাগে দেখতে। আদিত্য ব্যস্ত বিবাদী বাগের দৃশ্য দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল। সোমনাথ বাগ বেরিয়ে না যায়।

মিনিট পাঁচেক পরে আপিসের সদর দরজা দিয়ে মাঝবয়সী একটা লোক বেরিয়ে এল, তার পেছন পেছন সেই সিকিউরিটি যে আদিত্যর সঙ্গে কথা বলছিল।

'এই ভদ্রলোক তোর জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্যর দিকে আঙুল দেখিয়ে সিকিউরিটি বলল। সন্দেহ নেই অন্য লোকটা সোমনাথ বাগ।

'আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে?' সোমনাথের কপালে ভ্রুকুটি। 'আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।' আদিত্য এগিয়ে এসে খানিকটা কড়া গলায় বলল।

"আমার সঙ্গে কী দরকার?' সোমনাথ বাগের গলাটা একটু কেঁপে গেছে। তাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'নীচে চলুন, বলছি।' আদিত্য গলায় কড়া ভাবটা বজায় রেখেছে। 'বাঙ্গুর এভিনিউ-এর বাড়িটাতে যে খুন হয়েছিল, আবার সেই কেসটা আদালতে উঠছে। পুলিশ আবার আপনাকে ডাকতে পারে।' আদিত্য লিফট দিয়ে নামতে নামতে বলল।

'আপনি কি পুলিশ?'

'আমি পুলিশ নই, কিন্তু পুলিশের সঙ্গে কাজ করে থাকি।'

'বুঝলাম না। আপনি যদি পুলিশ না হন, তাহলে আপনি কে?'

'আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দা। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে আমার কোনও ঝগড়া নেই ।'

'আপনি যদি পুলিশ না হন তা হলে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলব না। আমি পুলিশ ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য নই।' সোমনাথ বাগ যেন হঠাৎ খুব সাহস পেয়ে গেছে।

লিফট গ্রাউন্ড ফ্লোরে পৌঁছেছে। লিফট থামতেই সোমনাথ বাগ দরজা খুলে হনহন করে হাঁটা লাগাল। তার নাগাল পেতে গিয়ে আদিত্যকে প্রায় ছুটতে হচ্ছে। 'সোমনাথবাবু আপনি যদি আজ কথা না বলে চলে যান, কাল আমি পুলিশের সঙ্গে আসব। তখন আপনাকে কথা বলতেই হবে। তার বদলে যদি আজ কথা বলেন তা হলে আপনার সময়ের দাম আমি মিটিয়ে দেব।' আদিত্যকে গলা তুলে কথা বলতে হচ্ছে। ভাগ্যিস আশেপাশে কেউ নেই।

সোমনাথ বাগকে বাগে আনতে আরও খানিকটা সময় ব্যয় হল। তার ওপর অর্থব্যয়। পাঁচ হাজার টাকায় রফা হয়েছে সোমনাথ এখনই আদিত্যর অফিসে গিয়ে আদিত্যর প্রশ্নের উত্তর দেবে। টাকাটা অবশ্য অশনি রায়ের বাবাকে বিল করে দেওয়া হবে।

'আমি আপনাকে কয়েকটা জিনিস জিজ্ঞেস করব। আপনাকে ঠিকঠিক উত্তর দিতে হবে।' মিনিট পঁচিশ পরে আপিসে নিজের চেয়ারে থিতু হয়ে বসে আদিত্য বলল। 'মিথ্যে বললে আমি কিন্তু ধরে ফেলব। তখন আপনি এক পয়সাও পাবেন না।'

উল্টোদিকে সোমনাথ বাগ জড়সড় হয়ে বসে আছে।

‘আমার প্রথম প্রশ্ন, তিন বছর আগে, যে সময় ওই খুনের ঘটনাটা ঘটে, কারা কারা তখন বাঙ্গুর এভিনিউ-এর ওই বাড়িটাতে থাকত?'

‘বাড়িটা তখনও পুরো তৈরি হয়নি। বাইরেটায় শুধু প্লাসটার, রঙ-টঙ নেই। ভেতরেও রঙ পুরো হয়নি। প্রাইমার লাগানো। সিঁড়িতে রেলিং বসেনি। অনেক ফ্ল্যাটের ভেতরের কাজও বাকি। এই অবস্থায় বাড়িতে কে থাকবে? তিনতলা অব্দি প্রায় ফাঁকা পড়ে ছিল। শুধু দোতলায় একঘর এসেছে। আর চারতলায় সেন বেকারির দুটো ফ্ল্যাটে লোক থাকত। ৪০১-এ পার্থ মিত্র আর তার ম্যাডাম। আর ৪০২-তে কখনও কখনও কম্পানির কেউ কেউ এসে থাকত। ওই অনেকটা কম্পানির গেস্ট হাউসের মতো । ৪০৩ ফ্ল্যাটটা আধা-তৈরি অবস্থায় ফাঁকা পড়েছিল।'

‘আপনি থাকতে থাকতেই কি ৪০২ আর ৪০৩ ফ্ল্যাট দুটো ৪০১-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়?'

‘আমি কম্পানি ছেড়ে দেবার কিছুদিন আগে এটা হয়েছিল।' ‘আচ্ছা, খুনটা যখন হয় তখন কি কেউ ৪০২ ফ্ল্যাটে ছিল?'

‘এই প্রশ্নটা পুলিশ আমাকে করেছিল। কোর্টও জিজ্ঞেস করেছিল। তাদের যা

বলেছি, আপনাকেও সেটাই বলছি। না, সেই সময় ৪০২ ফ্ল্যাটে কেউ ছিল না।'

‘খুন হবার আগে শেষ কবে ওই ফ্ল্যাটে লোক এসেছিল?’

‘আমার ঠিক মনে নেই। সপ্তাহ খানেক আগে বোধহয় কম্পানির দু'জন কর্মচারি এসে কয়েক দিন ৪০২ ফ্ল্যাটে ছিল।'

“তারা কবে চলে যায়?'

‘যতদূর মনে পড়ছে খুন হবার দিন দুয়েক আগে। এটা তিন দিন বা এক দিনও হতে পারে। জোর দিয়ে বলতে পারছি না।'

‘এবার অন্য একটা প্রশ্ন। আপনি কি ঘটনার দিনটা ছাড়া কখনও অশনি রায়কে দেখেছিলেন? মানে ধরুন দেখলেন, অশনি রায় রাত্তিরে মৃত্তিকা মিত্রকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন। কিংবা কখনও দেখলেন, বাড়ির সামনে থেকে ম্যাডামকে গাড়িতে তুলে নিচ্ছেন। অথবা ধরুন, ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন? এরকম কিছু দেখেছিলেন কখনও ? '

'না দেখিনি।'

‘কখনও দেখেননি? একটু ভাল করে ভেবে দেখুন।'

‘না, দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না...।'

আদিত্যর মনে হল সোমনাথ বাগ কিছু একটা বলতে গিয়েও বলছে না । ইতস্তত করছে।

‘শুনুন, আপনার মনের ভেতর যদি কিছু থাকে বলে দিন। যদি আপনি পুরো নিশ্চিত না হন তাও বলে দিন। ঠিক-ভুল আমি বিচার করব।'

‘ওই যে আপনি বললেন না স্যার, মিথ্যে বললে টাকা দেবেন না, তাই একেবারে নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলতে চাই না।'

‘ওটা আমার কথার কথা। ওটা ভুলে যান। আপনার টাকা আপনি অবশ্যই পাবেন । আপনি যেটা বলতে এত ইতস্তত করছেন সেটা মন খুলে বলুন।’

‘আমার মনে হয়, একবার যেন অশনি রায়ের মতো দেখতে একজনকে মৃত্তিকা ম্যাডামের সঙ্গে দেখেছিলাম। ওই ফ্ল্যাটে নয়। অন্য জায়গায়। পার্ক স্ট্রিট এরিয়ায়। দুপুরবেলা। যেন দেখলাম, দু'জনে এক সঙ্গে হাঁটছেন। তবে এটা নিশ্চয় আমার মনের ভুল। অশনি স্যার মৃত্তিকা ম্যাডামের সঙ্গে কী করবেন?’

‘এটা কি আপনি পুলিশকে বলেছিলেন?'

‘না, না। পুলিশকে কিচ্ছু বলিনি। কারণ আমি নিজেই নিশ্চিত ছিলাম না যেটা মনে হচ্ছে সেটা ঠিক কিনা।'

‘আচ্ছা, মৃত্তিকা মিত্রর স্বামী পার্থ মিত্র কি মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে যেতেন?' ‘হ্যাঁ, মাসে দু'তিন বার। ট্যাক্সি ডেকে সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে যেতেন, মনে হয় ইস্টেশনে যেতেন। আবার পাঁচ-ছ'দিন পরে ট্যাক্সি করে ফিরে আসতেন।'

‘স্টেশনে যেতেন কী করে জানলেন?'

‘দু’একবার শুনেছিলাম ট্যাক্সিওলাকে ইস্টেশন যেতে বলছেন।'

‘ম্যাডাম কি কখনও ওঁর সঙ্গে যেতেন?'

‘সাধারণত যেতেন না। খুব কালেভদ্রে দু'একবার ম্যাডামকেও ওঁর সঙ্গে যেতে দেখেছি।'

‘পার্থ মিত্র যখন বাইরে যেতেন তখন কি ম্যাডাম একাই বাড়িতে থাকতেন?' ‘হ্যাঁ, একাই তো থাকতেন।'

‘কখনও মনে হয়েছে ম্যাডামের স্বামী যখন বাইরে তখন ম্যাডাম বাইরে রাত কাটিয়ে সকালে বাড়ি ফিরছেন?'

‘না, না। এরকম আমার কখনও মনে হয়নি।'

‘এবার অন্য একটা প্রশ্ন। ঘটনার রাত্তিরে অশনি রায় কখন ওই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন?' ‘বেশ রাত্তিরে স্যার। ক'টা ঠিক বলতে পারব না। সাড়ে এগারোটা, বারোটা হবে।' ‘এসে কী বললেন ?

‘উনি সোজা লিফটের দিকে চলে যাচ্ছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবেন? উনি বললেন, মৃত্তিকা মিত্রর ফ্ল্যাটে যাব।

‘মৃত্তিকা মিত্রর ফ্ল্যাটে যাব বললেন? নাকি অন্য কিছু বললেন? খুব ভাল করে ভেবে বলুন।'

‘না, না। উনি বললেন, ৪০১ নম্বর ফ্ল্যাটে যাব। আমি বললাম, কার কাছে যাবেন? উনি বললেন, ৪০১-এর ম্যাডামের কাছে যাব। আমি বললাম, এত রাত্তিরে আপনি ম্যাডামের ফ্ল্যাটে যাবেন, ম্যাডাম জানেন? উনি বললেন, ম্যাডামই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বলে লিফট ডাকার বোতাম টিপে দিলেন। আমার উচিত ছিল ওঁর সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া, গিয়ে দেখা উনি কোথায় যাচ্ছেন, ম্যাডাম ওঁকে সত্যিই ডেকেছেন কিনা। কিন্তু গেট ছেড়ে আমি যেতে পারছিলাম না। প্রচুর বিল্ডিং মেটিরিয়াল চারদিকে ছড়িয়ে ছিল, বাড়িটা তো তখনও তৈরি হচ্ছে, তাই গেট ছেড়ে আমি যেতে পারলাম না। উনি একাই উঠে গেলেন।'

‘অশনিকে কি খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল?'

“ঠিক উত্তেজিত নয় স্যার, কেমন যেন নার্ভাস দেখাচ্ছিল।'

‘নার্ভাস?’

হ্যাঁ স্যার। আমি দেখেছিলাম, ওঁর হাত কাঁপছে।'

‘কতক্ষণ পরে উনি নেমে এলেন?”

‘ঘন্টা খানেক হবে। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল উনি যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন।'

‘এবার শেষ প্রশ্ন। আপনি কি জানতেন ফ্ল্যাটের পেছনে একটা সিসি ক্যামেরা আছে? মানে, যে ক্যামেরায় দেখা গিয়েছিল একটা লোক পাঁচিল টপকে পালিয়ে যাচ্ছে? আপনি জানতেন ওই ক্যামেরাটার কথা?'

‘জানতাম। ক্যামেরাটা সব সময় চালানোই থাকত তবে মাঝে মাঝে ওটা খারাপ হয়ে যেত। তখন কোনও ছবি পাওয়া যেত না। আবার নিজের থেকে ঠিকও হয়ে যেত। ঘটনার রাত্তিরে ওটা চালানো ছিল নিশ্চয় কিন্তু আসলে ওটা কাজ করছিল কিনা বলতে পারব না। পুলিশকে আমি বলে ছিলাম ক্যামেরাটার কথা। কিন্তু ওটার কোনও ছবি পুলিশ প্রথমে পায়নি। শুনলাম পরে পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমে কেন পাওয়া যায়নি, পরে কী করে পাওয়া গেল, আমি কিছুই জানি না। শুধু জানি, কয়েক বছর পরে ক্যামেরাটা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তখন ওটা সরিয়ে নেওয়া হয়। নতুন ক্যামেরা বোধহয় আর বসানো হয়নি।'

‘অনেক ধন্যবাদ, সোমনাথবাবু। আর আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। আপনাকে একটু আমার সঙ্গে এই মোড় অব্দি যেতে হবে। ওখানে একটা এটিএম আছে। সেখান থেকে টাকা তুলে আপনাকে দেব। পাঁচ

হাজার টাকা ক্যাশ আমার সঙ্গে নেই।'

বাড়ি ফেরার পথে আদিত্য ভাবছিল সোমনাথ অনেকগুলো দরকারি তথ্য দিয়েছে। তবে তার সব কটা অশনি রায়ের পক্ষে যাবে কিনা সন্দেহ।

বাড়িতে ঢোকার আগে আদিত্য রাস্তা থেকে দেখল ঘরে আলো জ্বলছে। কেয়া কি তা হলে ফিরে এসেছে? এত তাড়াতাড়ি ফেরার তো কথা নয়! আজ ন'টা অব্দি কেয়ার কোচিং ক্লাশ থাকার কথা। শরীর খারাপ হল নাকি? ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়ে আদিত্য চাবি ঘুরিয়ে বসার ঘরে ঢুকল। কেয়া মাথা নিচু করে বসে আছে।

'কী হল? তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?' আদিত্যর গলায় উদ্বেগ।

কেয়া মুখ তুলল। মুখে ক্লান্তির ছাপ।

'একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়েছে। অমলাদির ছেলে জয় মারা গেছে।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য আদিত্য বুঝতে পারছিল না। তারপর মনে পড়ল। 'দুপুরে স্কুলে অমলাদির কাছে ফোন এসেছিল। ওর ছেলে আবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কোনও এক পড়শি ফোন করেছিল।'

'কোথায় ছিল ছেলেটা? নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেয়েছিল?'

'এক সপ্তাহ আগে ছাড়া পেয়েছিল। এই ক'দিন কাজে যায়নি। বাড়িতেই ছিল।'

"তারপর?"

'আমরা কয়েকজন অমলাদির সঙ্গে ওর বাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখি, ছেলেটার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে। ছেলেটাকে নিয়ে সকলে গেলাম সেই পার্ক সার্কাসের নার্সিং হোমে। তারা তো পুলিশের পারমিশন ছাড়া কিছুতেই ভর্তি করবে না। যাই হোক অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত ভর্তি করা গেল। কিছুক্ষণ জমে-মানুষে টানাটানি চলল। তারপর সব শেষ। ডাক্তার বলছে ছেলেটা আবার ড্রাগ নিয়েছিল। একটু বেশি মাত্রায় নিয়েছিল। আর সামলাতে পারেনি।'

'কিন্তু বাড়িতে ড্রাগ পেল কোথায়?'

'সেটাই তো সব থেকে বড় রহস্য। অমলাদি হলফ করে বলছে ছেলেটা যে ঘরে ছিল সেখানে ড্রাগ লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সত্যি, আমরাও দেখলাম ঘরে শুধু একটা তক্তোপোষ ছাড়া আর কিছু নেই। ঘরের দরজাটাও অমলাদি বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে এসেছিল।'

'তাহলে পড়শিরা জানল কী করে ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে?'

'ঘরের একটা জানলা খোলা ছিল। সেই জানলা দিয়ে পড়শিদের কেউ দ্যাখে জয় মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছে। তখন সে অমলাদিকে খবর দেয়।'

'ওই জানলা দিয়ে ড্রাগটা আসেনি তো?'

'অমলাদি বলছে সেটা অসম্ভব। অমলাদিদের বাড়িটা তিনতলায়। তিনতলার জানলা দিয়ে ড্রাগটা পৌঁছবে কী করে?'

'পড়শিরা কেউ পৌঁছে দেয়নি তো?'

'অমলাদি বলছে সেটা আরও অসম্ভব। পড়শি বলতে একজন বৃদ্ধ আর একজন বৃদ্ধা। তারা জয়কে জন্মাতে দেখেছে। অমলাদির মতোই তারা জয়কে ভালবাসত।' 'আমি একবার ওই ঘরটা দেখতে চাই। আজ আর হবে না। কাল সকালে যাব । কড়েয়া থানাকে বলছি আমি যাওয়া অব্দি ঘরটা যেন সিল করে রাখে।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১)

সকাল থেকে মাথার ভেতর ভৈরবী ঘুরছে। নিশ্চয় সেদিন রসলুন বাই শোনার ফল। আদিত্য কফির কাপ টেবিলে রেখে ল্যাপটপে বিসমিল্লার ভৈরবী লাগাল । বিসমিল্লা খান সুর লাগানোর মিনিট খানেকের মধ্যে আদিত্যর চোখে জল। তিন-চার মিনিটের মাথায় চোখের জল গালে নেমেছে। কেয়া দেখতে পেলে লজ্জার ব্যাপার হতো। ভাগ্যিস কেয়া এখনও ওঠেনি। আদিত্য ভাবছে, এত সুর পেল কোথায় লোকটা ? ভাবছে, এত দুঃখ কোথায় জমা হয়ে ছিল? আরও ভাবছে, বিয়ের দিন সকালে সানাইতে ভৈরবী বাজায় কেন? দুঃখ কীসের? নিশ্চয় মেয়ে বাপের বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে, সেই দুঃখ। বাবুল মোরা নৈহারে ছুটো হি যায়, ভৈরবীর সেই গানটা যেমন। তারপর কী আশ্চর্য সানাই যখন দ্রুত গতে পৌঁছোয়, বিসমিল্লা যেমন এইমাত্র পৌঁছলেন, ততক্ষণে মেজাজ পালটে গেছে। এবার আনন্দের সুর। নতুন জীবনের আনন্দ? আদিত্যর অন্তত এইরকম করে ভাবতে ভাল লাগে। পণ্ডিতেরা কেমন করে

ভাবে কে জানে ?

আটটা নাগাদ কেয়া উঠে ঘুম চোখে চায়ের জল বসাল। আদিত্য ততক্ষণে চান-টান করে বেরোবার জন্যে তৈরি।

'এত সকালে কোথায় যাচ্ছ? ব্রেকফাস্ট খাবে না?' কেয়া একটু অবাক হয়েছে। আদিত্য এত সকালে সচরাচর বেরোয় না।

'যাচ্ছি অমলা তরফদারের বাড়ি। লোকাল পুলিশের সঙ্গে। সুভদ্রও যাচ্ছে। জয় তরফদারের ঘরটা ভাল করে দেখতে হবে। কীভাবে ড্রাগটা ড্রাগ-ইউজারের কাছে পৌঁছচ্ছে পুলিশ কিছুতেই বুঝতে পারছে না। শুধু জয় তরফদারের ক্ষেত্রে নয়, আরও অনেকগুলো ক্ষেত্রে।

'কখন ফিরবে?'

'বলা মুস্কিল কখন ফিরব। বেশি দেরি হয়ে গেলে সোজা আপিসে চলে যাব। তুমি চিন্তা কোরো না ।'

'ব্রেকফাস্ট খাবে কোথায়? একটু বোসো। আমি ওটস আর ডিমসেদ্ধ করে দিচ্ছি। দু'মিনিটে হয়ে যাবে।'

দু'মিনিটে হয়ত হবে না। কিন্তু কুড়ি মিনিট লাগলেও কেয়া একবার যখন বলেছে তখন ব্রেকফাস্ট না খাইয়ে ছাড়বে না। ভালই হল। বাড়িতে ব্রেকফাস্ট খেয়ে না বেরোলে বাইরে সিঙাড়া-কচুরি খেতে হতো। ওগুলো আজকাল আর সহ্য হচ্ছে না। হাতে কিছুটা সময় আছে। সুভদ্র মাজি আধঘন্টার আগে আসছে না। আদিত্য ইউ টিউবে আর একটা গান লাগাল। সামন্ত সারং। সত্তর দশকের শেষ দিকে নিভৃতিবুয়া সরনায়েকের গাওয়া।

ওয়েস্ট রেঞ্জ রাস্তাটা বেকবাগান অঞ্চলে। দৈর্ঘ্য বেশি নয়। তার মধ্যেই নানা ধর্মের বাস। খ্রীস্টান, মুসলমান, হিন্দু। দু'এক ঘর শিখও আছে। ধর্মবৈচিত্র্যের মতো শ্রেণিবৈচিত্র্যও চোখে পড়ার মতো। পুরোনো মোটর গ্যারেজের গা ঘেঁসে নতুন গাড়ির শো রুম। হাল ফ্যাশানের অভ্রভেদী, তার পাশে ষাট-সত্তর বছরের ভেঙে-পড়া এজমালি বাসাবাড়ি। অমলা তরফদারের বাস এইরকমই একটা এজমালি বাড়ির তিনতলায় ।

বাড়ির সামনে কয়েকজন যুবক গুলতানি করছে। দোরগোড়ায় পুলিশের জিপ দাঁড়াতে দেখেও এদের তেমন হেলদোল দেখা গেল না। হাবভাব দেখে মনে হয় এখানে মাঝে মাঝেই পুলিশ আসে। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই নোংরা একসার সিঁড়ি পাঁচতলা অব্দি উঠে গেছে। সিঁড়ির দেয়ালে পলেস্তারা খসে গিয়েছে,

কোণে মাকড়সার জাল। প্রত্যেক তলায় অন্তত চারটে পাঁচটা করে পরিবারের বাস। বারোয়ারি বারান্দা। বারান্দায় বালতি, ঝ্যাঁটা, জুতোর র‍্যাক। জামাকাপড় শুকোচ্ছে। জরাজীর্ণ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দম্পতী রঙ-চটা বেতের চেয়ারে বসে খবর কাগজ পড়ছে। তার পাশে মাঝবয়সী মুসলমান গৃহবধূ মেঝেতে সেমাই শুকোতে দিচ্ছে। পুলিশ দেখে সকলেই একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার নিজেদের কাজে মন দিল।

'একটা ভাল ব্যাপার দাদা, পুলিশ নিয়ে এদের কোনও কৌতুহল নেই। না হলে ক্রাউড সামলাতেই অর্ধেক এনার্জি চলে যেত।' সুভদ্র সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বলল।

আদিত্য অন্য কথা ভাবছিল। বলল, 'আচ্ছা, সেদিন আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসে তুমি যে বললে কী একটা ব্যাপারে আমার সাহায্য চাও, ব্যাপারটা পরে খুলে বলবে, সেটা কি এই ড্রাগ পেডলিং-এর ব্যাপার? যেটার কথা গৌতম বলল?'

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটাই। দাশগুপ্ত সাহেব আমাকে এক্সক্লুসিভলি এই কাজটার ভার দিয়েছেন। অন্য সব কাজ থেকে আমি কিছুদিনের জন্য রেহাই পেয়েছি। কাজটার ভার দিয়ে দাশগুপ্ত সাহেব বলেছিলেন উনি চেষ্টা করছেন আপনাকেও যাতে এই ব্যাপারটায় ইনভলভ করা যায়। আপনাকে দাশগুপ্ত সাহেব তো কেসটা নিয়ে মোটামুটি ব্রিফ করে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ব্যাপারটা মোটামুটি জেনেছি। আরও কিছু জানার থাকলে পরে তোমার কাছ থেকে জেনে নেব।'

কথা বলতে বলতে আদিত্যরা দু'জন তিনতলায় পৌঁছে গিয়েছিল। অমলা তরফদারের বাসা চিনতে অসুবিধে হল না। সদর দরজার সামনে করেয়া থানার মেজবাবু শশীধর মিশ্র দুজন কনসটেবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্যদের দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'বড়বাবু একটা কাজে আটকে পড়েছেন। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, সেদিন যখন এই ছেলেটা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, আপনিই তো কেসটা ইনভেসটিগেট করেছিলেন। আপনি ব্যাপারটা জানেন। আপনিই যান।'

আদিত্য বুঝতে পারল না বড়বাবুর কাজ আছে বলে শশীধরকে পাঠানো হল, নাকি শশীধর ব্যাপারটা খানিকটা জানে বলে।

সদর দরজাটা ভেজানো ছিল। দরজা ঠেলে প্রথমে শশীধর ভেতরে ঢুকল, পেছন পেছন আদিত্য এবং সুভদ্র মাজি। কনসটেবল দু'জন বাইরে পাহারায় রয়েছে।

সামনের ঘরে দু'জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বসে আছে। একজন চেয়ারে, একজন তক্তোপোষের ওপর। চোখের দৃষ্টিতে সাড় নেই। পুলিশ দেখে দু'জনেই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। এরাই মনে হয় অমলা তরফদারের শ্বশুর-শাশুড়ি। ভেতরের একটা ঘর থেকে অমলা তরফদার বেরিয়ে এসেছে।

'ও বৌমা আমাদের খেতে দিলে না? সকাল থেকে চা-টাও তো দিলে না। সেই কখন থেকে মুখ ধুয়ে বসে আছি।' বৃদ্ধের গলায় অসহায়তা ঝরে পড়ছে। গতকাল বাড়িতে যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে সেটা এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কতটা বুঝতে পারছে সন্দেহ।

'আপনারা ভেতরে আসুন। আমার ছেলের ঘরটা দেখবেন তো?' অমলা তরফদারকে দেখে মনে হয় যেন একটা মরা মানুষ কথা বলছে।

ঘরটা তালাবন্ধ। শশীধর পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খুলল। ঘর বলা শক্ত। ছ'ফুট বাই ছ'ফুটের একটা কুঠুরি। একটা তক্তাপোষ ঘরের চোদ্দ আনা দখল করে আছে। বাকি দু'আনায় টেবিল-চেয়ার। টেবিলের ওপর একটা প্লেটে খাবারের ভুক্তাবশেষ। একটা আধখাওয়া পাঁউরুটি, খানিকটা ঘুগনি। একটা কাপের অর্ধেক ভর্তি চা। চায়ের ওপর সর পড়েছে। টেবিলের পেছন দিকে দেয়ালে হেলান দিয়ে দু'চারটে ইস্কুল-পাঠ্য বই সাজানো রয়েছে। জয় তরফদার যখন পড়াশোনা করত তখনকার স্মৃতি। চেয়ারে আধময়লা

জামা-প্যান্ট, গেঞ্জি-জাঙিয়া, বেশ ময়লা একটা রুমাল। একটা ছোট কাঁচি। একটা খুব ছোট চিমটে। চেয়ারটা বসার কাজে ব্যবহার হতো বলে মনে হয় না।

তক্তোপোষের পেছনে দেয়ালটার রঙ উঠে গেছে। আদিত্য আন্দাজ করল জয় তরফদার, চেয়ারে না বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে তক্তোপোষে বসত। মেসে থাকার সময় এই অভ্যাসটা আদিত্যরও ছিল।

'খাবার এবং চা ফরেনসিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।' সুভদ্র শশীধরকে বলল।

'স্যার।' শশীধর সসম্ভ্রমে বলল।

ঘরের সংলগ্ন একটা পায়রার খোপের মতো ছোট বাথরুম। নোংরা। অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে আদিত্য তার মধ্যে ঢুকল। পেছন পেছন সুভদৰ।

শশীধর বাইরে। সে মনে হয় আগেই একবার ভেতরটা দেখে নিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে বাথরুমটা থেকে বেরিয়ে এল আদিত্য। সঙ্গে সুভদ্র। বাথরুমে দরকারি কিছু নেই।

ঘরে ছোট একটা জানলা আছে। সেটা খোলা। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে পাশের বাড়ির খানিকটা দেখা যায়। আদিত্য জানলা দিয়ে উঁকি মারল। একটা খাবার টেবিল দেখা যাচ্ছে। এক বৃদ্ধ টেবিলে বসে আছে। চা খাচ্ছে। ঘরে আর কেউ নেই। এক বৃদ্ধা ঘরে ঢুকল। ম্যাক্সি পরা। মাথা প্রায় সাদা। টেবিলের ওপর কিছু একটা রাখল। মনে হচ্ছে হালুয়া জাতীয় কিছু। নিশ্চয় বৃদ্ধের প্রাতরাশ। আদিত্য জানলা থেকে সরে এল। একজন মানুষের দৈনন্দিন খাওয়ার ব্যাপারটা এতটাই ব্যক্তিগত যে সেখানে উঁকি মারতে ইচ্ছে করে না ।

'কনসটেবল দু'জনকে ডাকুন। ঘরটা ভাল করে সার্চ করতে হবে।' আদিত্য শুনতে পেল সুভদ্র শশীধরকে নির্দেশ দিচ্ছে।

কনসটেবল দু'জন ঘরে আসার পর সুভদ্র তাদের বলল, "খুব ভাল করে ঘরটা খুঁজে দেখুন কোথাও ড্রাগ পাওয়া যায় কিনা। শশীবাবু আপনিও ওদের একটু হেল্প করুন। আমিও করছি।'

এর পরের পনের কুড়ি মিনিট ঘর তোলপাড় করে খোঁজাখুঁজি চলল। তক্তোপোষের তোষক উলটে দেখা হল, টেবিলের বইপত্র সরিয়ে দেখা হল, টেবিল সরিয়ে দেখা হল, তক্তোপোষ সরিয়ে দেখা হল, চেয়ারের জিনিসপত্র নামিয়ে তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কোথাও ড্রাগের চিহ্ন নেই। সৌভাগ্যক্রমে ঘরটা ছোট। খুব বেশি খোঁজার জায়গা নেই ।

পুরো ব্যাপারটায় আদিত্য নীরব দর্শক।

পুলিশের দল যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, দেয়ালের একটা ফাটলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সুভদ্র হঠাৎ বলে উঠল, "ওই ফাটলটার ভেতরে দেখ তো, কিছু পাও কিনা।'

একজন কনসটেবল ফাটলটার ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দেখার চেষ্টা করল। ফাটলটা এতই ছোট যে একটা আঙুলও ঢোকে না।

আদিত্য বলল, 'চেয়ারের ওপর যে চিমটেটা ছিল ওটা ব্যবহার করে দেখতে পারেন।'

চিমটেটা ভেতরে ঢোকাতেই তার মুখে একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের প্যাকেট উঠে এল। চিনে দোকান থেকে খাবার আনলে যেরকম প্যাকেটে ভিনিগারে ভেজানো লঙ্কার কুচি দেয়, সেরকম প্যাকেট। সাইজে আর একটু বড়। প্যাকেটের মুখটা সযত্নে কাঁচি দিয়ে কাটা হয়েছে। তারপর একটা রবার ব্যান্ড জড়িয়ে প্যাকেটের কাটা মুখটা বন্ধ করা রয়েছে। কারণ প্যাকেটের ভেতরে বেশ কিছুটা সাদা গুঁড়ো এখনও অবশিষ্ট আছে।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে সুভদ্র বলল, 'হেরোইন। আমি এটা পরীক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছি।

মনে হচ্ছে যেটা আমরা খুঁজছিলাম সেটা পাওয়া গেছে।'

'আসল প্রশ্নটার কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না। এই বস্তুটা এখানে এল কী করে? অমলা তরফদার তো পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন বাইরের কেউ এই ঘরে ঢুকতো না। আর তিনি যখন স্কুলে যেতেন,

জয়কে ঘরে খাবার দিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে যেতেন। তিনি বলেছিলেন না, জয় হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসার পর থেকে এই ব্যবস্থাই চলছিল?' আদিত্য নিজের মনে বিড়বিড় করছে।

'হয়ত জিনিসটা আগে থেকেই এই ফাটলের মধ্যে মজুত করা ছিল।' সুভদ্র বলল। 'হতে পারে। হতেও পারে।' আদিত্যর গলা শুনে মনে হল সে এখনও অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

'আপনার অন্য কিছু মনে হচ্ছে?" সুভদ্র জিজ্ঞেস করল।

'দু'একটা ব্যাপারে বেশ খটকা লাগছে।' আদিত্য অন্যমনস্ক গলায় বলল। 'দ্যাখো, সপ্তাহ খানেক আগে জয় তরফদার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিল। তারপর থেকে সে এখানেই ছিল। ধরা যাক, এর মধ্যে বাইরে থেকে কোনও সাপ্লাই আসেনি। অর্থাৎ জয় হাসপাতালে যাবার আগে থেকেই প্যাকেটা ওখানে রাখা ছিল। প্যাকেটটার দিকে যদি তুমি তাকাও তাহলে বুঝবে ওটা প্রায় ভর্তি রয়েছে। অর্থাৎ ওটার থেকে একবারের বেশি শট নেওয়া হয়নি। কিন্তু তাহলে এটাও ধরে নিতে হবে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর কয়েকদিন জয় তরফদার ড্রাগ নেওয়া থেকে বিরত ছিল। হয়ত সে তার নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। তারপর শেষে আর থাকতে না পেরে সে লুকোনো জায়গা থেকে প্যাকেটটা বার করে ড্রাগটা নিয়ে ফেলে এবং অসুস্থ হয়ে মারা যায়। তুমি মোটামুটি এটাই বলতে চাইছ তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মোটামুটি এটাই।'

'এই রকম ঘটা অসম্ভব আমি বলছি না। কিন্তু আগের বার যেদিন জয় তরফদার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল তার পরের দিন আমি শশীধরের সঙ্গে এই বাড়িতে এসে জয়ের ঘরটা খুব ভাল করে সার্চ করেছিলাম। তক্তোপোষের তোষকের তলা থেকে এই রকম একটা রবার ব্যান্ড জড়ানো মুখ-খোলা হেরোইনের প্যাকেট পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি সেই সময় ওই ফাটলের মধ্যে কোনও ড্রাগের প্যাকেট লুকোনো ছিল না। তাহলে প্যাকেটটা ওখানে এল কী করে ? নিশ্চয় অমলা তরফদার ওখানে প্যাকেটটা লুকিয়ে রাখেনি?'

সুভদ্র মাজিকে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল। আদিত্য শশীধরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাশের বাড়িতে যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকেন তাদের সঙ্গে কথা বলব। আপনি একটু দেখবেন?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। একবার অবশ্য আমি কথা বলেছি।'

পাশের বাড়ির সদর দরজায় দুটো নাম লেখা। জন শান্তনু গোমস, মার্গারেট মৃদুলা গোমস। খ্রিষ্টান পরিবার সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালি কি? শশীধরকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যেত, কিন্তু তার দরকার হল না। জিজ্ঞেস করার আগেই অমলা তরফদারের জানলা দিয়ে দেখা সেই পাকা মাথার বৃদ্ধা দরজা খুলে দিয়েছেন। শশীধরকে দেখে তার ভুরু ঈষৎ কুঞ্চিত।

পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'আর একবার আসতে হল ম্যাডাম। লালবাজার থেকে এঁরা এসেছেন। একবার আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আমাদের যা বলার তো বলেই দিয়েছি। আমার স্বামীর শরীরটাও ভাল নেই।' বৃদ্ধা গলার বিরক্তিটা ঢাকার চেষ্টা করলেন না।

'আমরা খুব অল্প সময় নেব ম্যাডাম। আমি কথা দিচ্ছি, দশ মিনিটের বেশি আপনাদের বিরক্ত করব না।' আদিত্য ক্ষমা চাওয়ার গলায় বলল।

সেই বৃদ্ধ এখনও খাবার টেবিলেই বসে আছেন। সামনে খোলা খবরের কাগজ। কাছে একটা সোফায় সুভদ্র আর আদিত্য গিয়ে বসে পড়ল। শশীধর দাঁড়িয়ে আছে। মৃদুলা গোমেস খাবার টেবিলের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন ।

'জয় তরফদারকে তো আপনারা বড় হতে দেখেছেন, তাই না?' আদিত্য আলগোছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

কেউ উত্তর দিচ্ছেন না। হয়ত একজন ভাবছেন অন্যজন উত্তরটা দেবেন। 'জয়কে কি আপনারা ছোট থেকেই চিনতেন?' আদিত্য আর একবার প্রশ্নটা করল। এবার সরাসরি মৃদুলাকে।

'ক্লাশ সিক্স-সেভেন অব্দি বলতে গেলে জয় আমাদের বাড়িতেই থাকত। ওর বাবা খুব অল্প বয়সে মারা যায়। ছেলে মারা যাবার পরে জয়ের ঠাকুর্দা-ঠাকুমা প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। মাথাও ভাল কাজ করত না। জয়ের মা তো সেই সকালে স্কুলে বেরিয়ে যেত। স্কুলের পর আর একটা চাকরি করে বেশ রাত্তিরে ফিরত। জয়কে কে দেখবে? জয় স্কুলের পর আমাদের বাড়িতেই চলে আসত। রাত্তির অব্দি থাকত।'

'আমার বড় ছেলে প্যাট্রিক কুড়ি বছর আগে ক্যানাডা চলে গেছে। ছোট ছেলে বেঞ্জামিন অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিল। তারপর সেও ফ্যামিলি নিয়ে নিউজিল্যান্ড চলে গেল।' শান্তনু গোমেস এতক্ষণে মুখ খুলেছেন। 'আমরা ভীষণ একা হয়ে গেলাম। এই সময় জয় আমাদের বাড়িতে অনেকক্ষণ থাকতে শুরু করে। আমাদের খুব ভাল লাগত। ভীষণ ভাল লাগত। জয়কে আমরা যত ভালবাসতাম আমাদের নিজের নাতি-নাতনিদেরও ততটা বাসি না। জয় চলে যেতে আমরা শ্যাটার্ড হয়ে গেছি।'

'জয় যে বদলে গেল, খারাপ সঙ্গে পড়ল, এটা কবে থেকে?' সুভদ্র জিজ্ঞেস করল।

'জয় যখন নাইন-এ পড়ে তখন আমরা প্রায় এক বছর দেশে ছিলাম না। রিটায়ার করার পর দুই ছেলের কাছে ছ'মাস করে কাটিয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখি জয় একেবারে বদলে গেছে। স্বভাবটা রুক্ষ হয়ে গেছে। ডাকলেও আসতে চায় না। চেহারাটাও খারাপ হয়ে গেছে। এ যেন অন্য কোনও জয়। মনে হয়, আমরা যখন ছিলাম না, তখন জয়কে দেখার কেউ ছিল না। ওর নিজের ঠাকুর্দা-ঠাকুমা তো ভেজিটেবল হয়ে গেছিল। অমলাও বাড়ি থাকত না। জয় কুসঙ্গে পড়ল। ওই তখন থেকেই মনে হয় ও ড্রাগ নেওয়া শুরু করে।' শান্তনু গোমেস থামলেন।

'আগে ছেলেটা খেতে কী ভালবাসত। কত কী রান্না করে ওকে খাওয়াতাম। ইদানীং ডাকলেও আসত না। জানলা দিয়ে দেখতাম দুপুরবেলা ঘরে বসে রোজ একই খাবার খেয়ে যাচ্ছে। সেই পাঁউরুটি আর ঘুগনি। তাও বাড়িতে বানানো নয়। নিচের দোকান থেকে আনা। বাড়িতে রান্নার লোক নেই, অমলাও সকাল-সকাল বেরিয়ে যায়, কে রান্না করবে? একটা সময় ছেলেটা পাঁউরুটি খেতেই চাইত না। এখন দেখি রোজই ওই অখাদ্য খেয়ে যাচ্ছে। দেখে বুকটা ফেটে যায়। রাত্তিরে অবশ্য অমলা রান্না করে।' মৃদুলা গোমেসের স্বরে কান্না রয়েছে।

'আচ্ছা, আপনারা তো জানলা দিয়ে সারাদিনই জয়কে দেখতে পেতেন, ও কখন ড্রাগ নিচ্ছে বা ড্রাগটা আসছে কোথা থেকে, সেসব বুঝতে পারতেন?'

'না, কিছুই বুঝতাম না। দেখুন, সারাক্ষণ তো আর আমরা ওর ওপর নজর রাখতাম না। কোনও এক ফাঁকে আমাদের চোখ এড়িয়ে ড্রাগ নেওয়া শক্ত ছিল না। বিশেষ করে দুপুরে বা রাত্তিরে আমরা যখন ঘুমোচ্ছি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল, ড্রাগটা ও পেত কী করে? ওর মা তো ওর ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে রাখত।' মৃদুলা বললেন।

'ওকে খাবার দিত কে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'সকালে স্কুলে যাবার আগে অমলা ওকে ব্রেকফাস্ট দিয়ে যেত। রাত্তিরে ফিরে এসে ডিনার দিত।'

'আর দুপুরবেলা?'

'আমি যতদূর জানি, নিচের একটা চায়ের দোকান থেকে রুটি-ঘুগনি আসত । একটা ছেলে এসে ওটা দিয়ে যেত। পরে কাজের মাসি জয়ের ঘরের তালা খুলে খাবারটা ওর ঘরে পৌঁছে দিত। জয়ের ঠাকুর্দা-ঠাকুমা দুপুরে মুড়ি খেত।

'কাজের মাসির বা ওই চায়ের দোকানের ছেলেটার হাত দিয়ে কি ড্রাগটা জয়ের কাছে পৌঁছনো সম্ভব ? '

'চায়ের দোকানের ছেলেটার কথা জানি না। কিন্তু নিরুপমা বলে ওই কাজের মাসি আমাদের এই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে অনেকদিন কাজ করছে। অমলাদের বাড়িতেই বোধহয় ওর পনের-কুড়ি বছর হয়ে গেল। ও এরকম কাজ করবে বলে মনে হয় না।'

শান্তনু গোমেসের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আদিত্য শশীধরকে জিজ্ঞেস করল, 'চায়ের দোকানে খোঁজ নিয়েছিলেন? যেখান থেকে রুটি-ঘুগনি আসত?'

'খোঁজ নিয়েছি স্যার। রাস্তার চায়ের দোকান। ঘুগনি পাঁউরুটি, মাখন টোস্ট, ডিম-রুটি, দিশি কম্পানির কেক আর কয়েক রকম দিশি বিস্কুট। এর বাইরে আর কিছু পাওয়া যায় না। তবে কাছেই একটা ফ্যাক্টারি আছে বলে দোকানটায় বেশ বিক্রি । এখান থেকে মাসিক ব্যবস্থায় জয় তরফদাদের জন্যে পাঁউরুটি ঘুগনি আসত। তেল ঝাল ছাড়া। এর বেশি আর কিছু জানা যাচ্ছে না।'

(২)

সন্ধের মুখে ঝড় এল। আদিত্য তখনও আপিসে। ভাবছিল এবার বেরোবে, ঝড় উঠতে দেখে ঠিক করল আরও কিছুক্ষণ আপিসে থেকে যাবে। কফির জল বসাল। সিগারেট ধরাল। জানলার শার্শিতে ঝড়ের শব্দ। নিচে বউবাজার স্ট্রিট উত্তাল হয়ে উঠেছে। দমকা হাওয়া বর্ষশেষের আবর্জনা, কাগজ, প্লাস্টিক, ঝরা পাতা, উড়িয়ে বিবাদী বাগের দিক থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একটা বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং ঝড়ে শব্দ করে কাঁপছে। একটা জারুল গাছ এত দুলছে যে ভয় হয় এই বুঝি উপড়ে পড়বে। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। হঠাৎ টেলিফোন।

'আমি ডাঃ অসীমাভ রায় বলছি। অশনি রায়ের বাবা। আপনি কি আজ একটু রাত্তিরের দিকে, মানে এই সাড়ে আটটা ন'টার পরে, আমার চেম্বারে একবার আসতে পারবেন? ন'টার পরে এলেই ভাল হয়। আমার ততক্ষণে রুগি দেখা শেষ হয়ে যাবে।' অসীমাভ রায়ের গলাটা থমথমে। মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে।

'কী হল? কোনও সমস্যা হয়েছে?' আদিত্য প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিজ্ঞেস করল। "হ্যাঁ, সমস্যা একটা হয়েছে। কিন্তু ফোনে সেটা বলা যাবে না। তাই আপনাকে আসতে বলছি। ব্যাপারটা বাবলুও জানে না। এক্ষুনি জানাতেও চাই না। তাই চেম্বারে আসতে বললাম। আসতে পারবেন তো?'

'ঠিক আছে। চলে আসছি।' আদিত্য ফোন রেখে দিল।

আদিত্য ঘড়িতে দেখল মাত্র ছ'টা দশ। এখান থেকে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট যেতে বড় জোর আধঘন্টা। বাকি সময়টা কাটাবে কী করে? কেয়া আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে বলেছিল। ফিরে আদিত্যকে নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে যাবে। সেই ড্রাইভার যার নাম আদিত্য জানত গোপু, কিন্তু আসলে নাকি সৌমিত্র। কেয়াই কথা বলবে, কিন্তু তার মতে একজন পুরুষ মানুষ সঙ্গে থাকা দরকার। কেন দরকার, আদিত্য অবশ্য জানে না। যাই হোক সে কেয়ার সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছিল। এখন যেতে পারবে না বললে কেয়া বেজায় চটবে।

পরশু কেয়ার নতুন গাড়ি আসছে। তার আগে ড্রাইভার ঠিক করা খুবই দরকার ছিল। গত কুড়ি-পঁচিশ বছর আদিত্য গাড়ি চালায়নি। এতদিন পরে গাড়ি চালাতে একটু ভয়-ভয় করবে। বিশেষ করে নতুন গাড়ি। একটু ধাক্কা লেগে গেলে, দাগ হয়ে গেলে, মন খারাপ। শো-রুম থেকে গাড়িটা অবশ্য কম্পানির লোক পৌঁছে দেবে। কিন্তু তারপর? যেখানে গাড়িটা রাখা হবে সেখানে ঘেঁষ ঘেঁষ করে অনেকগুলো গাড়ি থাকে। প্র্যাকটিস না থাকলে গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে অন্য গাড়ির সঙ্গে লেগে যেতে পারে। অর্থাৎ পার্ক করার জন্যেও ড্রাইভার দরকার। আদিত্য কেয়ার ফোনটা লাগাল।

'সে কী! যেতে পারবে না!' কেয়া প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছে। 'তাহলে কী হবে? আমার তো পরশুদিনই ড্রাইভার দরকার।'

'আমি সত্যিই আজ পারছি না গো। খুব দরকারি একটা কাজ এসে গেছে। ফিরতে দশটা সাড়ে দশটা হয়ে যাবে। সত্যিই আমার কোনও উপায় নেই।'

'কিন্তু আমার ড্রাইভারের কী হবে?"

'তুমি গোপুর ফোন নম্বরটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও, আমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

'টেলিফোনে যদি কাজ হতো তাহলে তোমাকে যেতে বলতাম না। এসব কাজ টেলিফোনে হয় না।'

'গোপু কি তোমার গাড়ি চালাতে রাজি হয়েছে?'

'পুরো রাজি হয়নি। বলা যায় নিমরাজি হয়েছে। বাকিটা ওর সঙ্গে কথা বলে বোঝাতে হবে। তাই আমি ওর সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলতে চেয়েছিলাম।' 'গোপু ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও ড্রাইভার নেই? গোপুকেই ধরে আছ কেন?' 'আমি তো আর কাউকে চিনি না। তোমার চেনা থাকলে একটা ড্রাইভার জোগাড় করে দাও না।'

'ঠিক আছে। দেখছি। তুমি গোপুর নম্বরটা পাঠিয়ে দাও।'

কেয়া কী বুঝেছিল কে জানে, গোপুর সঙ্গে কথা বলে আদিত্যর মনে হল কেয়ার ডিউটি করতে তার খুব একটা উৎসাহ নেই। এখন যেখানে সে ভাড়া গাড়ি চালায় সেখানে কাজের চাপ খুব বেশি, কিন্তু টাকাটাও অনেক বেশি। অত টাকা কেয়া দিতে পারবে না। গোপুর বয়েস কম, তার খাটতে আপত্তি নেই, যদি টাকাটা বেশি হয়। সব মিলিয়ে আদিত্যর মনে হল গোপুর সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই ।

আসল কথাটা হল, ড্রাইভারের ব্যাপারটা কেয়া অনেকদিন ধরেই বলে যাচ্ছে, কিন্তু আদিত্য তেমন কান দেয়নি। কিন্তু এখন একেবারে শিয়রে সংক্রান্তি। কিছু একটা না করতে পারলে কেয়া ছাড়বে না। আদিত্য দেখল হাতে খানিকটা সময় আছে। সাড়ে আটটা নাগাদ বেরোলেও অনায়াসে ন'টার মধ্যে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট পৌঁছে যাওয়া যাবে। হাতের সময়টা অনায়াসে ড্রাইভার খোঁজার কাজে ব্যয় করা যেতে পারে। অনেক ভেবেচিন্তে আদিত্য গৌতমকে ফোন করল।

'একটা অন্য দরকারে ফোন করছি। একটা ড্রাইভার দিতে পারিস। কেয়া গাড়ি কিনছে। পরশু ডেলিভারি দেবে।'

'ড্রাইভার? দাঁড়া, তোকে একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। অন্তু গাংগুলির ফোন নম্বর। উনি আমাদের লালবাজারে ভাড়া গাড়ি সাপ্লাই করেন। ওর হাতে ড্রাইভার থাকতে পারে। তোর তদন্ত কেমন এগোচ্ছে?'

'কোন তদন্ত? ড্রাগ পেডলিং নাকি অশনি রায়ের কেস?'

'দুটোই। কিছু এগোতে পারলি?'

'তেমন এগোতে পারিনি। একটা ভাসা ভাসা ধারণা হয়েছে। আর ক'টা দিন যাক। তারপর তোর সঙ্গে বসব।"

অন্তু গাংগুলির সহায়তায় ঘন্টা খানেকের মধ্যেই একটি ড্রাইভার পাওয়া গেল। নাম মনোজ হালদার। বয়স্ক মানুষ। এক সময় পুলিশের ভাড়া গাড়ি চালাতেন। এখন খুব ভারি ডিউটি আর করতে চান না। কেয়ার পক্ষে আদর্শ। মাইনেও ঠিক হয়ে গেল।

কেয়াকে ফোন করে খবরটা দিতে কিন্তু তাকে খুব একটা খুশি মনে হল না। তার মাথায় তখনও গোপু ড্রাইভার ঘুরছে। কেয়ার ধারণা গোপুকে আর একটু জোর করলে সে রাজি হয়ে যেত। আদিত্য ততটা চেষ্টা করেনি। আদিত্য আর কথা না বাড়িয়ে ফোনটা রেখে দিল। হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটে ডাঃ অসীমাভ রায়ের চেম্বারের দিকে এবার রওয়ানা দিতে হবে।

আদিত্য যখন অসীমাভ রায়ের চেম্বারে পৌঁছল তখনও ন'টা বাজতে কয়েক মিনিট দেরি আছে। রিসেপশানের মেয়েটিকে নিজের নাম বলতে সে আদিত্যকে বসতে বলল। বলল, পেশেন্ট দেখা শেষ হয়ে

গেলে ডাঃ রায় আপনাকে ডেকে নেবেন । আদিত্য দেখল ঘরে জনা তিনেক চিকিৎসার্থী তখনও অপেক্ষা করছে।

শেষ রুগিটি যখন চেম্বারে ঢুকছে তখন সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। সে চেম্বার থেকে বেরোল পৌনে দশটা নাগাদ, তার পেছন পেছন ডাঃ অসীমাভ রায়।

'আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য ক্ষমা চাইছি। আসলে এরা প্রত্যেকেই অনেকদিন আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন। এদের তো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। আসুন।'

'আমি কি স্যার মেন দরজা বন্ধ করে দেব?' রিসেপশনের মেয়েটি বলল। 'ও হ্যাঁ। তুমি মেন দরজা বন্ধ করে দরোয়ানের কাছে চাবি দিয়ে চলে যাও। আমি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব। আসুন আদিত্যবাবু।' অসীমাভ রায়কে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। হয়ত সারাদিনের ক্লান্তি। হয়ত অন্য কিছু।

কেয়া ফোন করছে।

'কখন আসবে? খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'ক্লায়েন্টের সঙ্গে আছি। আমার একটু দেরি হবে। তুমি খেয়ে নাও।' আদিত্য অসীমাভ রায়ের পেছন পেছন তার চেম্বারে ঢুকল।

বেশ পরিপাটি করে সাজানো চেম্বার। একদিকে অসীমাভ রায়ের বসার টেবিল। অন্যদিকে ছোট একটা বেড যেখানে রুগিদের শুইয়ে পরীক্ষা করা যায়। পেছনে আলো দেওয়া এক্সরে দেখার একটা চৌকো ফ্রেম। অসীমাভ রায় নিজের চেয়ারে বসে উল্টো দিকে আদিত্যকে বসতে বললেন।

'একটা ক্রাইসিস হয়েছে। বেশ বড়-সড় ক্রাইসিস। কীভাবে আপনাকে বলব বুঝতে পারছি না।' অসীমাভ রায় কিছুক্ষণ ডানহাতের আঙুল দিয়ে কপাল ঢেকে চোখ বন্ধ করে রইলেন। যেন ভয়ানক কিছু বলার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করছেন।

আদিত্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে।

'আজ সকালে আমি এই খামটা পেয়েছি। কেউ একজন এসে আমার রিসেপশনে দিয়ে গেছে।' অসীমাভ রায় ড্রয়ার থেকে একটা সাদা খাম বার করলেন। খামের ওপর অসীমাভ রায়ের নাম ছাড়াও বড় বড় করে লেখা Urgent and Confidential।

'খামের ভেতর একটা চিঠি আছে। আর কয়েকটা ছবি। আমার ছেলে বাবলুর কয়েকটা ছবি। একজন মহিলার সঙ্গে। অত্যন্ত কমপ্রমাইজড অবস্থায়। মহিলার মুখটা ব্লার্ড। বাবলুর মুখটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।' অসীমাভ রায় খামটা আদিত্যর দিকে এগিয়ে দিলেন।

আদিত্য এক ঝলক ছবিগুলো দেখে খামের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে পর্নোগ্রাফির দোকানে যেমন ছবি পাওয়া যায় সেরকম কিছু ছবি। আদিত্য খামের চিঠিটা বার করল। ইংরেজিতে লেখা চিঠি। বাংলা তর্জমা করলে এইরকম দাঁড়ায়।

আমার মাঝে-মাঝেই টাকার দরকার হয়। কখনও কম, কখনও বেশি। আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। যদি না করেন, আপনার ছেলের এই সুন্দর মুহূর্তের ছবিগুলো আমি এমন এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব যেখানে তাদের খুব কদর হবে। এই মুহূর্তে আমার মাত্র ১০ লাখ টাকা দরকার। এটা আপনার কাছে অতি সামান্য টাকা। আমি আপনাকে জানিয়ে দেব কোথায় এবং কী ভাবে টাকাটা দিতে হবে । ধরে নিচ্ছি, পুলিশে খবর দেবার বোকামি করবেন না।

টাইপ করা চিঠি। ওয়ার্ড সফটওয়্যারের টাইমস নিউ রোমান হরফ। যে কোনও ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ-এ থাকে। অর্থাৎ হরফ দেখে পত্রলেখকের পরিচয় জানার কোনও উপায় নেই।

'কে এই চিঠিটা পাঠাতে পারে? আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

‘সত্যি বলতে কি আমার কোনও ধারণাই নেই কে চিঠিটা পাঠিয়েছে। আই হ্যাভ নো ক্লু।'

‘আপনি সেই যে এক মহিলার কথা বলেছিলেন? যার স্বামী আপনার পেশেন্ট ছিলেন, মারা গিয়েছেন। ভদ্রমহিলার ধারণা আপনিই ওর স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। মনে আছে?'

‘খুব মনে আছে। বনানী দাস। স্বামী মনোময় দাস।' অসীমাভ রায় খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ভাবছেন। তারপর বললেন, ‘বনানী দাস নানাভাবে আমাকে হ্যারাস করেছিল। আমার নামে মামলা করেছিল। সোশাল মিডিয়ায় আমার নামে কুৎসা করেছিল। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আমার মনে হয় না ও এতটা নিচে নামতে পারে।'

‘কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন আপনার ধারণা বনানীই মৃত্তিকা সেজে অশনিবাবুকে সিডিউস করেছিলেন। পরে আসল মৃত্তিকাকে খুন করে বা করিয়ে তিনি খুনের দায়টা অশনিবাবুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। বলেছিলেন তো?'

‘বলেছিলাম। এবং যেটা বলেছিলাম সেটা আমি এখনও বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি এটাও বিশ্বাস করি যে বনানী দাস আমাকে হার্ট করার জন্য নানারকম জঘন্য কাজ করলেও কখনও টাকা চেয়ে ব্ল্যাকমেল করবে না। ইটস বিয়ন্ড হার ডিগনিটি। আমি বোধহয় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারলাম না।'

পারলেন কি পারলেন না তার মধ্যে না গিয়ে আদিত্য হঠাৎ সরাসরি প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা, ওই ছবিগুলোতে যে মহিলাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি কি বনানী দাস হতে পারেন?'

‘না, না। সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। একে তো ওই ছবির মহিলার গায়ের রঙ একটু চাপা আর বনানী দাস রীতিমত ফর্সা। তাছাড়া ছবির মহিলার গড়নও বনানী দাসের তুলনায় অনেক লম্বা। কিন্তু সব থেকে বড় কথা, এই রকম কাজ করার প্রবৃত্তি বনানী দাসের হবে না। বনানীর যতই দোষ থাকুক শি ওয়াজ নট আ হোর।'

‘অন্য একটা প্রশ্ন। এই ছবিগুলো কাকে কাকে পাঠালে আপনাদের ক্ষতি হবে?' ‘দেখুন, হাইকোর্ট বাবলুকে নির্দোষ বলার পর এখন কিন্তু বাবলুর ওপর আর কোনও চার্জ নেই। তাই বাবলু ওর পুরোনো চাকরিটা ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। কথাবার্তাও খানিকটা এগিয়েছে। ওর বস ওকে নিতে ইন্টারেস্টেড। বাবলু ওয়াজ আ গুড ব্যাঙ্কার, ইউ নো। এই অবস্থায় বাবলুর বসের কাছে ওই ছবিগুলো যদি কেউ পাঠিয়ে দেয় তাহলে ওর চাকরিটা হবে কিনা সন্দেহ। এটা তো একটা বড় ক্ষতি। তাছাড়া আমাদের পরিবার খুব পুরোনো এবং কনজারভেটিভ। আমার কাকা-কাকিমা, দাদা-বৌদি সকলেই জীবিত। তাঁরা বাবলুকে খুব ভালবাসেন। তাঁদের হাতে এই ছবিগুলো গেলে কী যে হবে আমি ভেবেই শিউরে উঠছি। ছবিগুলো ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা তাদের ছেলেমেয়েদের হাতে পৌঁছলে আমাদের সামাজিকভবে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। কোথাও আর মুখ দেখাতে পারব না।'

আদিত্য খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। অসীমাভ রায়ও কথা বলছেন না। চিন্তায় ডুবে আছেন। কিছু পরে স্তব্ধতা ভেঙে আদিত্য বলল, ‘অশনিবাবুকে কিন্তু ব্যাপারটা জানাতেই হবে। কোন সিচুয়েশনে ছবিগুলো তোলা হয়েছিল সেটা একমাত্র উনিই বলতে পারবেন। সেটা কিন্তু আমাদের জানা দরকার।'

‘আমি বাবা হয়ে এই ছবিগুলো নিয়ে বাবলুর সঙ্গে কী ভাবে কথা বলব ?' ‘আপনি না বলতে পারলে আমাকে বলতে হবে। আপনি আমাকে ছবিগুলো দিন আমি অশনিবাবুর সঙ্গে কালকেই কথা বলে নেব।'

‘আমার এখন তাহলে কী করণীয়?’

‘আপনি ব্যাঙ্ক থেকে দশ লাখ টাকা তুলে রাখুন। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব টাকাটা যাতে ব্ল্যাকমেলারকে দিতে না হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস ব্ল্যাকমেলারটি বা তার কোনও অনুচর আপনার ওপর নজর রাখছে। বিশেষ করে সে জানতে চাইবে আপনি ব্যাঙ্ক থেকে কোনও মোটা টাকা তুললেন কিনা। যদি সে দ্যাখে আপনি টাকা তুললেন তাহলে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হবে। আমরা তাকে নিশ্চিন্ত রাখতে চাই। তাহলে সে

কিছুটা অফ গার্ড হয়ে যাবে। এর বাইরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর আপনার কিছু করার নেই। ব্ল্যাকমেলার তো বলেছে টাকা নেবার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তাকে যোগাযোগ করতে দিন।'

'পুলিশকে কি আমি ব্যাপারটা জানাব?'

'আপনাকে কিচ্ছু জানাতে হবে না। যা জানাবার আমিই জানাব। আর শুনুন। আমি আগে এখান থেকে বেরিয়ে যাই। আপনি দশ মিনিট পরে বেরোবেন। হয়ত লোকটা নজর রাখছে। আমাদের সে এক সঙ্গে দেখুক আমি চাই না। ঠিক আছে আমি চলি। ব্ল্যাকমেলার যোগাযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন। গুড নাইট।'

'আচ্ছা, একটা কাজ করবেন?' আদিত্য দু'পা এগিয়ে আবার ফিরে এসেছে। 'আমাকে একটা প্রেস্ক্রিপশন লিখে দেবেন? আমি ওটা নিয়ে কোনও ওষুধের দোকানে ঢুকব। যদি কেউ আমার ওপর নজর রাখে সে ধরে নেবে আমি আজ রাত্তিরের শেষ পেশেন্ট।'

অসীমাভ রায় প্রথমে ব্যাপারটা ধরতে পারছিলেন না। পরে বুঝতে পেরে একটু হেসে বললেন, 'দেখি আপনার প্রেশারটা। ওষুধ দেবার আগে রুগিকে একবার অন্তত দেখে নেওয়া ভাল।'

প্রেশার চেক করতে গিয়ে অসীমাভ রায়ের মুখটা ক্রমশ গম্ভীর হচ্ছিল। প্রেশার চেক করার পর আদিত্যকে বললেন, 'একটু এগিয়ে আসুন। বুকটা একবার দেখি। স্টেথো দিয়ে আদিত্যর বুকটা পরীক্ষা করতে করতে অসীমাভ রায় বললেন, 'আপনি কি স্মোক করেন ?

'হ্যাঁ, মানে ওই খারাপ অভ্যাসটা এখনও ছাড়তে পারিনি।' আদিত্য ঢোঁক গিলে বলল।

'আপনার বুক বা পিঠ অঞ্চলে কখনও ব্যথা হয়? ধরুন কিছুক্ষণ হাঁটার পর কিংবা সিঁড়ি ভাঙার পর?'

'হ্যাঁ হয়।' আদিত্যর আপিসটা দোতলায় হলেও পুরোনো দিনের বাড়ি বলে সিঁড়িগুলো খুব খাড়া খাড়া। আজকাল দোতলায় আপিসে পৌঁছে আদিত্যর বুকে বেশ ব্যথা হয়। চেয়ারে দু'তিন মিনিট বসে থাকলে আস্তে আস্তে ব্যথাটা চলে যায়। কথাটা কেয়াকে বলা হয়নি। কিন্তু আদিত্যর মনে হল অসীমাভ রায়কে জানানো দরকার।

'আদিত্যবাবু আপনাকে ক্লিনিকালি দেখে আমার মনে হচ্ছে আপনার আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা। ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণ সিরিয়াস। আপনার ব্লাড প্রেশারও বেশি। বিশেষ করে নিচেরটা প্রায় একশ'। আপনি আর একটা সিগারেটও খাবেন না। খেলে সিমপ্লি হার্ট অ্যাটাক ডেকে আনবেন। আর কালই একটা ট্রেডমিল আর একটা ইকো কার্ডিওগ্রাম করান। আর কয়েকটা ব্লাড-ওয়ার্ক। আমি সব লিখে দিচ্ছি। এই রাস্তার মোড়ে কেয়ার বলে একটা ডাওগনস্টিক সেন্টার আছে, ডক্টর চৌহান ওখানকার চিফ রেডিওলজিস্ট। আমার বন্ধু। খুব ডিপেন্ডেবল। ওঁর কাছে করাবেন। তাছাড়া দুটো ওষুধ লিখে দিচ্ছি। আজ রাত্তির থেকে শুরু করে দিন। দিনে দু'বার। আফটার ব্রেকফাস্ট এবং আফটার ডিনার। ব্যাপারটা প্লিজ সিরিয়াসলি নেবেন। আপনার হার্টের আর্টারিতে মনে হচ্ছে ব্লক আছে। ট্রেডমিল এবং ইকোর রেজাল্টগুলো পেলে খানিকটা বোঝা যাবে। দরকার পড়লে একটা অ্যাঞ্জিওগ্রামও করতে হবে। আপনার বয়েস এখন কত?'

ডাঃ অসীমাভ রায়ের ডাক্তার সত্তা তার আর সব সত্তাকে ছাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পরে, আদিত্য যখন অসীমাভ রায়ের চেম্বারের উল্টোদিকে একটা ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনছে তখন সে খেয়াল করল একটা আধময়লা জামা পরা লোক তার প্রায় গায়ের ওপর এসে তার প্রেসক্রিপশনটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। যেন ওটাকে পড়বার চেষ্টা করছে। অথচ দোকানে তেমন ভিড় নেই।

আধময়লা জামা পরা লোকটাকে শুনিয়ে আদিত্য দোকানের লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কেয়ার ডায়োগনস্টিক সেন্টারটা কোথায়? ডাক্তারবাবু ওখান থেকে আমাকে এই টেস্টগুলো করাতে বলেছেন।'

"ওই তো বেরিয়ে ডানদিকে। রাস্তার মোড়ে। এখন বন্ধ হয়ে গেছে। কাল সকাল ন'টার মধ্যে খালি পেটে এসে আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে। যদি কালকেই টেস্টগুলো করাতে চান।'

আদিত্য লক্ষ করল আধময়লা জামা পরা লোকটা এক পাতা জেলুসিল কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মাথায় এক রাশ চিন্তা নিয়ে আদিত্য রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনের দিকে হাঁটা লাগাল।

(৩)

লাল টুকটুকে মারুতি ওয়্যাগন আর। একবার দেখলেই ভাল লেগে যাবে। তার ওপর নতুন ড্রাইভার মনোজ হালদার লোকটিকেও আদিত্যর পছন্দ হয়ে গেল। ষাটের ধারে-কাছে বয়েস। লম্বা গড়ন। চোখে চশমা। খুব কম কথা বলে। কেষ্টপুরে বাড়ি, আদিত্যদের বাসস্থান থেকে খুব দূরে নয়। কখনও-সখনও রাত্তির হয়ে গেলে বাড়ি ফিরতে অসুবিধে হবে না।

যেদিন গাড়ি এল তার পরের দিন কেয়া ছুটি নিয়েছে। আদিত্যকেও অফিস যেতে দেয়নি। দু'জনে মিলে সকাল-সকাল নতুন গাড়ি নিয়ে ডায়মন্ডহারবারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে। বেহালা পার হয়ে ঠাকুরপুকুর পৌঁছতে ঘন্টা খানেক লেগে গেল। এই সময় জ্যাম থাকার কথা নয়, কিন্তু ডায়মন্ডহারবার রোডের কিছু কিছু অংশে এখনও মেট্রোরেলের কাজ হচ্ছে। গাড়ি জোকা ছাড়াতে না ছাড়াতে হাওয়ারা দৌড়ে এল। আদিত্যর বেশ ভাল লাগছে।

'জানলাটা বন্ধ কর। চুল উড়ে যাচ্ছে।' আদিত্যর মতামতের তোয়াক্কা না করে কেয়া এবার ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল, 'মনোজবাবু, জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে এসি চালিয়ে দিন।'

প্রাকৃতিক হাওয়া আদিত্যর কপালে নেই। তবে দৃশ্য তো আছে।

ধানখেত। আলের রাস্তা এঁকেবেঁকে মাঠের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে একটা একলা দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়ে থেমে গেছে। দূর থেকে পাম্প চলার শব্দ ভেসে আসছে। উপুড়-চুপুড় সবজি নিয়ে রিক্সাভ্যান মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় এক্ষুনি রওনা দেবে। মনোজ হালদারের গাড়ি চালানোর হাতটা বেশ পাকা। জোরে চালালেও মনে হয় না বেপরোয়া চালাচ্ছে।

আমতলার হাটের কাছে পৌঁছে গাড়ির গতি আবার খুব কমে এল। আজ হাটবার। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি দোকান বসে গেছে। প্লাস্টিকের বালতি-মগ, জামাকাপড়, মোবাইল কভার, চামড়ার বেল্ট, চটের ব্যাগ। তার পাশে মুরগির দোকান, কচি পাঁঠার দোকান। একটা লোক সাইকেল রিক্সায় দু'তিনটে পেল্লায় বস্তা চাপিয়ে কোথায় যেন চলেছে। বস্তাগুলো রিক্সার প্রায় সব জায়গা নিয়ে নিয়েছে। লোকটার নিজের বসার জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে। হাট দেখতে আদিত্যর খুব ভাল লাগে। তাই গাড়ির গতি কমে এলেও তার খারাপ লাগছে না। তাছাড়া তাদের তো কোথাও তাড়াতাড়ি পৌঁছবার নেই। কেয়ার দিকে তাকিয়ে আদিত্য দেখল কেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমতলা পেরোতে প্রায় কুড়ি মিনিট লেগে গেল। পেরোতে না পেরোতেই আদিত্যর মোবাইলটা বেজে উঠল। ডাঃ অসীমাভ রায়। মোবাইল বাজার শব্দে কেয়ার ঘুম ভেঙে গেছে।

'আপনার রিপোর্টগুলো এইমাত্র হাতে এল। ভারত চৌহান পাঠিয়ে দিয়েছে। রিপোর্টগুলো ভাল নয়। বিশেষ করে ট্রেডমিল রিপোর্টে বেশ ইররেগুলারিটি আছে। আপনাকে একটা অ্যাঞ্জিওগ্রাম করাতে হবে। তার জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। আমার ধারণা আপনার আর্টারিতে মালটিপল ব্লক আছে। অ্যাঞ্জিও করলে দেখা যাবে কোথায় ব্লক, ক'টা ব্লক। তখন ঠিক করতে হবে বাইপাস দরকার নাকি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি।

যাই হোক আপনি একদম দেরি করবেন না। সম্ভব হলে আজ-কালের মধ্যেই কোথাও ভর্তি হয়ে যান। আর আমাকে দিয়ে যদি অ্যাঞ্জিও করাতে চান তাহলে রাসেল স্ট্রিটে হার্টকেয়ার বলে যে নার্সিং হোমটা আছে সেখানে ভর্তি হতে হবে। কী ঠিক করলেন, আজ রাত্তিরের মধ্যে জানাবেন।' আদিত্য কাল চুপিচুপি গিয়ে টেস্টগুলো করে এসেছিল। শরীর খারাপের ব্যাপারে কেয়াকে এখনও কিছু বলা হয়নি। এখন অসীমাভ

রায়কে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে কেয়া টের পেয়ে যাবে। টের পেয়ে গেলে ডায়মন্ডহারবার যাত্রাটাই মাটি। হয়ত এখান থেকেই ফিরে যেতে চাইবে।

'ঠিক আছে। জানাব।' আদিত্য সংক্ষেপে বলল। 'আপনার ওদিককার খবর কী? টাকা চেয়ে কোনও চিঠিপত্র এসেছে?'

'এখনও আসেনি। এলেই জানাব। তবে আপনার যা শরীরের অবস্থা! এই শরীরে আপনি কতটা কী করতে পারবেন বুঝতে পারছি না। অথচ পুলিশের কাছেও যেতে পারছি না।' ডাঃ অসীমাভ রায়ের গলাটা চিন্তান্বিত শোনাল।

'দেখাই যাক না কী হয়। আগে থেকে চিন্তা করে লাভ নেই। আপনি টাকাটা তুলে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ। কাল তুলেছি।'

'ঠিক আছে। দেখা যাক কী হয়।'

আদিত্য ফোন রেখে দিল।

'কে ফোন করেছিল?' কেয়া কি কিছু আঁচ করেছে?

'অশনি রায়ের বাবা, ডাঃ অসীমাভ রায়।'

"কেন ফোন করেছে?'

'ওর ছেলের কিছু আপত্তিকর ছবি তুলে সেই ছবি দেখিয়ে কেউ ডাক্তারবাবুকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে।'

'সে কী? কীরকম আপত্তিকর ছবি?'

'কোনও মহিলার সঙ্গে পর্নোগ্রাফিক ছবি। '

"ওরে বাবা। ছেলেটা তো তাহলে ভাল নয়।'

'সেটা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। কেউ ওকে ফাঁসাতেও পারে।'

'ও।' ব্যাপারটায় কেয়ার উৎসাহ চলে গেছে। সে আবার চোখ বুজিয়েছে। গাড়ি এখন ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বেশ জোরে যাচ্ছে। দু'দিকে আবার ধানখেত।

সরিষার মোড়ে পৌঁছে কেয়া বলল, 'গাড়ি থামিয়ে একটু ব্রেকফাস্ট খেলে হতো না? এখানে কয়েকটা চমৎকার সিঙাড়া-জিলিপির দোকান আছে। স্কুল থেকে পিকনিক করতে এসে একবার খেয়েছিলাম।'

সিঙাড়া-জিলিপির ব্যাপারে আদিত্য একপায়ে খাড়া।

মোড় থেকে একটা রাস্তা রায়চকের দিকে চলে গেছে। ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে আর একটু এগোলেই পাশাপাশি দুটো মিষ্টির দোকান। সামনেই গরম গরম সিঙাড়া ভাজছে। শুধু একটা অভাব। জিলিপি নেই। তার বদলে রসগোল্লা। কলকাতার অভিজাত দোকানে যেমন স্পঞ্জ রসগোল্লা পাওয়া যায় তেমন নয়। এটা খাঁটি মফস্বলের বাঙালি রসগোল্লা। খানিকটা ক্ষীরমোহনের মতন। এক একটা প্রায় টেনিস বলের আকারের। সলিড ছানা। সিঙাড়ার মতো রসগোল্লাটাও গরম ছিল। মনে হয় একটু আগে কড়া থেকে নামিয়েছে।

আদিত্য ভাবছিল কখন কেয়াকে তার শরীর খারাপের কথাটা বলবে? নিজের শরীর নিয়ে আদিত্য একেবারেই ভাবে না। কিন্তু কেয়াকে নিয়ে তার খুব চিন্তা। কেয়া যদি জানতে পারে আদিত্যকে খুব শিগগির হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে, সে কীভাবে ব্যাপারটা নেবে? আদিত্য ছাড়া কেয়ার আর কেউ নেই, এটা আদিত্য জানে। তাই আদিত্যর ব্যাপারে কেয়া সর্বদা দুশ্চিন্তায় ভোগে। তাছাড়া তাকে যদি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, অসীমাভ রায়ের কেসটার কী হবে?

চা এসেছে। চায়ের গেলাশে চুমুক দিয়ে আদিত্য সুভদ্র মাজির নম্বরটা লাগাল। 'দাদা, একটু ঝামেলার মধ্যে আছি। মিনিট পনের পরে করছি। ওদিক থেকে উত্তর এল।

'আমিই করব। এই ধর ঘন্টা দুয়েক বাদে? ঠিক আছে?'

'একদম ঠিক আছে।'

‘উঠবে?’ কেয়া আদিত্যর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

‘রায়চক যাবে নাকি? শুনেছি ওখানে নদীর ধারটা ইনটারেস্টিং।' আদিত্য রায়চক যাবার রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে বলল ।

‘রায়চক?’ কেয়া ভাবছে। ‘নাঃ থাক। আজ ডায়মন্ডহারবার মন করে বেরিয়েছি। ডায়মন্ডহারবারেই যাই। পরে একদিন বরং রায়চক যাওয়া যাবে।'

ড্রাইভার মনোজ হালদার কিছুক্ষণ আগেই খাওয়া শেষ করে গাড়িতে গিয়ে বসেছে। অনেক বছর আগে আদিত্য একবার ডায়মন্ডহারবারে এসেছিল। তখন সেখানে মোটামুটি ভদ্র, থাকার উপযোগী হোটেল বলতে ছিল সরকারি যাত্রীনিবাস সাগরিকা। এখন আর একটু বিলাসবহুল দু'একটা হোটেল হয়েছে। তার একটা গঙ্গার পাড় ঘেঁষে। সেখানে পৌঁছে জানা গেল তাদের সব ঘর ভর্তি। শুধু মূল হোটেল থেকে একটু বিচ্ছিন্ন একটা কটেজ খালি আছে যেটা একেবারে নদীর ওপরে। তাও শুধু আজ রাত্তিরের জন্যে কটেজটা খালি আছে। কাল বেলা বারোটায় অন্য লোক এসে যাবে। কটেজটার ভাড়া অন্য ঘরগুলোর তুলনায় অনেকটাই বেশি।

ভাড়ার অঙ্কটা শুনে আদিত্য ইতস্তত করছিল, কেয়া সেদিকে না তাকিয়ে রিসেপশানের মেয়েটিকে বলল, “আমরা কটেজটাই নেব। এক রাত্তিরের জন্যেই নেব।'

ড্রাইভারদের থাকার জন্য এই হোটেলে আলাদা ব্যবস্থা আছে।

কটেজটা নির্জন। একটা বসার ঘর আছে। তার সংলগ্ন শোবার ঘর। বসার ঘরে চা-কফি বানিয়ে নেবার ব্যবস্থা। ছোট একটা ফ্রিজ। খাবার টেবিল। টেবিলের ওপর ফ্রুট বাসকেট। শোবার ঘরের লাগোয়া বারান্দা। কাঁচ দিয়ে ঢাকা। নদীটা গায়ের ওপর এসে পড়েছে। আদিত্য বারান্দা থেকে তন্ময় হয়ে নদী দেখছিল।

‘একটু কফি করবে নাকি?' কেয়া ঘরের ভেতর থেকে বলল। আদিত্য লক্ষ করল কেয়া স্নানঘর থেকে মুখ-চোখে জল দিয়ে বেরিয়েছে।

‘এখন কফি খাবে? তাহলে লাঞ্চ খাবে কখন?' আদিত্য ঘড়ির দিকে তাকাল। বারোটা বাজে।

'ঠিক আছে। তাহলে লাঞ্চের পরেই না হয় কফি খাব। কিন্তু লাঞ্চটা কোথায় খাচ্ছি? রুম সার্ভিসে অর্ডার দিয়ে দিই?'

“আরে, রাত্তিরের ডিনারটা তো ঘরে বসেই খেতে হবে। তখন আর বাইরে যেতে ইচ্ছে করবে না। এখন চল না বাইরেটা একটু এক্সপ্লোর করে দেখি। এক সময় সাগরিকা বলে ওই সরকারি হোটেলটায় খুব টাটকা মাছ পাওয়া যেত। গিয়ে দেখি না। হয়ত এখনও পাওয়া যেতে পারে।'

আদিত্যর অনুমান ভুল নয়। সাগরিকা হোটেলের ডাইনিং রুমে খোঁজ নিয়ে জানা গেল নদীর মোহানায় সদ্য ধরা পমফ্রেট এবং লোকাল পুকুরের টাটকা পারশে দুই-ই পাওয়া যাবে।

ডাইনিং হলটা বেশ বড়। তবে সপ্তাহের মাঝখানে একেবারেই ভিড় নেই। আদিত্যরা ছাড়া আর একটা পরিবার জানলার ধারে বসে খাবারের অপেক্ষা করছে। বাবা, মা, দুই ছেলে। আদিত্যর মনে হল তারা একটু আগে আগে এসে পড়েছে। রান্না এখনও পুরো হয়নি।

কেয়া বলল, ‘একটা জলের বোতল দিতে বল না। গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।'

গলা শুকিয়ে যাওয়াটা আশ্চর্য নয়। রোদ্দুরের যা তেজ। যে লোকটি খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। জলের বোতলের কথাটা কাকে বলা যায়? হঠাৎ আদিত্যর চোখে পড়ল হোটেলের বাইরে, নদীর ধারের বাঁধানো জায়গাটায় ডাব বিক্রি হচ্ছে।

‘ডাব খাবে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল। 'বাইরে বিক্রি হচ্ছে।'

‘খাওয়ালে নিশ্চয় খাব। দূরে যেতে হবে?'

‘না, না। এই সামনেই। তুমি বোসো আমি দুটো ডাব নিয়ে আসছি।' ‘তাড়াতাড়ি এস।’

ডাবওলার সামনে তিনটে লোক ডাব কিনবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। লোকগুলোর মুখ দেখা যাচ্ছে না। ডাবওলা একটা ডাব কেটে তিনজনের একজনকে দিল। তারপর আর একজনকে। শেষ লোকটা ডাব নেবার আগে পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। নিশ্চয় পয়সা বার করবে। একটা লরি হর্ন দিতে দিতে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। হর্নের শব্দ শুনে শেষ লোকটা পেছন ফিরে লরির দিকে তাকিয়েছে। আদিত্য তার মুখটা দেখতে পাচ্ছে। রোগা, ফর্সা মুখ। খুব বেশি বয়েস নয়। বড় জোর বছর চল্লিশ। লোকটা আদিত্যর দিকে একবার তাকাল যেমন করে মানুষ অপরিচিতদের দিকে তাকায়। কিন্তু আদিত্যর মনে হচ্ছে লোকটাকে সে কোথায় যেন দেখেছে। কোথায় দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারল না।

দুটো ডাব হাতে নিয়ে সাগরিকা হোটেলে ঢোকার আগে আদিত্য একবার পেছন ফিরে দেখল। লোক তিনটে রোদ্দুরের মধ্যে নদীর দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

আদিত্যরা যখন কটেজে ফিরে এল তখন দক্ষিণ দিকের আকাশে অল্প মেঘ জমেছে। কেয়া বাইরের পোষাক ছেড়ে বাড়ির পোষাক পরে দাঁত ব্রাশ করার জন্য বাথরুমে ঢুকল। আদিত্যও বাইরের পোষাক পালটে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিয়েছে। গুরুভোজনের পর তার খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে শরীর খারাপের কথাটা কেয়াকে এখনও বলা হয়নি।

কেয়া বাথরুম থেকে বেরিয়ে বিছানায় শুয়েছে।

'এখানে এস। আমার পাশে শোও।' কেয়া আদুরে গলায় বলল। 'আমাকে ধর।' কেয়াকে এত প্রগল্ভ হতে আদিত্য খুব বেশি দেখেনি। বেড়াতে এসে কেয়ার চরিত্রটা পালটে গেছে।

আধঘন্টা পরে আদিত্য কাঁচে-ঢাকা বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে গিয়ে বসল। কেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। কেয়াকে আদর করার ধকলে আদিত্যর বুকের বাঁদিকটা ব্যথা করছিল। কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে ব্যথাটা চলে গেল। দক্ষিণের আকাশটা এখন অনেকটাই মেঘাবৃত। অনেক দূর দিয়ে একটা স্টিমার যাচ্ছে। দুটো গাধাবোট নদীর ধারে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝনদীতে কয়েকজন ধীবর নৌকো ভাসিয়েছে। দক্ষিণ সাগর থেকে হাওয়া আসছে। একটু একটু করে নদীর ঢেউগুলো অশান্ত হচ্ছে। দেখতে দেখতে দক্ষিণ দিগন্তের শেট রঙটা সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল।

আদিত্যর হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুভদ্র মাজিকে ফোন করার কথা ছিল। করা হয়নি।

'সুভদ্র, এখন কথা বলা যাবে?' আদিত্য নম্বরটা লাগিয়ে বলল।

'নিশ্চয় দাদা। বলুন।'

'একটা ব্যাপার হয়েছে। তোমাকে সাহায্য করতে হবে। আমি ঘটনাটা সংক্ষেপে বলছি। অশনি রায়ের বাবা অসীমাভ রায়কে কেউ ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে। অশনির সঙ্গে এক মহিলার কিছু পর্নোগ্রাফিক ছবি অসীমাভ রায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে, এক্ষুনি দশ লাখ টাকা না দিলে ছবিগুলো বিভিন্ন সেনসিটিভ যায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

'আমাকে কী করতে বলছেন?'

'তোমার দুটো কাজ। প্রথমত, ছবিগুলো ফরেনসিকে পাঠিয়ে যাচাই করতে হবে ওগুলো আসল না ফেক। তুমি তো জান, এর বড় তার মুণ্ডু জুড়ে দিয়ে আজকাল নানা রকম ছবি তৈরি করা যায়। সেরকম কিছু হয়েছে কিনা প্রথমে বুঝতে হবে।'

'ছবিগুলো আমি পাচ্ছি কোথায়?'

'ওগুলো তোমার অফিসের ঠিকানায় আমি কুরিয়ার করে দিয়েছি। আজ বিকেলের মধ্যে পেয়ে যাবে। ওসব ছবি আমার কাছে আছে দেখলে কেয়া ডিভোর্স করে দেবে। তাই প্রথম সুযোগেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।' আদিত্য হাসল।

'ঠিক আছে। আমি ছবিগুলো জেনুইন কিনা ভেরিফাই করে নেব। আর দ্বিতীয় কাজ?'

‘অবশ্য ছবিগুলো আমারও কাজে লাগতে পারে ভেবে মোবাইলে ফটো তুলে রেখে দিয়েছি। কেয়া যদি দেখতে পায় তোমাকে সাক্ষী মানব।' আদিত্য আবার হাসল।

‘ঘাবড়াবেন না দাদা, আমি আছি। দ্বিতীয় কাজটা কী বলুন।'

‘দ্বিতীয় কাজটা আর একটু জটিল। বনানী দাস বলে একজন মহিলার খোঁজ করতে হবে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে অসীমাভ রায়ের পুরোনো শত্রুতা। বনানীর স্বামী মনোময় দাস অসীমাভ রায়ের চিকিৎসায় মারা গেছিল। বনানীর ধারণা অসীমাভ রায়ই তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। সেই থেকে শত্রুতা। আমার ধারণা বনানী এই ব্ল্যাকমেলিং-এর পেছনে থাকতে পারে। যদিও অসীমাভ রায়ের সেটা মনে হয় না। যাই হোক, বনানী দাসের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

‘বনানী দাসের কোনও ঠিকানা জানা আছে?'

‘সেটাই তো মুস্কিল। একটা আট-দশ বছরের পুরোনো ঠিকানা আছে, কিন্তু সেখানে বনানী দাস থাকে না। অশনি রায়ের মামলাটা যখন হাইকোর্টে চলছিল তখন কোর্ট থেকে বনানী দাশের নামে সমন গিয়েছিল। কিন্তু বনানী দাসকে পাওয়া যায়নি । বনানীর স্বামীর একটা রঙের দোকান ছিল ধর্মতলায়। দাস অ্যান্ড কম্পানি। কিন্তু সেটাও এখন আর নেই।

পুরোনো ঠিকানাটা আপনার কাছে আছে? ওখান থেকেই খোঁজটা শুরু করতে হবে।'

‘একদম ঠিক। পুরোনো ঠিকানাটা আমি তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি।' ‘ব্ল্যাকমেল-এর ব্যাপারটা কী করবেন? অসীমাভ রায় কী টাকাটা দেবেন বলছেন?' ‘টাকাটা কবে, কোথায়, কীভাবে দিতে হবে এসব জানিয়ে আগে চিঠি আসুক। চিঠি এলে তখন ঠিক করা যাবে। এরকম চিঠি যদি আসে আমি তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাব।'

‘অশনি রায় কী বলছে? সে কি কখনও ওই রকম অবস্থায় কোনও মহিলার সঙ্গে সময় কাটিয়েছিল?'

‘অশনি রায় এখনও ব্যাপারটা জানে না। তার বাবা এ-ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলতে সংকোচ বোধ করছে। আমি তার সঙ্গে কথা বলব।'

সুভদ্র মাজির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আদিত্য দেখেছিল বৃষ্টি এসে গেছে।

ফোন রেখে দিয়ে সে নদীর দিকে চেয়েছিল। নদীর ওপর মুষলধারে বৃষ্টি, সে কী অপরূপ দৃশ্য। নৌকোগুলো নদীতে আর নেই, পারে এসে নোঙর করেছে। শুধু একটা নৌকো এখনও নোঙর করতে পারেনি, ঢেউয়ের ধাক্কায় টলতে টলতে পারের দিকে আসার চেষ্টা করছে। বৃষ্টি দেখতে দেখতে আদিত্য আবার মোবাইলটা তুলে নিল। অসীমাভ রায়কে একটা ফোন করতে হবে।

‘একটা ছোট প্রশ্ন ছিল তাই আবার বিরক্ত করতে হচ্ছে।'

‘ঠিক আছে। বলুন।'

‘বনানী দাস কি কোর্টে গিয়ে আপনার কাছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ চেয়েছিল?' ‘একটু হোল্ড করুন। আমি পাশের ঘরে গিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলছি।' আদিত্য আন্দাজ করল অসীমাভ রায়ের কাছে রুগি আছে।

‘বিরাট কমপেনসেশন চেয়েছিল। বেশ কয়েক কোটি টাকা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কিছুই পায়নি। কারণ কোনওভাবেই আমার নেগলিজেন্স বা কোনও ম্যালাফাইড ইনটেনশন প্রমাণ করা যায়নি।'

‘আচ্ছা, এমন কি হতে পারে ওই কমপেনসেশনের টাকাটা বনানী ব্ল্যাকমেল করে তুলতে চায়?'

‘ঠিক বলতে পারব না। আমি এভাবে কখনও ভেবে দেখিনি।'

'ব্ল্যাকমেলারের কাছ থেকে আর কোনও চিঠি পেলেন?'

‘এখন অব্দি পাইনি। আপনি কবে ভর্তি হচ্ছেন?'

‘আমাকে এক সপ্তাহ সময় দিন। না হলে আপনার কেসটা একেবারে ঘেঁটে যাবে। প্লিজ।'

'দেখুন, ডাক্তার হিসেবে আমি বলব আপনার কালই ভর্তি হওয়া উচিত। আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা কিন্তু একেবারে সময় দেয় না।'

'অন্তত তিন দিন সময় দিন। আমি তার মধ্যেই একটু গুছিয়ে নিতে পারব।' —ঠিক আছে। আজ বুধবার। আপনি আগামী রবিবার সকালে হার্টকেয়ারে ভর্তি হচ্ছেন। আমি বলে রাখব।'

'তাই হবে। সেটাই ঠিক রইল।'

মোবাইল রেখে আদিত্য ঘড়ি দেখল। মাত্র সোয়া চারটে। অঝোরে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। আকাশ মেঘে ঢাকা বলে এর মধ্যেই দিনের আলো নিবে এসেছে। শেষ নৌকোটাও তীরে এসে পৌঁছল। নদীতে আর কোনও নৌকো নেই। হঠাৎ আদিত্য দেখতে পেল নদীর ধারে দু'তিনটে টর্চের আলো মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে। মনে হয় মোবাইলের টর্চ। যে নৌকোটা একটু আগে পারে এসে ভিড়ল তার কাছে তিনটে লোক ঘোরাফেরা করছে। এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ওরা কী করছে? এত দূর থেকে ওদের ভাল দেখা যাচ্ছে না। তবু আদিত্যর মনে হল এরা সেই তিনটে লোক যারা দুপুরবেলা সাগরিকা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে ডাব খাচ্ছিল। লোকগুলো আদিত্যদের কটেজের দিকেই এগিয়ে আসছে। পাকা রাস্তায় উঠতে চায় নিশ্চয়। আরও খানিকটা এগিয়ে আসার পর তিনজনকেই পরিষ্কার দেখা গেল। আদিত্য নিশ্চিত, এর সেই তিনজনই বটে। দুটো লোক হাতে দুটো মাঝারি সাইজের বাক্স বহন করে নিয়ে আসছে। তৃতীয়জন, যাকে আদিত্যর চেনা মনে হয়েছিল, খালি হাতে পেছন পেছন আসছে। আর চারদিকে নজর রাখছে। আদিত্য আবার ভাল করে এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখল। আদিত্য নিশ্চিত সে একে আগে কোথাও দেখেছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে এবারেও মনে পড়ল না লোকটাকে কোথায় দেখেছে। আদিত্যদের কটেজে পৌঁছনোর আগেই লোকগুলো পাকা রাস্তার দিকে বেঁকে গেল।

'চা করবে নাকি?' ঘরের ভেতর থেকে কেয়ার গলা। কেয়ার ঘুম ভেঙে গেছে।

(৪)

অশনি রায় দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। চার-পাঁচ মিনিট হয়ে গেল। খুব ছোটবেলায় আদিত্য একবার বাবার সঙ্গে হ্যামলেট দেখতে গিয়েছিল। বাংলায় হ্যামলেট। সম্ভবত কোনও গ্রুপ থিয়েটার অ্যাকাডেমিতে নাটকটা মঞ্চস্থ করেছিল। কোন দল আদিত্যর মনে নেই। নাটকটারও বিশেষ কিছু মনে নেই। শুধু মনে আছে হ্যামলেটকে যখন প্রথম দেখাচ্ছে তখন বেশ কিছু সময় ধরে হ্যামলেটের কোনও ডায়লগ ছিল না। সে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রক্ষীদের কথা শুনছিল যারা রাত্তিরে দুর্গ পাহারা দিতে গিয়ে তার বাবার প্রেতাত্মাকে দেখেছে। অশনি রায়কে দেখে ছোটবেলার সেই হ্যামলেটের কথা মনে পড়ে গেল। অশনি কি লজ্জা পেয়েছে? নাকি লজ্জা পাওয়ার অভিনয় করছে? মানসিকভাবে যারা স্থিতিশীল নয় তাদের কি এইরকম নাটকীয় প্রতিক্রিয়া হয়?

একটু আগে আদিত্য অশনি রায়কে ছবিগুলো দেখিয়েছে। ছবিগুলো দিয়ে তার বাবাকে যে কেউ ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে সেকথাও জানিয়েছে। তার পর থেকে অশনির এই অবস্থা ।

আদিত্য জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। বেলা এগারোটার ব্যস্ত কলকাতা। বাসে ভীড়। মানুষ ভীড় করে রাস্তা পার হচ্ছে। একটি যুবক বেশ কিছুক্ষণ দৌড়ে একটা ধাবমান ট্র্যামে উঠে পড়ল। সে উঠতে পারবে কিনা তাই নিয়ে আদিত্যও দু'এক মিনিটের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। নিজের দলের স্ট্রাইকার বল নিয়ে বিপক্ষ দলের পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ঢুকে পড়লে যেমন উৎকণ্ঠা হয়। আদিত্য মনে মনে ছেলেটিকে সমর্থন করছিল আর চলমান ট্র্যামটাকে বিপক্ষ দল মনে করছিল। ছেলেটি ট্র্যামে উঠে পড়ার পর আদিত্য আবার তার অফিসের ভেতরের বাস্তবতায় ফিরে এল। অশনি রায় এখনও দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে।

'অশনিবাবু, আমি বুঝতে পারছি এই ব্যাপারটা আপনাকে কতটা বিচলিত করেছে।'

আদিত্য দু'পা হেঁটে গিয়ে অশনির পিঠে হাত রাখল। 'কিন্তু আমাদের হাতে একেবারে সময় নেই। একদিকে তো এই ব্ল্যাকমেলার যে কোনও সময় টাকা চাইতে পারে। অন্যদিকে, হয়ত আপনার বাবা আপনাকে বলেছেন, আমি কয়েকদিনের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছি। তার মানে বেশ কিছুদিন অকেজো হয়ে যাব। তাই এখন চেষ্টা করছি, যতটা কাজ এগিয়ে রাখা যায়। আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। আপনি যদি একটু কষ্ট করে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারেন, আমার কাজের খুব সুবিধে হয়।'

দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে। সম্ভবত শ্যামল। চা এনেছে। আদিত্য গলা চড়িয়ে বলল, 'ভেতরে এস। খোলা আছে।

শ্যামল কেটলি থেকে আদিত্যর ফ্লাস্কে চা ঢেলে দিয়ে চলে গেল। শ্যামলের পায়ের শব্দ পেয়ে অশনি মুখ তুলে তাকিয়েছে। শ্যামল চলে যাবার পর আদিত্য দুটো কাপে চা ঢালল। একটা কাপ অশনির সামনে রেখে অন্য কাপটা হাতে নিয়ে উল্টোদিকে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। একটু কড়া গলায় বলল, 'এবার আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।'

'বলুন, কী জিজ্ঞেস করবেন।' অশনির গলায় একরাশ ক্লান্তি রয়েছে।

'প্রথম প্রশ্ন, আপনার সঙ্গে যে মহিলার ছবি পাঠানো হয়েছে সেই মহিলা কি রূপলেখা দত্ত হতে পারেন?'

প্রশ্নটা শুনে অশনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর গলা নামিয়ে দৃঢ় গলায় বলল, 'ছবির ওই মহিলা রূপলেখা ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।'

'আপনার কথা যদি সত্যি বলে ধরে নিই তাহলে অন্তত তিনটে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।' আদিত্য গলায় পেশাদারি গাম্ভীর্য এনে বলল। 'প্রথম সিদ্ধান্ত, ছবিগুলো জাল নয়। অর্থাৎ একটা মুখের সঙ্গে অন্য কারও শরীর জুড়ে দিয়ে তৈরি হয়নি। মানে, মুখ এবং শরীর দুটোই আপনার। ছবিগুলো জাল কিনা দেখার জন্যে অবশ্য ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছে।'

'দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত?' অশনি কিছুটা অসহিষ্ণু গলায় প্রশ্ন করল।

'দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, আপনার সঙ্গে রূপলেখার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল। ঠিক বলছি তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলছেন। আমি তো আগেই সে কথা স্বীকার করেছি।— অশনি মৃদু গলায় বলল।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের এখন ডিটেলগুলো জানা দরকার। কোথায়? কখন? কত ফ্রিকোয়েন্টলি?'

'আমাদের আলাপ হবার মাস তিনেক পর থেকে রাজারহাটের একটা বাড়িতে আমরা নিয়মিত মিলিত হতাম।'

'বাড়িটার সন্ধান পেলেন কী করে?'

'আমি পাইনি। রূপলেখাই আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, বাড়িটা ওর এক বন্ধুর। সেই বন্ধু স্বামীর সঙ্গে দুবাইএ থাকে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চাবিটা রূপলেখাকে দিয়ে গেছে।'

'বাড়িটার এক্স্যাক্ট লোকেশানটা আমার জানা দরকার। ঠিকানাটা জানতে পারলে আরও ভাল হয়।'

'ঠিকানা তো জানি না। আর এক্স্যাক্ট লোকেশানটাও এতদিন পরে ভুলে গেছি। অ্যাক্সিস মল-এ পৌঁছে মূল রাস্তা থেকে বাঁদিকে টার্ন নিতে হতো। তারপর রাইট টার্ন নিয়ে আবার বোধহয় লেফট টার্ন। আবার রাইট। বেশ কমপ্লিকেটেড। এতদিন পরে মনে রাখা সম্ভব নয়।

'আচ্ছা, আপনারা যখন ওই বাড়িটাতে নিয়মিত যেতেন, তখন ওখানকার কোনও সিকিউরিটি বা দরোয়ান নিশ্চয় আপনাদের মনে রেখেছিল?'

'হ্যাঁ সেটা অসম্ভব নয়। যতদূর মনে পড়ে গেটে একটা দারোয়ান থাকত। সে হয়ত আমাদের মনে রেখেছিল।'

'তাই যদি হয়, আপনার মামলা চলার সময় লোকটাকে খুঁজে বার করেননি কেন? লোকটা হয়ত আপনার হয়ে সাক্ষী দিতে পারত। বলতে পারত, যে মহিলা খুন হয়েছেন তাঁর সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই।'

অশনি চুপ করে আছে। উত্তর খুঁজছে। শেষে বলল, 'আমার বাবার কথা ভেবে লোকটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করিনি। একজন বিবাহিত মহিলার সঙ্গে আমি নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছি জানতে পারলে বাবা ভীষণ দুঃখ পেত। বাবাকে দুঃখ দিতে চাইনি। বাবা ভীষণ কনজারভেটিভ।'

'কিন্তু মামলা চলার সময় আপনার সঙ্গে একজন বিবাহিত মহিলার সম্পর্কের কথাটা তো আপনার বাবা তো জানতেই পারলেন। সেক্ষেত্রে আর একটু জানাতে কী ক্ষতি ছিল?'

'বাবা জানতেন আমার সঙ্গে রূপলেখার একটা প্লেটনিক সম্পর্ক ছিল। তার বেশি আর কিছু নয়।'

'আচ্ছা আপনি কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন ছবির এই মহিলাই আপনার পরিচিত রূপলেখা দত্ত?'

অশনি কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'রূপলেখার বুকের বাঁদিকে একটা বড় কালো তিল ছিল।'

আদিত্য ভাবনায় ডুবে আছে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অশনি রায় জিজ্ঞেস করল, "আর তৃতীয় সিদ্ধান্ত?'

'হ্যাঁ। তৃতীয় সিদ্ধান্ত হল, যে মহিলা রূপলেখা দত্ত নাম নিয়ে আপনার সঙ্গে ভাব করেছিল, তার অভিপ্রায় বা চরিত্র কোনওটাই ভাল ছিল না। নাহলে এই ছবিগুলো সে তোলাবে কেন? তোলাবার প্রবৃত্তি হবে কেন? তার সাহায্য ছাড়া ছবিগুলো তোলা সম্ভব হতো না। অর্থাৎ ছবিগুলো যে তোলা হচ্ছে সেটা সে জানত। ফ্ল্যাটের চাবি তো তার কাছেই থাকত। সে নিশ্চয় আগে থেকে ওই ফ্ল্যাটে একজন ফটোগ্রাফারকে ঢুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে, এতদিন পরে সে ছবিগুলো দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে কেন? কেন সে ছ'বছর আগে এই চেষ্টাটা করেনি?'

আদিত্য আবার ভাবনায় ডুবে গেছে। তাকে বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক দেখে অশনি রায় বলল, 'আজ তাহলে উঠি? আমার শরীরটা বিশেষ ভাল লাগছে না।'

'উঠবেন? ঠিক আছে, উঠুন।' আদিত্য অন্যমনস্কভাবে বলল। তারপর অশনি রায়কে উঠে পড়তে দেখে আদিত্য আবার বলল, 'আচ্ছা, আপনি যে দুপুরবেলা রূপলেখা দত্তর সঙ্গে দেখা করতেন, আপনি অফিস থেকে বেরতেন কী ভাবে? বেসরকারি অফিসে ওইভাবে নিয়মিত বেরোনো যায় নাকি?'

'আমি ইন্সপেকশনে যাচ্ছি বলে বেরোতাম।' অশনি রায় আবার বসে পড়েছে। 'যে বাড়িটাতে আমরা দেখা করতাম তার কাছেই একটা রিয়াল এস্টেট প্রজেক্ট চলছিল। আমাদের ব্যাঙ্ক ওটা ফাইনান্স করেছিল। ওখানে ইন্সপেকশনে যেতে হতো। ফেরার পথে ওই বাড়িটাতে যেতাম। ওখানে রূপলেখা আমার জন্য অপেক্ষা করত।'

'যে প্রজেক্টটা আপনি ইন্সপেকশন করতে যেতেন সেটা কোথায়?

'আমার খুব ভাল মনে নেই। জানেন তো গত তিন বছরে আমার মাথার ভেতরটা ওলোটপালোট হয়ে গেছে। যতদূর মনে পড়ছে, অ্যাক্সিস মল থেকে ডান দিকে বেঁকে মিনিট পঁচিশ যেতে হতো। বাড়িটার নাম বোধহয় শান্তি আলয় বা শান্তি নিকেতন বা ওই ধরনের একটা কিছু। একুশতলা বাড়ি। এতদিনে নিশ্চয় কমপ্লিট হয়ে গেছে।' 'আর যে বাড়িটাতে আপনি রূপলেখা দত্তর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন সেটা কত তলা?'

'যত দূর মনে পড়ছে দোতলা। তিনতলাও হতে পারে।' অশনির গলায় অস্বস্তি। অশনি কি কিছু লুকোবার চেষ্টা করছে?

বিকেলের দিকে অসীমাভ রায়ের ফোন এল।

'ব্ল্যাকমেলার আবার যোগাযোগ করেছিল। এবার কুরিয়ারে চিঠি পাঠিয়েছে। লিখেছে, আজ রাত্তির এগারোটার সময় লেক কালীবাড়ির উল্টো ফুটপাথে যে ভ্যাট মানে ময়লা ফেলার জায়গাটা আছে সেখানে দু'হাজার টাকার নোটের পাঁচটা বাণ্ডিল, এক-একটা বাণ্ডিলে দু'লাখ টাকা করে, মোট দশ লাখ টাকা একটা মুখ বন্ধ গারবেজ ব্যাগে ভরে ফেলে আসতে হবে। মুখটা বন্ধ করতে হবে সাদা ফিতে জড়িয়ে, যাতে অনেক

ব্যাগের মধ্যে এই ব্যাগটাকে আলাদা করে চেনা যায়। পুলিশে খবর দিলে পরের দিনই ওই ছবিগুলো নানা জায়গায় পৌঁছে যাবে। বলুন কী করব।'

"'টাকাটা তৈরি রাখুন। আমি একটু খোঁজ-খবর নিয়ে বলছি কী করতে হবে।' আদিত্য ফোন কেটে দিয়ে সুভদ্র মাজির নম্বরটা লাগাল।

'আজ সন্ধে বেলা ফ্রি আছ?'

'সাড়ে পাঁচটা অব্দি লালবাজারে একটা মিটিং আছে দাদা। খুব বেশি হলে ছ'টা অব্দি চলবে। তারপর ফ্রি।'

'নো প্রবলেম। আমার কাজটা রাত্তিরে। অবশ্য তার আগে কিছু তোড়জোড় করতে হবে। এটা সেই ব্ল্যাকমেলের ব্যাপারটা। সেই যে তোমাকে ছবি পাঠালাম, মনে আছে?' 'খুব মনে আছে। আমি ছবিগুলো ফরেনসিকে পাঠিয়েছিলাম। ওরা বলছে ছবিগুলো জেনুইন।'

'তুমি নিজে ছবিগুলো ভাল করে দেখেছ?'

'ওরকম নোংরা ছবি আর কী দেখব দাদা?' সুভদ্র মনে হয় লজ্জা পেয়েছে। 'নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখবে। প্রফেশানালের দৃষ্টিতে দেখবে। সেরকম ভাবে দেখেছ কি?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাইছেন।'

'বলতে চাইছি, তুমি যদি ভাল করে ছবিগুলো দেখতে, তাহলে একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করতে। দেখতে, ছবিতে অশনি রায় ডান হাতে ঘড়ি পরে আছে। কিন্তু অশনি তো ডান হাতে ঘড়ি পরে না। তোমার-আমার মতই বাঁ হাতে পরে। তা হলে ওই সময় সে ডান হাতে ঘড়ি পরল কেন?'

'জানি না, দাদা। ভাবতে হবে।'

'যাই হোক, ছবির অন্যতম চরিত্র অশনি রায় কনফার্ম করেছে যে ছবিগুলো আসল । অতএব ছবিগুলোর জেনুইননেস নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু আপাতত সমস্যাটা অন্য। ব্ল্যাকমেলার পত্র দিয়ে জানিয়েছে যে আজ রাত্তির এগারোটায় লেক কালীবাড়ির উল্টো ফুটপাতে দশ লাখ টাকা রেখে না এলে সে সব কিছু ফাঁস করে দেবে। এই ব্ল্যাকমেলারটিকে ধরার ব্যাপারে তোমার এবং তোমার দু'চারজন কনস্টেবলের সাহায্য চাই।'

'নো প্রবলেম দাদা । আপনি শুধু বলে দেবেন কী করতে হবে। আমি ফোর্স জোগাড় করে রাখব।'

'আর একটা ব্যাপার। রাজারহাটে অ্যাক্সিস মলের কাছে শান্তি আলয় বলে একটা একুশতলা হাইরাইজ উঠেছে। অশনি রায়ের ব্যাঙ্ক প্রজেক্টটা ফাইন্যান্স করেছিল। খোঁজ নিতে পারবে আট-নয় বছর আগে এই শান্তি আলয়ের আশেপাশে বাড়ি কী কী ছিল? আমার ধারণা সাত-আট বছর আগে ওই অঞ্চলে খুব বেশি বাড়ি হয়নি। তোমাকে খুব একটা খুঁজতে হবে না। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। তুমি আরও খোঁজ নিও অশনি রায়ের ব্যাঙ্ক সম্প্রতিকালে রাজারহাট অঞ্চলে আর কী কী হাউসিং প্রজেক্ট ফাইন্যান্স করেছিল। বিশেষ করে দেখবে রবীন্দ্র তীর্থ পেরিয়ে খানিকটা এগোলে বাঁ দিকের একটা রাস্তায় সল্ট অ্যান্ড পেপার বলে একটা ক্যাফে আছে। খোঁজ নিও ওই অঞ্চলে অশনি রায়ের ব্যাঙ্ক কোনও রিয়াল এস্টেট প্রজেক্ট ফাইন্যান্স করেছিল কিনা।'

'এটা কি নতুন কোনও কেস?'

'আরে না, না। এই ব্ল্যাকমেলিং-এর কেসটায় ওই বাড়িটার একটা ভূমিকা আছে। আজ রাত্তিরে তোমার সঙ্গে দেখা হলে সব খুলে বলব।'

লেক কালীবাড়ি শনিবার বাদ দিয়ে অন্যান্য দিন রাত ন'টায় বন্ধ হয়ে যায়। শনিবার খোলা থাকে রাত্তির সাড়ে বারোটা অব্দি। আজ বুধবার। তাই মন্দির ন'টায় বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দির বন্ধ হবার আধঘন্টার মধ্যে অঞ্চলটা ফাঁকা। আরও ঘন্টাখানেক পরে যখন সুভদ্রকে নিয়ে আদিত্য লেক কালী মন্দিরের কাছাকাছি

পৌঁছল তখন দু'দিকের ফুটপাত রীতিমত শুনশান। শুধু মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভেঙে রাস্তা দিয়ে দু'একটা গাড়ি যাচ্ছে।

আদিত্যদের গাড়িটা জায়গা নিয়েছে লেক ভিউ রোডে একটা উঁচু বাড়ির পার্কিং লটে। ব্যবস্থাটা সুভদ্র আগেই করে রেখেছিল। এখান থেকে কালীবাড়ির উল্টো ফুটপাতের ভ্যাটটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলো কালো কালো গারবেজ ব্যাগ পড়ে রয়েছে। আশে পাশের হাইরাইজ গুলোর জঞ্জাল। মনে হয় কাল ভোরে কর্পোরেশনের গাড়ি এসে ময়লা নিয়ে যাবে। সম্ভবত আদিত্যদের মতো আরও কেউ ভ্যাটের দিকে নজর রাখছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখা গেল গোলপার্কের দিক থেকে একটা আকাশী নীল হন্ডা অ্যাকর্ড সাদার্ন অ্যাভিনিউ ধরে এগিয়ে আসছে। ভ্যাটের সামনে এসে গাড়িটা থেমে গেল। পেছনের দরজা দিয়ে অসীমাভ রায় বেরোলেন। হাতে একটা কালো গারবেজ ব্যাগ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে গারবেজ ব্যাগটা অসীমাভ রায় ভ্যাটের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন। অনেকগুলো ব্যাগের মধ্যে অসীমাভ রায়ের ব্যাগটা মিশে গেল। অসীমাভ রায় গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

এর পরের পঞ্চাশ মিনিট তেমন কিছু ঘটল না। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা ক্রমশ কমতে লাগল। কয়েকটা কুকুর খাদ্যের সন্ধানে আঁস্তাকুড়ে ঢুকে পড়ল। তাদের মধ্যে বোধহয় বেপাড়ার দু'একজনও ঢুকে পড়েছিল। ফলে রাত্রির স্তব্ধতা খানখান করে মিনিট দশেক কুকুরদের ঝগড়াঝাঁটি চলল। কিছু মশা আদিত্যদের গাড়ির জানলা খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। তারা মনের সুখে আদিত্যদের কামড়ে যাচ্ছিল। অন্ধকারে মশাদের দেখা যাচ্ছিল না, ফলে মারাও যাচ্ছিল না।

আদিত্যর ঝিমুনি আসছিল। হঠাৎ দেখল কালীবাড়ির দিক থেকে রাস্তা পার হয়ে একটা পাগল বা ভিখিরি আঁস্তাকুড়ের দিকে এগোচ্ছে। আদিত্য তার পাশে বসা সুভদ্রকে চাপা গলায় বলল, "এই মনে হচ্ছে আমাদের লোক।'

লোকটা আঁস্তাকুড়ের ভিতরে ঢুকে কিছু একটা খুঁজছে। অসীমাভ রায়কে বলা ছিল সে যেন এমন ভাবে গারবেজ ব্যাগটা ভ্যাটের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে যাতে ওটা খুঁজে পেতে কিছুটা সময় লেগে যায়। ওই সময়ের মধ্যে লুকোনো জায়গা থেকে পুলিশরা লোকটার কাছে চলে আসতে পারবে ।

ঠিক ব্যাগটা খুঁজে পেতে লোকটার মিনিট তিন-চার লেগে গেল। ব্যাগটা হাতে নিয়ে সে রেলিং টপকে রবীন্দ্র সরোবরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সুভদ্র চাপা গলায় বলল, 'চিন্তা নেই দাদা। ওদিকেও আমাদের লোক আছে।'

আদিত্যরা গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। লোকটা মাঠ পেরিয়ে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের দিকে এগোচ্ছে। আদিত্যরা দ্রুত রাস্তা পার হল। অন্ধকারে একটা কালো কোয়ালিস দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা গাড়ির কাছে পৌঁছে ব্যাগটা জানলা দিয়ে ভেতরে চালান করে দিল। আর ওমনি যেন মাটি ফুঁড়ে চারটে পুলিশ গাড়ির সামনে এসে হাজির। পুলিশ দেখেই গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে। যে দু'জন পুলিশ গাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল তারা ভয় পেয়ে সরে গেল। নাহলে গাড়িটা তাদের ধাক্কা দিয়ে চলে যেত। কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না। একটা পুলিশের ভ্যান গাড়ির রাস্তাটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

যে লোকটা আঁস্তাকুড় থেকে টাকার ব্যাগটা তুলে এনেছিল সে চুনোপুঁটি। যে তাকে নিয়োগ করেছিল সে গাড়ির ভেতরে বসে ছিল। পুরোনো পাপী। পুলিশের খাতায় নাম আছে। একাধিক নাম। শ্রীকৃষ্ণ, কানু, অসগর। কিন্তু থার্ড ডিগ্রি করেও তার কাছ থেকে জানা গেল না ছবিগুলো সে কোথায় পেয়েছে। সে বলছে, ছবি-টবির কথা সে কিছুই জানে না। তার কাজ ছিল টাকাটা নিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া।

'কোথায় পৌঁছে দেবার কথা ছিল?' সুভদ্র স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করেছিল। 'কোথাও না। এখন টাকাটা আমার কাছেই রেখে দেবার কথা ছিল। পরে আমার কাছ থেকে কেউ এসে টাকাটা নিয়ে যেত। কবে

আসবে কিছু বলেনি।'

'কে এসে টাকা নিয়ে যেত?'

'আমাকে যে কাজটা করতে বলেছিল, তার লোক।'

'কে তোমাকে কাজটা করতে বলেছিল?'

'আমি তাকে চিনি না। টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা হয়েছিল।'

আবার কিছু থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করা হল। উত্তর মেলে না। কিছু পরে আবার থার্ড ডিগ্রি। আদিত্যর অসুস্থ লাগছিল। বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর কানু জানাল কানা মুমতাজ বলে একজন কুখ্যাত অপরাধী এই ব্ল্যাকমেলিং-এর পেছনে আছে। সে-ই কানুকে নিয়োগ করেছে। টাকাটা মুমতাজের হাতে নিরাপদে তুলে দিতে পারলে কানু পাবে এক লাখ। বাকিটা কানা মুমতাজ। অন্তত কানু তাই বলছে।

বেশ কিছুদিন হল মুমতাজকে পুলিশ খুঁজছে। সে দেশে আছে নাকি বিদেশ থেকে ব্যবসা চালাচ্ছে সেটাও পুলিশ জানে না। মুমতাজের মূল ব্যবসা মধুকুঞ্জ এবং ব্রথেল চালানো। কলকাতায় তার অনেকগুলো ব্রথেল আছে। তাছাড়া মেয়ে পাচারের ব্যবসার সঙ্গেও মুমতাজ জড়িত। মূলত মিডল ইস্টে সে মেয়ে সাপ্লাই করে। কিন্তু কানুর কথা যদি সত্যিও হয়, কানা মুমতাজ কোথা থেকে এই ছবিগুলো পেল সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

বেশ কয়েকবার থার্ড ডিগ্রির পরে কানু যখন ধুঁকছে, যখন নতুন আর কোনও তথ্য পাবার কোনও আশাই নেই, তখন আদিত্য সুভদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি এবার বাড়ি যাব। কাল খুব ভোরে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।'

সুভদ্র এত অবাক হয়ে গেছে যে কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

রাস্তায় এসে আদিত্যর মনে পড়ল তার হাসপাতালে ভর্তি হবার ব্যাপারটা কেয়াকেও বলা হয়নি। বললে অবশ্য কেয়া তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দিত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১)

দুপুর সাড়ে বারোটায় আদিত্যর অ্যাঞ্জিওগ্রাফি হল। আজকাল কব্জির ধমনী দিয়ে হার্ট পর্যন্ত একটা ক্যাথেটর ঢুকিয়ে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা হয়, আগে নাকি কুঁচকি দিয়ে ঢোকান হত। যাই হোক, পুরো প্রসিডিওরটাই হল লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে, আদিত্যর জ্ঞানে। অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করতে করতে অসীমাভ রায় বলে দিলেন, দুটো মেজর ব্লক আছে, একটা বাঁ দিকে, একটা ডান দিকে। বাঁ দিকেরটা সিরিয়াস, নাইনটি পার সেন্ট ব্লক। দুটো ব্লকেই বেলুন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে স্টেন্ট বসাতে হবে। আদিত্যর যদি আপত্তি না থাকে এই ইন্সারশানেই সেটা করে ফেলা যেতে পারে। তবে আদিত্য তো এই অবস্থায় সই করতে পারবে না, তাই কনসেন্টটা ওর স্ত্রীকেই দিতে হবে।

আদিত্যর আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। সে সেই কথা অসীমাভ রায়কে বলল। অসীমাভ রায় আদিত্যর সম্মতির কথাটা কেয়াকে জানিয়ে তার কনসেন্ট আদায় করার জন্য ওটি থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ আগে আদিত্যকে যখন ওটিতে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন ক্ষণিকের জন্য কেয়ার মুখটা দেখতে পেয়েছিল আদিত্য। কেয়াকে চেনাই যাচ্ছে না। ভাল করে চুল আঁচড়ায়নি, শাড়িটাও একেবারে ক্রাশড। তার ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে।

আগের রাত্তিরে আদিত্য যখন কেয়াকে তার অসুখের কথা বলল, কেয়া প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায়নি। ভাবছিল আদিত্য মজা করছে। একটু পরে কেয়া বুঝতে পারল আদিত্য মোটেই মজা করছে না। সেই থেকে তার চেহারা, চরিত্র সব কিছু বদলে গেছে। আদিত্য এই প্রথম উপলব্ধি করল কেয়া তার ওপর মানসিক ভাবে কতটা নির্ভর করে। তার নিজের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। কেয়ার কথা না ভেবে সে দিনের পর দিন ধূমপান চালিয়ে গেছে। তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সত্যিই কোনও ক্ষমা নেই।

আদিত্য কেয়াকে অনেকবার বোঝাতে চেষ্টা করছিল, হার্টের অসুখটা আজকাল কোনও ব্যাপারই নয়। কেয়ার একটাই কথা, 'তোমার কিছু হয়ে গেলে আমি নিজেকে শেষ করে দেব ।

ছেলেমানুষি কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু কথাগুলোর পেছনে যে প্রচণ্ড আবেগের ধাক্কাটা আছে, তাকে অবজ্ঞা করা আদিত্যর পক্ষে অসম্ভব।

বেলুন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হল, বুকের দু'দিকে দুটো স্টেন্ট বসল। পুরোটাই লোকাল দিয়ে, আদিত্যর জ্ঞানে। ভাল মাত্রায় সিডেটিভ দিয়েছিল বলে আদিত্য আচ্ছন্ন হয়ে শুয়েছিল। তার শরীরের ভেতরে কী ঘটছে সেটা একটা মনিটরে পরিষ্কার দেখা গেলেও সে কিছুই দেখছিল না। দেখতে ইচ্ছেও করছিল না। পুরো ব্যাপারটা শেষ হতে কতক্ষণ লাগল আদিত্য ঠিক বলতে পারবে না কারণ সিডেটিভের প্রভাবে তার সময়বোধ লুপ্ত হয়েছিল। বস্তুত, চোখ বুঝে শুয়ে থাকতে থাকতে আদিত্য প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। শুধু মাঝে মাঝে টের পাচ্ছিল তার শরীরের ভেতরে কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে। তবে জ্বালা-যন্ত্রণা তেমন নেই।

যেহেতু সব কিছুরই শেষ আছে, একটা সময় এই আসুরিক প্রক্রিয়াগুলিও শেষ হল। আধা জাগ্রত অবস্থায় আদিত্য টের পেল তাকে ওটির বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যেতে যেতে কয়েকটা চেনা মুখ তার চোখে পড়ল গৌতম-মালিনী, সুভদ্র মাজি, তাদের নতুন ড্রাইভার মনোজ হালদার। কিন্তু কেয়ার মুখটা দেখতে পাচ্ছিল না বলে আদিত্যর খুব কষ্ট হচ্ছিল। তারপর তার চোখে পড়ল কেয়া নিজের ইস্কুলের কয়েকজন কলিগের সঙ্গে একধারে দাঁড়িয়ে। আদিত্যকে বেরোতে দেখে কেয়া দৌড়ে আসছে।

'ডাঃ রায় বলেছেন সব কিছু খুব ভাল ভাবে হয়ে গেছে। আর কোনও চিন্তা নেই।' কেয়ার মুখটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

কেয়ার বোধহয় আরও কিছু বলার ছিল, কিন্তু ততক্ষণে ঠেলাওলা আদিত্যর স্ট্রেচারটা ঠেলতে ঠেলতে দূরে নিয়ে চলে গেছে।

সেই দিনটা আদিত্যর ঘোরের মধ্যেই কাটল। পরের দিন বেলার দিকে তাকে এমন একটা ক্যাবিনে দিল যেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তা মানে রাসেল স্ট্রিট। হুস হুস করে গাড়ি যাচ্ছে, ট্যাক্সি যাচ্ছে, মাঝে মাঝে বিরাট ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে থাকছে। একধার দিয়ে স্কুটার, মোটরবাইকও যাচ্ছে। এমনকি দু'একটা সাইকেল। আদিত্য ঘোলাটে চোখে দেখছিল। যেন বাইরের পৃথিবীটা একেবারে অচেনা কোনও জায়গা। অথচ মাত্র দু'দিনই তো হয়েছে সে হাসপাতালে। বাথরুমে যাবার জন্যে উঠতে গিয়ে মাথাটা টলে গেল। সিডেটিভের প্রভাব এখনও যায়নি। আদিত্য খেয়াল করল তার শরীরে কোথাও কোনও ব্যথা নেই। শুধু কব্জিতে, যেখানে ফুটো করে ক্যাথেটার ঢোকানো হয়েছিল, সেখানে ব্যথা, ব্যান্ডেজ। নার্স ইঞ্জেকশান দিতে এসেছে। দুপুরে খাবার পর আদিত্য বেশ কয়েক ঘন্টা ঘুমোল। ঘুম থেকে উঠে চা-বিস্কুট খাচ্ছে, কেয়া ঘরে ঢুকল।

'শরীর কেমন?' কেয়াকে অনেকটা ফ্রেশ লাগছে।

'অপূর্ব। ফার্স্ট ক্লাশ।' আদিত্য একগাল হাসল। 'সেরে উঠেছি। বুকে-টুকে আর কোনও ব্যথা নেই।'

'দুপুরে খেয়েছিলে ভাল করে?'

'খেয়েছি। তারপর টানা ঘুমিয়েছি।'

'কী খেতে দিল?'

'ভাত, পাতলা মুসুরির ডাল, লাউএর তরকারি, মাছের ঝোল, টক দই। রাত্তিরে চিকেন দেবে বলেছে।' বলতে বলতে আদিত্য লক্ষ করল কেয়া সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে। 'সিঁদুর পরেছ? তুমি তো কখনও সিঁদুর পর না।' আদিত্য হাত বাড়িয়ে কেয়ার হাতটা ধরল।

'স্বামীর কল্যাণে পরতে হয়েছে। তোমার এখানে আসার আগে কালীবাড়িও গিয়েছিলাম।' কেয়া আদিত্যর খুব কাছে চলে এসেছে।

'কালীঘাটে গিয়েছিলে?'

'না, না। আমি কালীঘাটের কিছুই চিনি না। ঠনঠনে কালীবাড়ি গিয়েছিলাম। ওটা আমাদের পুরোনো কলেজ পাড়া। তাই চিনি।'

আদিত্য সিঁদুর পরাতেও বিশ্বাস করে না, কালীবাড়ি গিয়ে পুজো দেওয়াতেও নয়। কিন্তু কেয়া তার কল্যাণে সিঁদুর পরেছে, কালীবাড়িতে পুজো দিয়েছে, এটা ভাবলে কেয়ার জন্যে তার মনটা হু হু করে ওঠে।

হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে সে খানিকটা গম্ভীর গলায় বলল, 'এখানকার বিলটা কত হবে কিছু আন্দাজ পেয়েছ?'

'পুরোটা এখনও বলেনি। তবে এদের একটা প্যাকেজ আছে। আমরা সেটার সুবিধে নিতে পারব। আমাকে ডাঃ রায় বললেন, যদি আনফোরসিন কিছু না ঘটে তাহলে তোমাকে পরশুদিন ছেড়ে দেবেন। সেটা ধরে নিয়ে আমি নিচে অ্যাকাউন্টসে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওরা বলছে, সব মিলিয়ে সাড়ে চার পৌনে পাঁচ লেগে যাবে। এতটা লাগত না। কিন্তু ডাঃ রায়ের ফাঁটা মারাত্মক বেশি। উনি একটা পয়সা ছাড়েননি। সত্যি বলতে কী আমি একটু অবাক হয়ে গেছি। উনি তো তোমার মক্কেল। একটু কনসেশন দিতে পারতেন না?'

'কেন কনসেশন দেবেন? উনি তো জানেন টাকা দেবে ইনশিয়োরেন্স কম্পানি। বরং কম টাকা নিলেই ব্যাপারটা এমব্যারাসিং হতো। যাই হোক, আমাদের ইনশিয়োরেন্স তো পাঁচ লাখের। তার মধ্যে হয়ে যাচ্ছে।

ভাগ্যিস তোমাদের হেড মিস্ট্রেসের কথা শুনে হেলথ ইনশিয়োরেন্সটা করিয়ে রেখেছিলাম।' আদিত্য একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

'তা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এবছর এত ক্লেম থাকলে পরের বার প্রিমিয়ম বেশ বেড়ে যাবে। যাই হোক, তুমি কিন্তু ডাঃ রায়ের কাছ থেকে তোমার পুরো ফীটা নিও। এক পয়সাও ছেড় না।'

'সে দেখা যাবে। গৌতম-মালিনীকে তো দেখলাম। বিমল খবর পেয়েছে?' 'বিমল খবর পেয়েছে কিনা জানি না। গৌতম-মালিনী বলেছে কাল আবার আসবে। আজই আসবে ভেবেছিল, কিন্তু গৌতম কী একটা কাজে আটকে পড়েছে। আমাকে ফোন করেছিল।'

'আমার কোনও ফোন এসেছিল?' আদিত্যর মোবাইলটা কেয়ার কাছে আছে। 'দু'একটা আজেবাজে ফোন এসেছিল। ধার নেবে কিনা, ক্রেডিট কার্ড নেবে কিনা, মোবাইলের আরেকটা কানেকশন নেবে কিনা, এইসব। তবে একটু আগে একজন ফোন করেছিল। মহিলা। খুব বিপদের মধ্যে আছে মনে হল। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। আমি বললাম, উনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। চার-পাঁচ দিন পরে করবেন।'

'মহিলা? নাম বলেছিল?' আদিত্যর ভুরু দুটো কুঁচকে গেছে।

'নাম বলেছিল। কিছু একটা সাহা। অনামিকা? না। না। অনসূয়া? না অনসূয়াও নয়। বোধহয় অনন্যা। হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক। অনন্যা সাহা। বলল, তুমি বাঙ্গুরে ওদের বাড়িতে কিছুদিন আগে গিয়েছিলে। মনে করতে পারছ?'

আদিত্য মনে করতে পারছে।

সাতটায় ভিজিটিং আওয়ার শেষ। কেয়া চলে গেল। আদিত্য কাজ না পেয়ে টিভি খুলেছে। বাংলা খবরের চ্যানেল। দশ মিনিটে দশটা খবর দেবে বলছে। সবই জেলার খবর। আদিত্য টিভির দিকে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে ছিল। অ্যাঙ্কার মেয়েটি ঝড়ের গতিতে পরপর দশটা খবর পড়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুরে দুই যুযুধান রাজনৈতিক দলের বোমাবাজিতে সাধারণ মানুষ বাড়ি থেকে বেরতে পারছে না। হুগলির বলাগড়ে পারিবারিক দ্বন্দ্বের ফলে দুই ভাই আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। রাজ্যের ন্যায্য দাবিগুলি জানানোর জন্য অর্থমন্ত্রী আজ বিকেলে দিল্লি রওনা হয়েছেন। নদীয়ার ভাণ্ডারখোলা অঞ্চলে, তিনশ' বারো নম্বর হাইওয়ের ওপর, অভুক্ত কিছু গ্রামবাসী রাতের অন্ধকারে পাঁউরুটি ভর্তি একটা ট্রাক লুঠ করেছে। বাঁকুড়ার একাধিক পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক অদলবদলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে চারজন দুষ্কৃতি একটি নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে। শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত ডার্বি ম্যাচে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

অ্যাঙ্কার মেয়েটি এত তাড়াতাড়ি কথা বলছে যে আদিত্য খেই হারিয়ে ফেলছে। বিরক্ত হয়ে সে টিভি বন্ধ করে আবার চোখ বুঝল। চোখ বুঝলেও ঘুম আসছে না। কী করে আসবে? দুপুরে যা টানা ঘুমিয়েছে। তবু আদিত্য চোখ বন্ধ করে আছে। তার মনে হচ্ছে ওই খবরগুলোর মধ্যে একটা খবর আছে যেটা তার পক্ষে জরুরি। কিন্তু কোন খবরটা ঠিক মনে করতে পারছে না। হয়ত পরে মনে পড়বে। এখন মনটাকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার।

সকাল আটটা থেকে ন'টা একটা ভিজিটিং আওয়ার, আর একটা বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা। তবে কেয়ার কাছে একটা গোলাপী রঙের কার্ড আছে, সেটা দেখালে যখন খুশি তাকে আদিত্যর ঘরে ঢুকতে দেয়। কেয়া সকাল সাড়ে সাতটায় চলে এসেছিল। এখন তার গাড়ি হয়েছে, তাই যাতায়াতে অসুবিধে নেই। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হবার আগেই কেয়া বেরিয়ে গেল। তার ইস্কুলে কী যেন একটা বিশেষ কাজ আছে। বিকেলে আবার আসবে। কেয়া চলে যাবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আদিত্যর মনে হল দরজা দিয়ে একটা মুণ্ডু উঁকি মারছে। বিমল গায়েন।

‘স্যার আপনি এত অসুস্থ অথচ আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দেননি। আমি হয়ত তেমন কিছু করতে পারতাম না। কিন্তু ম্যাডামের সঙ্গে থেকে ফাইফরমাস তো খেটে দিতে পারতাম। দৌড়দৌড়ির কাজগুলো তো করে দিতে পারতাম। আপনি কি স্যার আমাকে আপন মনে করেন না?' বিমলের অভিযোগ আর ফুরোতেই চায় না।

‘শোনো, আমাকে হঠাৎ হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। কাউকেই খবর দিতে পারিনি।' বিমল একটু থামার পর আদিত্য শান্ত গলায় বলল। ‘তুমি জানলে কী করে আমি অসুস্থ?’

‘আমি আজ সকালে আপনাকে ফোন করেছিলাম। একটা খবর দেবার ছিল। তা, ফোনটা ম্যাডাম ধরলেন। তখনই জানতে পারলাম আপনি হাসপাতালে। জানতে পেরে সোজা এখানে চলে এসেছি। নাইট ডিউটি করে এখনও বাড়ি যাইনি। আপনি এখন কেমন আছেন স্যার?'

‘ভাল আছি। বিপদ একটা এসেছিল নিশ্চয়, কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা কেটে গেছে। ডাক্তারবাবুও বললেন খুব অঘটন না ঘটলে আগামীকাল ছেড়ে দেবেন। সপ্তাহ খানেক পরে মনে হয় আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারব।'

‘ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে স্যার, তবু বলব, সিগারেটটা এবার ছেড়ে দিন। ওটাই যত নষ্টের গোড়া।'

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটা তো ছেড়েই দিয়েছি। ডাক্তারবাবু বলছিলেন উত্তেজনা, টেনশান এইসব কমাতে হবে। কিন্তু আমার যা কাজ, ওগুলো তো থাকবেই।'

‘কাজ থেকে কিছুদিন ছুটি নিন না স্যার। ক'দিন কাজ না করলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?'

‘অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে গো। অনেক দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছি। দু'চারদিন জিরিয়ে নিয়ে আবার কাজে লেগে পড়তে হবে।' আদিত্য উদাস গলায় বলল। তারপর গলায় একটু উৎসাহ এনে বলল, ‘কী যেন একটা খবর দেবে বলছিলে?'

‘তেমন কিছু নয় স্যার। পরে বলব। এখন ওসব কথা বললে আপনি আবার ভাবতে বসবেন। সেটা আপনার শরীরের পক্ষে ভাল নয়।'

‘আরে বলই না। কী আর হবে। বড় জোর শুয়ে শুয়ে ভাবব। উঠে তো আর নাচানাচি করছি না।'

হাসপাতালের পোষাক পরে একটা লোক ঘরে ঢুকেছে। ‘চলে যান, এবার চলে যান। ভিজিংটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে।' বলতে বলতে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

‘বল। তোমার খবরটা বলে যাও।' আদিত্য তাগাদা লাগাল। সে জানে বিমলের আনা খবরে সাধারণত পদার্থ থাকে।

‘ঠিক আছে স্যার বলছি। আপনি বলতে বলছেন বলেই বলছি। আমি আপনার কথা ফেলতে পারি না। যাই হোক, আপনার নিশ্চয় মনে আছে কিছুদিন আগে আপনাকে সোমনাথ বাগ বলে একজনের খবর দিয়েছিলাম যে আগে বাঙ্গুর এভিনিউর ওই বাড়িটাতে সিকিউরিটির কাজ করত?’

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয় মনে আছে। তার সঙ্গে তো কথা বললাম এই সেদিন। কী হয়েছে তার?' আদিত্য কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

‘কী হয়েছে জানি না। যে খবরটা আপনাকে দিতে চাই সেটা হল, সোমনাথ বাগ তিরুপতি গার্ডস-এর চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। চাকরি ছেড়ে সে কোথায় যে গেছে কেউ বলতে পারছে না।'

‘চিন্তার কথা।’ আদিত্যর কপালে ঈষৎ ভাঁজ পড়েছে। ‘কিন্তু তুমি খবরটা পেলে কোথা থেকে?’

‘আসলে কী হয়েছে স্যার, মা দুর্গা সিকিউরিটিজ বলে আমি যে সিকিউরিটি কম্পানিটাতে কাজ করি সেখানে বাবলু বলে একজন কাজ করত। বাবলু মান্না। আমরা দু'জন একই বাড়িতে ডিউটি করতাম। এক সঙ্গে ডিউটি করতে করতে বাবলু আমার খুব বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। আমরা এক সঙ্গে টিপিন খেতাম, গেট পাহারা দিতাম। দু'একবার এক সঙ্গে সিনেমাও দেখেছি। তা, বাবলু হঠাৎ একদিন কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে

চলে গেল। মেদিনীপুরে ওর দেশ। বলল, দেশে একটা মুদির দোকান দেবে। পরের গোলামি করতে আর ভাল লাগছে না।'

'আরে বাবলু মান্নার কথা কে জানতে চাইছে? বাবলু মান্না নয়, আমি সোমনাথ বাগের কথা জানতে চাইছি। সময় নেই। তাড়াতাড়ি বল। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে। এক্ষুনি ওই লোকটা এসে তোমাকে বার করে দেবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি সোমনাথের কথাই বলছি স্যার। কিন্তু তার আগে বাবলুর কথাটা বলতে হবে।'

'ঠিক আছে তুমি তোমার মত করেই বল।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, অনেক দিন বাবলুর খবর রাখতাম না। তারপর এই দু'দিন আগে আবার ওর খবর পেলাম। শুনলাম ও কলকাতায় ফিরে এসেছে। দেশে মুদির দোকানটা তেমন চলেনি। আরও শুনলাম, কলকাতায় ফিরে ও তিরুপতি গার্ডস-এ চাকরি নিয়েছে। শুনেই মনে হল আগে জানলে ওর কাছ থেকেই সোমনাথ বাগের খবর নেওয়া যেত। যাই হোক, ওর সঙ্গে দেখা করলাম। অনেক দিন পরে দেখা অনেক কথা জমে ছিল। একথা সেকথার পর জিজ্ঞেস করলাম, সোমনাথ বাগকে চেন? তোমাদের কম্পানিতেই চাকরি করে। বাবলু বলল, কী করে চিনব? সে তো চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। তার জায়গাতেই তো আমি এসেছি। তাকে কখনও চোখেই দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সোমনাথ চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোথায় গেছে জান? বাবলু বলল, সেটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার। যা শুনলাম, সোমনাথ নাকি হঠাৎ একদিন এসে ম্যানেজারকে বলেছে সে আর চাকরি করবে না। তার যা পাওনা-গণ্ডা আছে সেটা যেন তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই কথা বলে সেই যে সে আপিস থেকে বেরিয়ে গেছে আর তার কোনও খবর কেউ পায়নি।'

'আরে আপনি এখনও ঘরে রয়েছেন? যান, এবার যান দয়া করে। ভিজিটিং আওয়ার অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে।' ইউনিফর্ম পরা লোকটা আবার ঘরে ঢুকেছে। যতক্ষণ না বিমল ঘর থেকে বেরোচ্ছে, ততক্ষণ সেও ঘর থেকে বেরোবে না ।

'নাঃ। এবার তুমি যাও। আমি একটু বিশ্রাম করি।' আদিত্য উদাস হয়ে বাইরে তাকাল। নীল আকাশ। সাদা মেঘ। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। আদিত্য ভাবছে। গভীরভাবে ভাবছে।

(২)

বাড়ি ফেরার তিন ঘন্টার মধ্যে আদিত্য অনন্যা সাহাকে ফোন করল। রেকর্ডেড মেসেজ জানাল নম্বরটা নেটওয়ার্কের বাইরে।

বেলা এগারোটা বেজেছে। কেয়া আজ ইস্কুলে যাবে না। রান্নাঘরে। আদিত্যর জন্য লাঞ্চ বানাচ্ছে। আদিত্য জানলার সামনে দাঁড়াল। সকালের গমগমে বাজার এখন ভেঙে যাবার মুখে। তবু দু'একজন কিছু বিক্রির আশায় এই শেষ বেলায় বেসাতি নিয়ে বসে আছে। পটল, বেগুন, কুমড়ো। কয়েক আঁটি কলমি শাক। কাঁচা লঙ্কা। কর্পোরেশনের জমাদার ঠেলাগাড়িতে ময়লা তুলছে। তার বেলচাতে শব্দ হচ্ছে শপ শপ। আদিত্যর মনে হল যেন বহু যুগ পরে সে এই পরিচিত দৃশ্যগুলো দেখছে। আসলে মাত্রই তিন দিন সে হাসপাতালে ছিল।

অনন্যা সাহার সঙ্গে আবার যোগাযোগের চেষ্টা করল আদিত্য। নম্বরটা এখনও নেটওয়ার্কের বাইরে। ল্যাপটপে উলহাস কাসালকারের দেবগিরি বিলাওল লাগাল। বন্দিশটা গুড়ের মতো মিষ্টি। আদিত্য সব কিছু ভুলে মিনিট পাঁচেক গানের মধ্যে ডুবে ছিল। হঠাৎ টেলিফোন। সুভদ্র মাজি।

'রাজারহাটের ওই বাড়িটার খবর নিয়েছিলাম দাদা। সাত-আট বছর আগে শান্তি আলয়ের আশেপাশে কোনও বাড়িই ছিল না। গত দু'তিন বছরে ওখানে শান্তি আলয় ছাড়াও কয়েকটা হাইরাইজ হয়েছে।

‘আচ্ছা, রাজারহাটে অন্য কোনও হাইরাইজ কি অশনির ব্যাঙ্ক ফাইন্যান্স করেছিল?' 'আপনি একদম ঠিক ধরেছেন দাদা। ওই সল্ট অ্যান্ড পেপার ক্যাফেটার কাছে অশনি রায়ের ব্যাঙ্ক আর একটা বাড়ি ফাইন্যান্স করেছিল। বাড়িটার নামটা বেশ জমকালো। ওয়াদারিং হাইটস। মানে সেই এমিলি ব্রন্টের উপন্যাস।'

আদিত্য অবাক হল না। সুভদ্র মাজির বিস্তৃত সাহিত্যপাঠের পরিচয় সে আগেও পেয়েছে। মুখে বলল, 'এই এমিলি ব্রন্টের আশেপাশে আর কোনও বাড়ির সন্ধান পেলে?'

‘সেটাও খোঁজ নিয়েছিলাম। কিছুই নেই। জায়গাটা এখনও ঠিকমতো ডেভেলপই করেনি। তবে দশ-বারো কিলোমিটার দূরে দু'টো বাড়ি আছে। একটা বছর খানেক পুরোনো। অতএব সেটাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। অন্যটার বয়েস বছর দশেক। একেবারে মাঠের মাঝখানে দোতলা একটা বাড়ি। নাম রিপোজ। এটা অশনি রায়ের গোপন মিলনকুঞ্জ হওয়া সম্ভব।'

‘তুমি কি এই রিপোজ বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলে ?”

‘গিয়েছিলাম। বাড়িটা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। আউট হাউসে একজন কেয়ারটেকার বাস করে। সে বলল মালিক দুবাইতে থাকে। বছরে একবার দু'বার আসে। বাকি সময় বাড়িটা বন্ধই থাকে।'

‘এটা তো অশনির ডেসক্রিপশনের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।'

‘তা যাচ্ছে। তবে কেয়ারটেকার অশনির ছবি দেখে চিনতে পারছে না। অবশ্য চেনবার কথাও নয়। কেয়ারটেকার বলছে সে তিন সাড়ে-তিন বছর এখানে চাকরি নিয়েছে।'

‘মালিক ছাড়া অন্য কেউ কি এই বাড়িটাতে আসে?”

‘আমি এই প্রশ্নটা অনেকবার করেছিলাম। প্রত্যেকবার একই উত্তর দিচ্ছে। মালিক ছাড়া আর কেউ এখানে আসে না। মালিক যখন আসে তখন বাড়িটা খোলা হয়। অন্য সময় বাড়িটা বন্ধ পড়ে থাকে।'

‘তোমার কি মনে হয় লোকটা সত্যি কথা বলছে?'

‘আমার মনে হচ্ছে না। ওর কথা বলার ধরন থেকে মনে হচ্ছে ও কিছু একটা লুকোবার চেষ্টা করছে। লোকটার তাগড়াই চেহারা কিন্তু মনে হয় খুব চালাক-চতুর নয়। মনের ভাব মুখে প্রকাশ করে ফেলে।'

‘তুমি কি লোকটাকে বলেছ যে তুমি পুলিশ?'

‘পাগল, তাই কখনও বলে? আমি বলেছি এক বন্ধুর খোঁজ করছি। সেই বন্ধু এক সময় এই বাড়িটায় থাকত। এইসব বলে অশনি রায়ের ছবিটা দেখিয়েছি। মনে হল লোকটা বিশ্বাস করে নিয়েছে।'

‘তুমি দুটো কাজ কর। এক, ওই বাড়িটা সার্চ করার জন্যে একটা ওয়ারেন্ট বার কর। আর দুই, খোঁজ নাও বাড়িটা কার নামে রেজিস্টার্ড আছে। আমি তিন-চার দিনের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরোবার অনুমতি পাব। তখন দু'জনে মিলে ওই বাড়িটা সার্চ করতে হবে। আমার মন বলছে কিছু একটা পেয়ে যাব।'

কেয়া ঘরে ঢুকেছে। বলল, ‘এবার মোবাইল রাখো। চান করে নাও। লাঞ্চ তৈরি।' চান করতে করতে আদিত্য বুঝতে পারল হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে সে টিভিতে যে খবরগুলো শুনেছিল তার মধ্যে কোনটা তার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন।

দিবানিদ্রার অভ্যাস আদিত্যর কোনও কালেই ছিল না, ইদানীং হাসপাতালে গিয়ে হয়েছে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কেয়া আদিত্যর পাশে শুয়ে খবরকাগজ পড়ছিল। একটা খবরকাগজের পাতা খুলে দু'একটা লাইন পড়তে না পড়তেই আদিত্যর চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে এল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা পড়ে গেছে। আদিত্য চোখের এক পাশ দিয়ে দেখল খাটের অন্যদিকে কেয়া এক বান্ডিল পরীক্ষার খাতা নিয়ে বসেছে। আদিত্যকে উঠে পড়তে দেখে বলল, 'চা খাবে?'

‘অবশ্যই খাব। এখন কোনও ওষুধ আছে?'

না, এখন নেই। সন্ধে ছ'টায় একটা আছে। চা কি বিছানায় দেব, নাকি খাবার টেবিলে বসবে?'

‘খাবার টেবিলে দাও।' বিকেল বেলা কেয়ার সঙ্গে বসে চা খাবার সুযোগ তার রবিবার ছাড়া জোটে না।

আদিত্য বাথরুমে ঢুকল। ঘুম থেকে উঠে তার দাঁত ব্রাশ করার অভ্যাস, তা সে দিন হোক বা রাত্তির।

এক সঙ্গে চা খাবার অছিলায় আদিত্য কেয়ার একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে। একটু একটু করে কেয়ার শরীরের কাছে আসছে। কেয়ার শরীরের উত্তাপ নিতে চাইছে । 'এখন কিন্তু অনেক দিন ওসব বন্ধ থাকবে।' কেয়া ধমকের স্বরে বলল। 'মনে হচ্ছে তোমার মতলব ভাল নয়। ডাক্তারবাবু তোমাকে এখন কোনও রকম উত্তেজনা নিতে বারণ করেছেন।'

'কত দিন বন্ধ থাকবে?' আদিত্য বোকা বোকা গলায় বলল।

'অন্তত তিন মাস। '

'তিন মাস! পাগল! এক মাস। এক মাসই যথেষ্ট।'

হয়ত এটা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ দরাদরি চলত, কিন্তু ইতিমধ্যে আদিত্যর মোবাইলটা বেজে উঠেছে।

মোবাইলটা বাজতেই কেয়া ছোঁ মেরে তুলে নিল। খুব দরকারি ফোন ছাড়া সে আদিত্যকে কথা বলতে দেবে না।

ওদিক থেকে কী বলছে আদিত্য শুনতে পাচ্ছে না, শুধু কেয়া বলছে শুনতে পাচ্ছে।

'হ্যালো'

'......'

'উনি খুব অসুস্থ। সবে হসপিটাল থেকে ফিরেছেন। এখন ওঁর পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়।'

'......'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন ওঁর সঙ্গে কথা বলা সত্যিই সম্ভব নয়।'

"........."

'তুমি অনন্যা সাহার সঙ্গে কথা বলবে? উনি বলছেন খুব বিপদে পড়েছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলা ভীষণ দরকার। তুমি যখন হাসপাতালে ছিলে তখনও উনি ফোন করেছিলেন। কথা বলবে?' কেয়া আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখে বলল।

'অবশ্যই বলব। ফোনটা দাও।' আদিত্য ব্যগ্র হয়ে ফোনটা ধরে বলল, "হ্যালো'

'আমি অনন্যা সাহা বলছি। আমাকে চিনতে পারছেন? কিছুদিন আগে আপনি বাঙ্গুরে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। খুব বিপদে পড়ে আপনাকে ফোন করছি।' ওপার থেকে ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আপনাকে আমার খুব মনে আছে। বলুন কী ব্যাপার।'

'আমার স্বামী শুভ হঠাৎ মারা গেছে।' ওপারের কণ্ঠস্বর কান্নায় ভেঙে পড়েছে। 'মারা গেছে! কী করে?' আদিত্য হতভম্ব। কী বলবে বুঝতে পারছে না। ওপারে কান্না অব্যাহত।

আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কান্না না থামলে কথা বলা মুস্কিল।

'পুলিশ বলছে শুভ আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু স্বাভাবিক, হাসিখুশি মানুষটা হঠাৎ কেন আত্মহত্যা করতে যাবে?' অনন্যা সাহা এখনও ফোঁপাচ্ছে। 'আপনি তো গোয়েন্দা। আপনি একটু খোঁজ নিয়ে বলতে পারেন ব্যাপারটা ঠিক কী?'

'কোথায় ঘটেছে ঘটনাটা? আপনাদের ফ্ল্যাটে?'

'না, না। আমাদের ফ্ল্যাটে নয়। কৃষ্ণনগরের কাছে শুভদের আপিসের একটা ফ্যাক্টরি আছে। ওখানেই শুভর অফিস এবং কোয়ার্টার। মাসের মধ্যে অন্তত দশ-পনের দিন শুভকে ওখানেই কাটাতে হয়। ওই কোয়ার্টারেই শুভকে পাওয়া গেছে। ও নাকি গলায় গামছা দিয়ে ফ্যান থেকে ঝুলছিল।' বলতে বলতে অনন্যা সাহা আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আদিত্য বলল, 'আপনার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলা দরকার। টেলিফোনে সব কথা হয় না। স্বাভাবিক অবস্থা হলে আমি আপনার বাড়িতে চলে যেতাম। কিন্তু আমি আজকেই হাসপাতাল থেকে ফিরেছি। ডাক্তার

এখনও বাইরে বেরোবার পারমিশান দেয়নি। তাই ভাবছিলাম, আপনি কি আমার বাড়ি আসতে পারবেন? আমার বাড়িটা দেশবন্ধু পার্কের কাছে।'

ওপারে সাড়াশব্দ নেই। অনন্যা সাহা নিশ্চয় ভাবছে কী করবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলল, "ঠিক আছে, আমিই আপনার বাড়িতে যাব। তবে আজ আর পারব না। একটু আগে কৃষ্ণনগরের পুলিশ মর্গ থেকে বড়ি ছাড়িয়ে কৃষ্ণনগরেই বডি ক্রিমেট করে ফিরেছি। খুব ক্লান্ত লাগছে। তাছাড়া মেয়েটাও সারাদিন একা ছিল। ওর সঙ্গেও থাকতে হবে। আমি বরং কাল সকালে, মেয়ে স্কুলে বেরিয়ে গেলে, আপনার বাড়ি যাব। আপনার ঠিকানা আর বাড়ির ডিরেকশানটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন।'

অনন্যা সাহা ফোন ছেড়ে দেবার পর আদিত্য সুভদ্র মাজির নম্বরটা ডায়াল করল। 'আর একটা কাজ করে দিতে হবে। শুভব্রত সাহা বলে একজনের বড়ি কৃষ্ণনগরের পুলিশ মর্গে আজ সকাল অব্দি ছিল। পুলিশ বলছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার কেস। ঠিক কী হয়েছে জানা দরকার। লোকটা সেন বেকারিতে চাকরি করত। মাসের অর্ধেক দিন কৃষ্ণনগরের কাছে সেন বেকারির যে ফ্যাক্টরি আছে তার সংলগ্ন কোয়ার্টারে থাকত। ওখানেই নাকি লোকটা আত্মহত্যা করেছে। একটু খোঁজ নেবে?

আরে, তুমি তো দেখছি আবার রীতিমত কাজ শুরু করে দিলে! ডাক্তার তোমাকে ক'টা দিন রেস্ট নিতে বলেছে তো। মোবাইল রাখো। ওষুধ খেতে হবে।" কেয়া ঘরে ঢুকে চেঁচামিচি শুরু করে দিয়েছে।

সকালে ফোন করে অনন্যা সাহা জানিয়েছিল সাড়ে দশটায় আসবে। এগারোটা বাজতে চলল এখনও তার আসার নামগন্ধ নেই। আদিত্য বসার ঘরে ইজি চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে করতে গান শুনছে। শুদ্ধ সারং। সেই পুরোনো বড়ে গোলাম। আদিত্য ভাবছিল, আহা, এমন করে আর কেউ গাইতে পারল না।

কেয়া আজও ছুটি নিয়েছে। রুগির দেখাশোনা করবে। আদিত্য অনেকবার বলছে তাকে দেখাশনা করার কোনও দরকার নেই, কেয়া কর্ণপাত করেনি। আগামী দু'দিন শনি ও রবিবার, কেয়ার এমনিতেই ছুটি। অতএব এখন আরও তিনদিন আদিত্যকে কেয়ার কড়া নজরদারিতে থাকতে হবে।

এখন কেয়া রান্নাঘরে। রান্নার মাসিকে দেখিয়ে দিচ্ছে কত কম তেল এবং নুন দিয়ে আদিত্যর জন্যে রান্না করতে হবে। হঠাৎ সে ঘরে ঢুকে বলল, "তোমাকে কিন্তু বারোটার সময় লাঞ্চ খেতে হবে। তার মানে সাড়ে এগারোটায় চান করতে যাবে। মহিলা যদি আরও দেরি করে তা হলে কিন্তু আমি তাকে ভাগিয়ে দেব।'

আদিত্য বলতে শুরু করেছিল, 'কেয়া, অত নির্দয় হয়ো না। ভদ্রমহিলার স্বামী হঠাৎ মারা গেছেন। ওঁর মনের অবস্থাটা ভাব।' আদিত্যর কথা অর্ধেক শেষ হবার আগেই কেয়া আবার রান্নাঘরে ফিরে গেছে। এঘর থেকে কথা বললে রান্নাঘরে কিছুই শোনা যায় না। আদিত্যর চিন্তা হচ্ছিল, ভদ্রমহিলা আরও দেরি করলে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ না তৈরি হয়।

কার্যত দেখা গেল আদিত্যর দুশ্চিন্তা ভিত্তিহীন। সাড়ে এগারোটা বেজে গেল, বারোটা বেজে গেল, সাড়ে বারোটাও বেজে গেল, অনন্যা সাহার দেখা নেই। শুধু যে দেখা নেই তা নয়, ভদ্রমহিলা একটা ফোন পর্যন্ত করলেন না। আদিত্য ভাবছিল সে নিজেই একটা ফোন করবে। কিন্তু কেয়া তার মোবাইলটা দখল করে রেখেছে। কেয়া বলে দিয়েছে, আগে খাবে তারপর কিছুক্ষণ ঘুমোবে। তারপর ঘুম থেকে উঠে যদি ইচ্ছে করে তাহলে ফোন কোরো। আদিত্য তিনটে অব্দি ঘুমোল। ঘুম থেকে উঠে চা-বিস্কুট খাচ্ছে এমন সময় অনন্যা সাহার ফোন।

'আমি খুব লজ্জিত সকালে যেতে পারিনি বলে। এমন একটা অবস্থা হল, যাওয়া সম্ভব ছিল না। আপনাকে খুলে বললে বুঝতে পারবেন। চারটের সময় আমার মেয়ে স্কুল থেকে ফিরবে। ওকে খেতে দিয়ে আমি বেরোব। আপনার ওখানে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে যাব। প্লিজ কিছু মনে করবেন না। আমি সত্যিই খুব অসুবিধের মধ্যে আছি।'

ভদ্রমহিলার গলা শুনে মনে হচ্ছে সত্যিই বিপদে পড়েছেন।

আদিত্য বলল, "ঠিক আছে। তাই আসুন।'

'সকালে কেন আসতে পারলাম না সেটা আগে বলি।' অনন্যা সাহাকে দেখে চেনা যায় না। সেই মোটাসোটা, আদুরে, পুতুল-পুতুল ভাবটা উধাও হয়ে গেছে। চোখের নীচে গভীর কালি। শাড়ি-ব্লাউজে মিল নেই। চুল অবিন্যস্ত। একেবারে ধসে যাওয়া চেহারা ।

'আপনি চা খাবেন?" কেয়া ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল।

'না। আমি চা খাই না।'

'আমি কি একটু চা পেতে পারি?' আদিত্য উত্তরটা জানত, তবু একটা চান্স নিয়ে দেখল।

'মোটেই পেতে পার না। তুমি এখন ডাবের জল খাবে।' কেয়া আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সম্ভবত আদিত্যর জন্যে ডাবের জল আনতে ।

'আপনি বলুন।' আদিত্য অনন্যা সাহার দিকে তাকিয়ে বলল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি। সকালে আমার মেয়ে স্কুলে বেরিয়ে যাবার পর আমিও বেরোতে যাব এমন সময় শুভর অফিস থেকে দু'জন এসে হাজির। তাদের একজনকে আমি অফিসের অনুষ্ঠানে আগে দেখেছি। দু'একবার কথাও বলেছি। উনি কম্পানির জেনারেল ম্যানেজার, নাম প্রণব মাইতি। উনিই কম্পানিটা চালান। ওঁর ওপরে অবশ্য মালিক পল্লব সেন আছেন, কম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার। কিন্তু সেটা নামেই। মালিক ব্যবসা-ট্যাবসা কিছু দেখেন না। প্রণব মাইতিই সবটা দেখেন।

'আর দ্বিতীয় জন?'

'দ্বিতীয় জনকে আমি আগে কখনও দেখিনি। তবে শুভর কাছে নাম শুনেছি। পরিচয় দিতে চিনতে পারলাম। সম্রাট দত্ত। কম্পানির চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার।'

'এরা কী বলতে এসেছিলেন?'

"প্রথমে এরা শুভর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ এর যে ফ্ল্যাটটায় কম্পানি আমাদের থাকতে দিয়েছিল, সেখানে আমার মেয়েকে নিয়ে আমি এখন কিছুদিন থাকতে পারি।'

'কিছুদিন মানে কতদিন?'

'ওদের কথায় যা বুঝলাম, বছর খানেক। তার মধ্যে অন্য বাড়ি দেখে উঠে যেতে হবে। তবে কাকুতি-মিনতি করলে হয়ত আরও এক-দু'মাস থাকতে দিতে পারে।'

'আর কী বলল?'

'বলল, কম্পানির কাছে শুভর যা পাওনা আছে, প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, লিভ এনক্যাশমেন্ট ইত্যাদি, সেগুলো আমি একমাসের মধ্যে পেয়ে যাব। তার ওপর, যেহেতু শুভ চাকরি করতে করতে মারা গেছে, একটা ভাল টাকা কম্পেনসেশন হিসেবে আমাকে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, গ্র্যাজুয়েশন অব্দি আমার মেয়ের সমস্ত খরচ কম্পানি বহন করবে।'

'এ তো খুব ভাল কথা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কম্পানির একটা শর্ত আছে। শর্তটা হল শুভর মৃত্যুটা নিয়ে আমি পুলিশের কাছে যেতে পারব না। কোর্টে যাওয়াও চলবে না। মিডিয়ায়, মানে খবর কাগজ বা টেলিভিশনে, কিছু বলাও চলবে না। ওরা বলছে শুভর মৃত্যুটা নিয়ে জল ঘোলা হলে সব থেকে ক্ষতি হবে কম্পানির। ওরা সেটা চায় না।'

'আপনার স্বামীর মৃত্যু কেন হল সে বিষয়ে কি ওরা কিছু বললেন?"

'শুধু এইটুকু বললেন যে শুভ সুইসাইডই করেছে। কেন করেছে, সেটা পুলিশ নিশ্চয় খুঁজে বার করবে। তবে আমি যেন আলাদা করে পুলিশের কাছে না যাই । বুঝতেই পারছেন ওরা ছিল বলে আমি আপনাকেও ফোন করে জানাতে পারছিলাম না যে আটকা পড়ে গেছি।'

‘বুঝতে পারছি আপনি কেন ফোন করতে পারেননি। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না কেন ওদের বারণ সত্ত্বেও আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে এলেন।'

‘এলাম কারণ আমি বিশ্বাস করি শুভ আত্মহত্যা করেনি, অন্য কোনও ভাবে মারা গেছে। খুব সম্ভবত তাকে কেউ খুন করেছে। আমার মনে হল, আপনি হয়ত কে শুভকে খুন করেছে সেটা বার করতে পারবেন। খুনিকে শাস্তি দিতে পারবেন।'

‘আমার ওপর আপনার এত আস্থা কেন?'

‘আদিত্যবাবু, আপনার কথা আমি কাগজে পড়েছি। সেদিন আপনি চলে আসার পর বুঝতে পারলাম আপনিই সেই আদিত্য মজুমদার যার কথা আমি কাগজে পড়েছি। মনে হল, আপনি নিশ্চয় আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। আর তাছাড়া আপনি তো পুলিশ নন, বেসরকারি গোয়েন্দা। কম্পানি আমাকে পুলিশের কাছে যেতে বারণ করেছে, কিন্তু কোনও বেসরকারি গোয়েন্দার কাছে যেতে তো বারণ করেনি।'

‘ঠিক আছে। আপনার কথা মেনে নিলাম। কিন্তু বলুন, আপনার কেন মনে হচ্ছে আপনার স্বামী আত্মহত্যা করেননি?

'দেখুন, আজ তো শুক্রবার, শুভ গত সোমবার মারা গেছে। সেদিন ভোরের ট্রেন ধরার জন্যে ও যখন বাড়ি থেকে বেরোয় তখন একদম স্বাভাবিক ছিল। তার আগের রাত্তিরে, মানে রবিবার, আমরা প্ল্যান করছিলাম গোয়া বেড়াতে যাব। এরকম একটা লোক কখনও আত্মহত্যা করতে পারে? শুভ শেয়ালদা থেকে সকাল ছ'টা দশের কৃষ্ণনগর লোকাল ধরেছিল। সাড়ে আটটা নাগাদ কৃষ্ণনগর পৌঁছনোর কথা । পুলিশের ডাক্তার বলছে, শুভ মারা গেছে সোমবার বেলা এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। কৃষ্ণনগর পৌঁছনোর তিন-চার ঘন্টার মধ্যে কী এমন ঘটল যাতে শুভকে আত্মহত্যা করতে হল ?”

‘আপনি কখন খবরটা জানতে পারলেন?'

‘সোমবার রাত্তির থেকেই শুভর বড়ি কৃষ্ণনগর পুলিশ মর্গে পড়ে রয়েছে। অথচ আমাকে খবরটা দেওয়া হল মঙ্গলবার সন্ধেবেলা। এটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। এতটা সময় ধরে পুলিশ কী করছিল? আমাকে খবর দেবার আগেই পোস্ট মর্টম হয়ে গিয়েছিল। তাতে নাকি আত্মহত্যার ধারণাটাই কনফার্মড হয়েছে।'

‘আচ্ছা, যদি ধরে নিই আপনার স্বামীকে কেউ খুন করেছে, তাহলে মোটিভের প্রশ্ন ওঠে। আপনার স্বামীকে খুন করার মোটিভ কি কারও থাকতে পারে?'

‘আপাতদৃষ্টিতে আমার স্বামীর কোনও শত্রু ছিল না। হাসিখুশি, দিলখোলা মানুষ । সকলেই ওকে পছন্দ করত। তবে আমার ধারণা অফিস নিয়ে ওর বেশ টেনশান ছিল। অনেক রাত্তির ঘুমোতে পারত না। আমি জিজ্ঞেস করলেও বলত না কী হয়েছে। বলত, আপিসের ময়লা বাড়িতে আনার দরকার নেই।'

‘হুঁ। এবার কৃষ্ণনগর যাবার আগে আপনার স্বামী উল্লেখযোগ্য কিছু বলেছিলেন?' ‘নাঃ, তেমন কিছু মনে পড়ছে না। ও হ্যাঁ। একটা কথা বলেছিল বটে। শনিবার আমরা একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলাম। আমার মেয়ে পাশের ঘরে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীনাথ বহুরূপী' থেকে প্রশ্ন-উত্তর মুখস্থ করছিল। ওটা ওদের পড়তে হয়। আর আমার মেয়ে চেঁচিয়ে ছাড়া পড়া মুখস্থ করতে পারে না। সে যাই হোক, শুভ হঠাৎ বলল, চারদিকেই ছিনাথ বহুরূপীরা ছড়িয়ে আছে। আমাদের আপিসেও আছে। একটা লোককে ওপর ওপর দেখে যেটা মনে হচ্ছে সে মোটেই সেটা নয়। তাই খুব সাবধানে থাকতে হবে।'

‘এই কথাটার কী মানে হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

‘আমার মনে হয়েছিল, শুভ বলতে চাইছে, ওর অফিসে কেউ বা কারা সামনা-সামনি ওর বন্ধু সেজে পেছন থেকে ক্ষতি করছে। শুভর যে অল্পদিনের মধ্যে এতটা উন্নতি হয়েছে এটা হয়ত কারও কারও ভাল লাগেনি।

একটু পরে অনন্যা সাহা চলে যাবার পর আদিত্য সুভদ্র মাজির ফোনটা ডায়াল করল।

'হ্যাঁ দাদা। আপনাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম। শুভব্রত সাহার ব্যাপারে কৃষ্ণনগরে ফোন করেছিলাম। ওখানকার পুলিশ বলছে সুইসাইড কেস। লোকটা নাকি কম্পানি থেকে অনেকগুলো টাকা সরিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তাই সুইসাইড করেছে। পোস্ট মর্টম রিপোর্টও বলছে মৃত্যুর কারণ গলায় গামছা দিয়ে সিলিং ফ্যান থেকে ঝোলা।

এর বেশি আর ওখানকার পুলিশ কিছু বলতে পারছে না। হয়ত বলতে চাইছে না। ওপর থেকে যদি চাপ দেওয়া যায় তা হলে হয়ত আরও কিছু জানা যেতে পারে। আপনি একটু অ্যাডিশানাল কমিশানার সাহেবকে বলে দেখুন না।'

সুভদ্রর সঙ্গে কথা বলার পর ফোনটা রেখে আদিত্য গভীরভাবে ভাবছিল। যে লোকটা কম্পানি থেকে টাকা সরিয়ে ধরা পড়েছে তাকে কি কম্পানি নিঃশর্তে সমস্ত পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেবে? তার স্ত্রীকে মোটা টাকা কম্পেনসেশান দেবে? তার মেয়ের পড়াশোনার খরচ বহন করবে?

রাত্তিরবেলা আদিত্যর ঘুম আসছিল না। ঘুমের বদলে নানারকম চলমান ছবি মাথার মধ্যে ঘুরছে। কেয়া পাশে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। আদিত্য বিছানা ছেড়ে উঠে এক গেলাস জল খেল। ঘড়িতে দেখল রাত সাড়ে বারোটা। দূরে এপিসি রোড দিয়ে এখনও লরি যাচ্ছে। আদিত্যদের শোবার ঘর থেকে দেখা যায় না, তবে শব্দ শোনা যায়। কেয়াকে আদর করতে ইচ্ছে করছে খুব, কিন্তু সেটা এখন সম্ভব নয়। আদিত্য আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করল। আবার সেই চলমান দৃশ্য। সেই লোকটার ছবি ভেসে উঠেছে যাকে ডায়মন্ডহারবারে নদীর ধারে দেখে চেনা মনে হয়েছিল। চকিতে আদিত্যর মনে পড়ে গেল লোকটাকে আগে কোথায় দেখেছে। এতদিন মনে পড়েনি কেন? উত্তেজনায় আদিত্য বিছানায় উঠে বসেছে। কেয়ার ঘুম ভেঙে গেল।

'কী হল? বসে আছ কেন?' কেয়ার গলায় উদ্বেগ।

'ঘুম আসছে না। '

'আমাকে ধরে শোও, ঘুম এসে যাবে। কিন্তু একদম দুষ্টুমি করবে না।' কেয়া আদিত্যর দিকে পাশ ফিরে শুল।

কেয়ার শরীরের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে আদিত্যর কখন যে ঘুম এসে গেছে সে নিজেই জানে না।

(৩)

এক সপ্তাহ পরে আদিত্য আজ বাইরে বেরোবার অনুমতি পেয়েছে। কেয়া এত সহজে রাজি হতো না, ডাঃ রায়কে দিয়ে বলিয়ে অনেক কষ্টে তাকে রাজি করানো গেছে। তবে ডাঃ রায় বারবার বলে দিয়েছেন, এই প্রবল গ্রীষ্মে আদিত্য যেন এগারোটার পর আর বাইরে না থাকে।

আদিত্য সুভদ্র মাজিকে নিয়ে রাজারহাটের সেই বাড়িটা দেখতে যাচ্ছে। যেখানে সম্ভবত অশনি রায় তার বান্ধবীর সঙ্গে সময় কাটাত। বাড়িটা সার্চ করার জন্য ওয়ারেন্ট সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। ভোর সাড়ে ছ'টায় সুভদ্র এসে আদিত্যকে তুলে নিয়েছে। এমনিতে ভোরে উঠতে আদিত্যর জঘন্য লাগে। কিন্তু আজ এতদিন পরে মুক্তি পেয়েছে বলে এই ভোরটা তার চমৎকার লাগছে।

এত সকালে রাস্তা ফাঁকা। পুলিশের গাড়িটা দেখতে দেখতে সল্ট লেক পৌঁছে গেল। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে একজন কনসটেবল। পিছনের সীটে আদিত্য এবং সুভদ্র। দেখতে দেখতে সল্ট লেক পেরিয়ে রাজারহাটে ঢুকে পড়ল গাড়িটা।

বাড়িটা দোতলা, মাঠের মধ্যিখানে বেমানানভাবে দাঁড়িয়ে। আশেপাশে আর কোনও বাড়ি নেই। দু'একটা জমিতে পাঁচিল দেওয়া আছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সেসব জায়গায় বাড়িঘর উঠবে। কিন্তু আপাতত চারদিকটা একেবারে ধু ধু করছে। সুভদ্র খবর নিয়ে জেনেছে সুন্দরলাল সাপ্রু বলে এক ব্যক্তির নামে বাড়িটা রেজিস্টার্ড। সুন্দরলাল দুবাইতে থাকে। এনকেডিএ-কে নিয়মিত ট্যাক্স দেয়। পুলিশের খাতায় নাম নেই। আপাতদৃষ্টিতে গুড সিটিজেন। কিন্তু এই রকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় সে একটা বাড়ি তুলতে গেল কেন, সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। পুলিশের গাড়ি বাড়িটার সামনে গিয়ে থামল।

গেটের পাশে দেয়ালে পাথরের ফলকে লেখা রিপোজ। হয়ত এক সময় বাড়িটার যত্ন হতো, এখন বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে অনেকদিন রঙ করা হয়নি। গেট দিয়ে আদিত্যরা ভেতরে ঢুকে দেখল সামনে এক ফালি জমি। সেখানে শাক-সব্জির গাছ। লাউমাচা। একটা সারিতে কিছু দিশি ফুল ফুটে রয়েছে। দোতলা ছাপিয়ে উঠে গেছে দুটো বড় আমগাছ। দুটোতেই হাড়ে-মজ্জায় মুকুল ধরেছে। একটা কাঁঠাল গাছও আছে। সেটাতেও বেশ কয়েকটা ছোট-ছোট কাঁঠাল ঝুলছে। অন্য গাছগুলোকে আদিত্য চিনতে পারল না। শাক-সব্জির গাছ আর ফুল গাছের সারির মধ্যে দিয়ে একটা বাঁধানো রাস্তা বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে ঠেকেছে। সদর দরজাটা বন্ধ। তালা ঝুলছে।

'এই যে, কেউ আছ নাকি? এই চৌকিদার!' সুভদ্র হাঁক পাড়ল। কারও সাড়া নেই। কাঁঠাল গাছের নিচে একটা ঘর রয়েছে, সেটাও তালাবন্ধ। এটা নিশ্চয় চৌকিদারের ঘর। লোকটা গেল কোথায়?

'চৌকিদার ! এই চৌকিদার!' এবার কনসটেবল গলা তুলেছে। তার গলার আওয়াজে চারদিক কেঁপে গেল। আর সেই আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতে বাড়ির পেছন দিক থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ শোনা গেল, 'আসছি, আসছি।'

ড্রাইভার বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করছে। আদিত্যরা বাকি তিনজন দ্রুত পায়ে বাড়ির পেছনে গিয়ে দেখল কলতলায় বসে চৌকিদার বাসনপত্র ধুচ্ছে। তিনটে লোক, তার মধ্যে একজন আবার পুলিশের পোষাক পরা, তার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সে বাসনপত্র ফেলে উঠে দাঁড়াল।

"শোনো, সেদিন তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল মনে আছে? তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম এই বাড়িতে কারা আসে, তুমি বললে মালিক ছাড়া আর কেউ আসে না। মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ মনে আছে। কিন্তু আপনি কে? আবার কেন এসেছেন? বললাম তো, আপনি যাকে খুঁজছেন তাকে আমি কখনও দেখিনি। সঙ্গে পুলিশ এনেছেন কেন?'

'সঙ্গে পুলিশ আনব কেন? আমরাই তো পুলিশ। আমরা এই বাড়িটা সার্চ করব। আমাদের সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। তুমি যদি পড়তে পার তা হলে পড়ে দেখ।' 'কেন আপনারা সার্চ করবেন? এখানে তো কেউ থাকেই না। মালিক মাঝে মাঝে আসে, তাও বছরে একবার কী দুর্বার। '

'সে তো তুমি বলছ। আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করছি না।'

'আমি মিথ্যে বলব কেন? মিথ্যে বলে আমার কী লাভ?"

'কী লাভ সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে। আপাতত তুমি দরজাটা খুলে দাও । তোমার কাছে নিশ্চয় বাড়ির চাবি আছে।'

'আমার কাছে বাড়ির চাবি নেই।'

'তোমার কাছে বাড়ির চাবি নেই? ঠিক আছে তোমার ঘরের চাবি তো আছে। তোমার ঘরটা খুলে দাও। আগে তোমার ঘরটা খুঁজে দেখি বাড়ির চাবিটা পাই কিনা । যদি না পাই তা হলে তালা ভাঙতে হবে।'

'আপনারা কিন্তু জুলুম করছেন স্যার।'

'জুলুমের এখনই কী দেখলে? পুলিশের কাজে বাধা দিলে আরও জুলুম দেখবে। নাও তাড়াতাড়ি চল।'

‘মালিক আমাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেবে। মালিক বলে দিয়েছিল কাউকে বাড়ির চাবি দেবে না। মালিক জানতে পারলে আমি কী বলব?'

‘বলবে পুলিশ চেয়েছিল তাই দিতে বাধ্য হয়েছি। মালিক ঠিক বুঝতে পারবে। তোমার নামটাই তো জানা হল না। নাম কি?

‘আজ্ঞে দীনবন্ধু। দীনবন্ধু মাহাতো।'

‘বাড়ি কোথায়?’

‘পশ্চিম মেদিনীপুর। ঝাড়গ্রামের কাছে।

সুভদ্র আর দীনবন্ধু চৌকিদার কথা বলতে বলতে এগিয়ে গিয়েছিল। কনসটেবলটি তাদের ঠিক পেছন পেছন হাঁটছে। আর সবার পেছনে চারদিকটা দেখতে দেখতে অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে আদিত্য।

দীনবন্ধু কোমর থেকে নিজের ঘরের চাবি বার করে দরজা খুলল, ঘরে ঢুকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা চাবির গোছা নিয়ে বেরিয়ে এল। মনে হচ্ছে, সে এখন পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে চৌকিদার সহ গোটা দলটা বাড়ির ভেতরে।

একতলায় সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা বেশ বড় বসার ঘর। সোফা, কাউচ, টেলিভিশন সব কিছুই প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা। বসার ঘরের সংলগ্ন খাবার জায়গা। সেখানেও ডাইনিং টেবিল এবং রেফ্রিজারেটারটা প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা। রেফ্রিজারেটরটা অফ করা আছে। এছাড়া একতলায় একটা কিচেন রয়েছে। কিচেনের গ্যাজেটগুলিও অর্থাৎ মাইক্রোওভেন, মিক্সি, টোস্টার, ইলেকট্রিক কেটল ইত্যাদি, যত্ন করে প্লাস্টিক দিয়ে কেউ ঢেকে রেখেছে যাতে অব্যবহারে সেগুলোতে ধুলো না জমে। উনুনের সঙ্গে গ্যাস সিলিন্ডারের যোগাযোগটাও বিচ্ছিন্ন।

দীনবন্ধু আদিত্যদের পেছন পেছন আসছিল। এবার সে বলল, ‘বললাম না স্যার, মালিক ছাড়া এখানে কেউ ঢোকে না। দেখছেন তো, এই জিনিসগুলো ব্যবহার করবেন না বলে মালিক এগুলো চাপা দিয়ে গেছেন।'

‘তুমি কি এই একতলাটা নিয়মিত ঝাড়পোঁচ কর? কোথাও ধুলো-টুলো তো তেমন দেখছি না।' সুভদ্র রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল।

‘শুধু একতলা কেন স্যার? পুরো বাড়িটাই নিয়মিত ঝাড়পোঁচ করি। ওটাই তো আমার কাজ। মালিক তো আমাকে রোজ বাড়ি পরিষ্কার করতে বলেছে।”

‘বাঃ। তুমি তো দেখছি খুব খাঁটি লোক। অন্য যে কেউ হলে শুধু মালিক আসার আগে বাড়িটা পরিষ্কার করত। অন্য সময় যখন বাড়িটা ফাঁকা থাকছে সে আর বাড়ি পরিষ্কারের ঝামেলায় যেত না।' আদিত্য এতক্ষণে মুখ খুলেছে।

‘আমি স্যার ওরকম লোক নই। কাজে ফাঁকি দেওয়া কখনও শিখিনি। ' ‘বেশ, বেশ। চল এবার দোতলায় কী আছে দেখা যাক।' দীনবন্ধুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সুভদ্র বলল।

বসার ঘরের একপাশ দিয়ে সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। ওপরে তিনটে শোবার ঘর। তার মধ্যে দুটো ঘর খোলা, একটার গা-তালা চাবি দিয়ে বন্ধ। খোলা ঘরদুটোতে তেমন কিছু দেখার নেই। একতলার মতো এখানেও আসবাব পত্র প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা। যেন কেউ দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকবে না বলে খাট-বিছানা-আলমারি যত্ন করে ঢাকা দিয়ে গেছে। তাহলে কি দীনবন্ধুর কথাটাই মেনে নিতে হবে? মালিক ছাড়া আর কেউ এই বাড়িতে ঢোকে না?

‘ওই বন্ধ ঘরটাতে কী আছে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

‘আমি বলতে পারব না স্যার। ওই ঘরটার চাবি আমার কাছে নেই। হয়ত ওখানে মালিক কোনও দামী জিনিস রেখে গেছে, তাই আমাকে চাবিটা দিয়ে যায়নি।'

'ঘরটা খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।' সুভদ্র পুলিশি গলায় বলল।

'আমি কী করে ব্যবস্থা করব স্যার? আমার কাছে সত্যিই ওই ঘরটার চাবি নেই।' দীনবন্ধু কাতর গলায় বলল।

'তা হলে দরজা ভাঙতে হবে।' সুভদ্র সংক্ষিপ্ত ভাবে বলল।

'স্যার, যদি দরজা ভেঙে দেখেন কিছু নেই তাহলে কেমন করে আমি মালিককে জবাবদিহি করব? পুলিশই বা কী জবাবদিহি করবে? আমি ঠিক বলছি তো স্যার?' 'লোকটা কিন্তু খুব একটা ভুল বলছে না।' আদিত্য সুভদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল। 'যদি তেমন কিছু পাওয়া না যায়, দরজা ভাঙার দায়টা তোমার ঘাড়ে পুরোপুরি পড়বে। তাই দরজা ভাঙার আগে একটু ভেবে দেখো।'

'আপনার ইনটিউশান কী বলছে দাদা? ভেতরে কিছু পাওয়া যাবে?'

আমার ইনটুইশান বলছে, যাবে। অবশ্যই যাবে। কিন্তু শুধুমাত্র আমার ইনটুইশানের ওপর নির্ভর করে এগোনো উচিৎ হবে কিনা বুঝতে পারছি না।'

সুভদ্র ভাবছে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, "আমি আপনার ইনটিউশানের ওপর নির্ভর করে রিস্ক নিতে রাজি। বড়জোর তালা ভাঙার দামটা পকেট থেকে দিতে হবে আর ওপরওলার ধ্যাঁতানি খেতে হবে, এই তো? আমি ওটুকু হজম করতে পারব।' তারপর কনসটেবেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আশুতোষ, তালা ভাঙো।'

তালা ভাঙ্গার কাজটা যতটা সহজ মনে হয়েছিল, কার্যত সেটা হল না। বাইরে গিয়ে ড্রাইভারের কাছ থেকে গাড়ির টুলকিটটা নিয়ে এসেও আশুতোষ বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। মিনিট পনের-কুড়ি ধস্তাধস্তি করার পর সে বলল, "পারলুম না স্যার। চাবিওলা ছাড়া এটা খোলা যাবে না।'

'চাবিওলা এখানে কোথায় পাবে? সেই নাগেরবাজার যেতে হবে। না হলে শ্যামবাজার। তুমি বরং এক কাজ কর। গাড়িটা নিয়ে সেক্টর ফাইভে চলে যাও। ওখানে ইলেক্ট্রনিক কমপ্লেক্স পুলিশ স্টেশনে গিয়ে বাপ্পা সামন্তর খোঁজ করবে। বাপ্পা ওখানে গ্রুপ ডি, কিন্তু তালা খোলায় ওস্তাদ। যে কোনও তালা খুলতে পারে। তুমি এক্ষুনি গিয়ে বাপ্পাকে ধরে নিয়ে এস। ওসিকে আমার নাম করে বলবে আমি বাপ্পাকে ডাকছি। ওকে ওর যন্ত্রপাতিগুলো সঙ্গে আনতে বোলো। '

আদিত্য ঘড়ি দেখল। পৌনে নটা। এগারোটার মধ্যে বাড়ি না ফিরলে কেয়া তুলকালাম করবে। আদিত্যর অসুখের পর বাড়িতে যে রাতদিনের মাসি মোতায়েন হয়েছে সে আসলে কেয়ার গুপ্তচর। আদিত্য দেরি করে ফিরলে কেয়ার কাছে ঠিক খবর চলে যাবে। কিন্তু আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই ।

'এখানে একটা ভাল ক্যাফে আছে। আমি কেয়াকে নিয়ে একবার এসেছিলাম। আশুতোষ চাবিওলা ধরে আনা অব্দি ওখানে বসে কফি খাওয়া যেতে পারে। তুমি কফি খেও আমি চা খাব।' আদিত্য সুভদ্রকে বলল।

'আসার সময় দেখলাম তো ক্যাফেটা। বেশ তো, ওখানে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যাবে। কিন্তু এতটা তো হেঁটে যাওয়া যাবে না। গাড়ি নিয়ে যে আশুতোষ বেরিয়ে গেল। ওর মোবাইল নম্বর তো জানি না।'

'বোধহয় এখনও বেরোয়নি। যদি না বেরিয়ে গিয়ে থাকে, ওকে ছাত থেকে ডেকে নিতে পারবেন স্যার।' দীনবন্ধু তাড়াতাড়ি ছাতের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। আদিত্য আর সুভদ্র ওর পেছন পেছন।

সুভদ্র যখন আশুতোষকে চেঁচিয়ে ডাকছে তখন আদিত্য ছাতের চারপাশটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। এখানে খুব বেশি লোক আসে না। ধুলো, ময়লা, ইট-পাটকেল জমে আছে। একটা আমগাছের ডাল একদিকের পাঁচিল ছুঁয়েছে। অন্যদিকে একটা চিলেকোঠার ঘর। তালা নেই, শুধু হুড়কো টানা।

আশুতোষকে আটকানো গেছে। গাড়ি আদিত্যদের জন্যে দাঁড়িয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে আদিত্য দীনবন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, 'চিলেকোঠার ঘরটাতে কী আছে?'

'বাতিল জিনিসপত্তর, রাবিশ, বালির বস্তা এইসব। দরজা খোলাই আছে। ঢুকে দেখতে পারেন। তবে ঘরটা নোংরা হয়ে পড়ে আছে। ওখানে আমার খুব একটা যাওয়া হয় না।'

'ঠিক আছে। ফিরে এসে দেখব।'

সল্ট অ্যান্ড পেপার ক্যাফের সামনে আদিত্যদের নামিয়ে দিয়ে পুলিশের গাড়িটা চলে গেল। ঠিক হয়েছে, আশুতোষ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাপ্পাকে পাকড়াও করে রিপোজ বলে ওই বাড়িটাতে ফিরে আসবে এবং ফেরার পথে আদিত্যদের এই ক্যাফে থেকে তুলে নেবে ।

ক্যাফের মধ্যে ঢুকে আদিত্য লক্ষ করল আগের দিনের থেকে ভিড় অনেক বেশি। জানলার ধারে বসার জায়গাগুলো সব ক'টা ভর্তি। অতি কষ্টে ভেতর দিকে একটা দু'জনের টেবিল ফাঁকা পাওয়া গেল। আদিত্য দেখল কাউন্টারে মালা সরকার বসে আছে। তবে আদিত্যদের খেয়াল করেনি। আদিত্য ভদ্রমহিলার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হাত তুলল। মালা সরকার আদিত্যদের দেখতে পেয়েছে। ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে।

'আমার কী সৌভাগ্য। আবার আপনি আমাদের ক্যাফেতে আসবেন আমি ভাবতেই পারিনি।'

'আপনিই তো বললেন, আপনাদের কাস্টমাররা খুব লয়াল। একবার আসার পর বারবার এখানেই ফিরে আসে। আমিও তাই ফিরে এসেছি।' আদিত্য চওড়া করে হাসল ।

'আপনার স্ত্রী এলেন না?'

'না, আজ আমার বন্ধুর সঙ্গে এসেছি। আলাপ করিয়ে দিই, ইনি সুভদ্র মাজি, কলকাতা পুলিশের একজন অত্যন্ত দক্ষ অফিসার। আর ইনি মালা সরকার, এই ক্যাফের মালিক।'

সুভদ্রর পরিচয় শুনে মালা সরকারের মুখটা কি গম্ভীর হয়ে গেল? সে হাত তুলে নমস্কার করে বলল, আপনারা আজ এখানে এসে আমার খুব উপকার করলেন। আদিত্যবাবু, আমি আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। একটা বিপদে পড়েছি। আপনার সঙ্গে কি আলাদা করে একটু কথা বলা যাবে? মানে এখানে তো খুব ভীড়। আমার অফিসে আসবেন ?

'সুভদ্র, তুমি একটু বোসো। আমি এঁর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।'

'ঠিক আছে দাদা। বেশিক্ষণ নেবেন না। আশুতোষ এক্ষুনি চলে আসবে। আর তার থেকেও বড় কথা আপনাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। না হলে বৌদি আমাকে ছাড়বে না । '

সুভদ্রকে একলা বসিয়ে রেখে আদিত্য মালা সরকারের পেছন পেছন ক্যাফের অফিসে ঢুকল। অফিসটা কাউন্টারের পেছনে। অফিস না বলে একটা খুপরি বলাই ভাল। একটা টেবিল আর তার একদিকে একটা এবং অন্য দিকে দুটো চেয়ার রাখতেই ঘরটা ভরে গেছে। যেদিকে একটা চেয়ার আছে মালা সেদিকে বসল, আদিত্য উল্টোদিকে।

'আমি খুব সংক্ষেপে আমার বিপদের কথাটা বলছি। কয়েকদিন আগে রাত্তির সাড়ে ন'টা নাগাদ আমার ক্যাফেতে দুটো লোক এল। তখন ক্যাফে প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার ওয়েটার ওদের বলল, এত রাত্তিরে আর নতুন অর্ডার নেওয়া সম্ভব নয়। ওদের মধ্যে একজন, সে-ই মনে হয় দলের পাণ্ডা, বলল, তারা এখানে খেতে আসেনি, এখানকার মালকিনের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। মালকিন কোথায়?

'আমি ধারে কাছেই ছিলাম, বললাম, কী ব্যাপার? দলের পাণ্ডাটা বলল, আপনার সঙ্গে একটু কনফিডেনশিয়ালি কথা বলতে চাই। লোকটা কিন্তু কোনও অভদ্রতা করছিল না। কিন্তু ওর গলার ঠাণ্ডা ভদ্রতায় একটা ভয় দেখানো ব্যাপার ছিল। আমি বললাম, এখানেই বলুন যা বলার। আমার মাথায় ছিল লোকদুটো আমাকে ফিজিকালি অ্যাসল্ট করতে এলে আমার ওয়েটার এবং কুক আমাকে রক্ষা করবে। পাণ্ডাটা বলল, আপনি নিশ্চয় জানেন অশনি রায়ের কেসটা আবার উঠবে। আমাদের অনুরোধ, এখন অব্দি আপনি যা যা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তার থেকে এক চুলও ডেভিয়েট করবেন না। বিশেষ করে আপনি যে খুন

হওয়া মহিলার ছবি দেখে তাকে আইডেন্টিফাই করেছিলেন, বলেছিলেন এর সঙ্গেই অশনি রায় আপনার ক্যাফেতে আসতেন, সেই স্টেটমেন্ট-এ আপনি স্টিক করে থাকবেন। এটা আমাদের অনুরোধ। কিন্তু অনুরোধ না রাখলে আপনার নিরাপত্তার কোনও দায়িত্ব আমরা নিতে পারব না। বিশেষ করে যেহেতু আপনার ক্যাফেটা একেবারে নির্জন একটা জায়গায়।

'লোকদুটো এইভাবে আমাকে ভয় দেখিয়ে চলে গেল। আমি অশনিবাবুকে ফোন করলাম। উনি বললেন আপনাকে ফোন করতে। তবে এটাও বললেন যে আপনি অসুস্থ। তাই ফোনটা যেন কয়েকদিন পরে করি। আপনার শরীর এখন কেমন আছে?'

কিছুক্ষণ পরে আদিত্য সুভদ্রর কাছে ফিরে এসে দেখল সে একটা বড় আকারের ক্রোয়াস-কে বাগে আনার চেষ্টা করছে। পাশে বড় এক কাপ কালো কফি। আদিত্য তার অর্ডারটা কাউন্টারেই বলে এসেছিল। একটু পরে ক্যাফের ইউনিফর্ম পরা ওয়েট্রেস আদিত্যকে একটা ছোট টিপটে দার্জিলিং চা দিয়ে গেল সঙ্গে দুটি কমপ্লিমেন্টারি দিশি বিস্কুট। আদিত্য চায়ে একটা চুমুক দিয়েই বুঝল চা-টা চমৎকার। বাইরে দিঘিটা এখান থেকে একটু একটু দেখা যাচ্ছে। দিঘির ওপরের আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। ক্যাফের উল্টোদিকে একটা বাড়ি উঠছে। রাস্তার ওপরে বালির পাহাড়, তার ওপরে রাস্তার দু'টি নবীন কুকুর অহেতুক আনন্দে উদ্বেল হয়ে লাফালাফি করছে। ক্যাফের ভেতরে ভিড় আরও বেড়েছে। ভিড়ের ভেতরে কে যেন কাকে বলছে, 'ক্যাফে লাতে এখানকার স্পেশালিটি, ট্রাই করতে পার।' মহিলা কণ্ঠ। আর ঠিক তখনই সুভদ্রর ফোনটা বেজে উঠল।

এগারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছে আদিত্য। আশুতোষ বাপ্পাকে নিয়ে ফিরে এল পৌনে এগারোটা নাগাদ। তার পর থেকেই বাপ্পা বন্ধ দরজার তালাটা খোলার চেষ্টা করছে। তালাটা তাঁদোড় বটে। দেখতে দেখতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল, পৌনে বারোটাও বেজে গেল, বাপ্পা সামন্ত তালা খুলতে গিয়ে দরদর করে ঘামছে, তবু তালা খুলছে না।

'ফরেনের তালা স্যার। এগুলো ভয়ঙ্কর খিটকেল হয়।' বাপ্পা ম্লান হেসে বলল। 'তবে আমিও ছাড়ছি না।'

অবশেষে সাড়ে বারোটা নাগাদ বাপ্পার অধ্যাবসায়ের জয় হল। খুলে গেল বন্ধ দরজার তালা। তালা জয় করে বাপ্পার মুখে হাসি আর ধরে না।

ঘরের ভেতরটা পর্দা টানা। অন্ধকার। আশুতোষ পর্দাগুলো সরিয়ে দিতেই ঘর আলোয় ভরে গেছে। ঘরে ধুলো-টুলো কিছু নেই। মনে হয় নিয়মিত ঝাড়-পোঁচ হয়। ঘরের মাঝখানে বেশ বড় একটা খাট, সাদা বিছানা। আর কোথাও কোনও আসবাব নেই। তিনটে দেয়াল জুড়ে মস্ত বড় বড় আয়না। সিলিংটাও একটা আয়না। ঘরের সংলগ্ন একটা অ্যান্টিরুম এবং একটা বাথরুম আছে। অ্যান্টিরুমে একটা ড্রেসিং টেবিল, তার ওপরে কয়েকটা লিপস্টিক, একটা ফেস পাউডারের কৌটো। বাথরুমটা পরিষ্কার ঝকঝক করছে। বেসিনের ওপর আয়না দেওয়া ক্যাবিনেট। আদিত্য ক্যাবিনেট খুলে দেখল তার ভেতরেটা ফাঁকা।

'এই ঘরটা যে নিয়মিত ব্যবহার হয় সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। না হলে এত পরিষ্কার থাকত না। কিন্তু কী কাজে ঘরটা ব্যবহার হয় সেটা আন্দাজ করতে পারছ ? ' আদিত্য সুভদ্রকে জিজ্ঞেস করল।

'ভাসা ভাসা পারছি দাদা। পুরোটা পারছি না।' সুভদ্র অপ্রস্তুতভাবে হাসল। 'চল, ওপরে চিলেকোঠার ঘরটা দেখা যাক। এখানে মনে হচ্ছে না আর কিছু দেখার আছে।'

দীনবন্ধু ঠিকই বলেছিল। চিলেকোঠার ঘরটা জঞ্জালে ঠাসা। কিছু পুরোনো ম্যাগাজিন, একটা বাতিল গদি, ভাঙা চেয়ার গোটা দুয়েক, এক বস্তা বালি, কয়েকটা সুটকেস।

'সুটকেসগুলোতে কী আছে দেখব নাকি দাদা?'

'দেখতে পার।' আদিত্য অন্যমনস্ক ভাবে বলল। সে ছাইগাদার মধ্যে রতনের সন্ধান পেয়েছে।

‘এর মধ্যে শুধু পুরোনো জামাকাপড় রয়েছে।' সুভদ্র একটা সুটকেস খুলে হতাশ গলায় বলল। ‘আর এই সুটকেসটা তো ফাঁকা।' সুভদ্র দ্বিতীয় একটা সুটকেসও খুলে ফেলেছে।

আদিত্য শুনছিল না। সে বহু কষ্টে জঞ্জাল পেরিয়ে ঘরের একটা কোণ থেকে একটা ছাতা বার করে আনছিল। ধুলো পড়ে তার রঙটা মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু এক ঝলক দেখলে বোঝা যায় এক সময় ছাতাটার রঙ ছিল সাদা। ছাতাটা বন্ধ অবস্থায় ছিল। আদিত্য সেটাকে খুলতে গিয়ে দেখল কয়েকটা শিক একেবারে ভেঙে গেছে। সন্দেহ নেই, সেই কারণেই ছাতাটাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

‘আমার যা দেখার দেখা হয়ে গেছে। আমাকে কিন্তু এবার বাড়ি যেতে হবে।' আদিত্য চিলেকোঠার ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার হাতে সেই ভাঙা ছাতা । ‘আরও দুটো সুটকেস বাকি আছে, দেখে নিই।' সুভদ্র আরো একটা সুটকেস খোলার উপক্রম করল।

‘দেখে নাও। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।'

একটু পরে সুভদ্র বেরিয়ে এল। ‘নাঃ, সুটকেস গুলোতে কিচ্ছু নেই।' তারপর আদিত্যর হাতে ছাতাটা দেখে বলল, ‘আপনি ওটা কী নিয়ে এলেন?'

‘দেখতেই তো পাচ্ছ। একটা ভাঙা ছাতা। '

‘ওটা দিয়ে কী হবে?'

‘এখন আর কিছু হবে না। ওটা তো ভেঙে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যখন ওটা আস্ত ছিল তখন কী কাজে লাগত?'

‘এটা তো সাদা ছাতা। ট্র্যাফিক পুলিশ ছাড়া বিশেষ কাউকে সাদা ছাতা ব্যবহার করতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। কিন্তু এটা তো ট্র্যাফিক পুলিশের ছাতা নয়। এটা বেশ সৌখিন একটা ছাতা।

‘এই সাদা ছাতাটা রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে ব্যবহার হত বলে মনে হয় না। এটা খুব সম্ভবত রিফ্লেকটার হিসেবে ব্যবহার করা হত। যেরকম রিফ্লেকটার স্টিল ফটো বা সিনেমা তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়।' আদিত্য ছাতাটাকে পরীক্ষা করতে করতে বলল।

‘তার মানে নিচের বন্ধ ঘরটা স্টুডিয়ো হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মনে হচ্ছে, নোংরা ছবি বা ব্লু ফিল্ম তোলার স্টুডিও। আয়নাগুলোও একটা অশ্লীল ইংগিত দিচ্ছে।' আদিত্য ঈষৎ উত্তেজিত গলায় যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল।

‘এই ঘরটাতে ব্লু ফিল্ম তোলা হয়?' সুভদ্রর গলায় এখনও কিছুটা সংশয় আছে। ‘একদম তাই। আমি প্রায় নিশ্চিত সেটাই হয়। আমি এই ব্যাপারেও নিশ্চিত যে অশনি রায়ের ছবিগুলো এই ঘরের অ্যান্টিরুমটা থেকে তোলা হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, অশনি টের পায়নি। খেয়াল করেছ কিনা জানি না, অ্যান্টিরুম আর মূল ঘরটার মধ্যে একটা স্কাইলাইট আছে। ওখানে ক্যামেরা বসালে সিলিংএর আয়নাটা পরিষ্কার দেখা যায়। ওই আয়না থেকেই তোলা হয়েছিল ছবিগুলো। সেই জন্যে মনে হচ্ছিল অশনি ডান হাতে ঘড়ি পরে আছে। আসলে সে বাঁ হাতেই ঘড়িটা পরেছিল, কিন্তু আয়নাতে সেটা ডান হাত মনে হচ্ছিল। কিন্তু ঘরটা যে এইসব কাজে এখনও নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে এটা দীনবন্ধু জানে না?'

‘আমিও তো দাদা এইটাই ভাবছিলাম।'

'ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখা যাক।'

দীনবন্ধু দোতলায় ছিল। কিন্তু অনেক জেরা করেও ওর কাছ থেকে কোনও সদুত্তর পাওয়া গেল না। ও বলছে, প্রত্যেক শুক্রবার রাত্তিরে ও বাড়িটা তালা বন্ধ করে দেশে যায়। ফিরতে ফিরতে সোমবার দুপুর হয়ে যায়। কাজে ঢোকার সময়ই ও মালিককে বলে নিয়েছিল প্রত্যেক সপ্তাহে ওকে দেশে যেতে দিতে হবে কারণ দেশের বাড়িতে ওর বউ-বাচ্চা ছাড়াও বুড়ো বাবা-মা আছে। মালিক ওর শর্তে রাজি হয়েছিল। তার

মানে হল, মালিক যদি আলাদা করে ওই ঘরটা সমেত পুরো বাড়িটাই প্রত্যেক শনিবার এবং রবিবারের জন্যে কাউকে ভাড়া দেয়, সেটা দীনবন্ধুর টের পাবার কথা নয়।

দীনবন্ধু মাহাতো লোকটা হয় হদ্দ বোকা আর না হয় ভীষণ চালাক কিন্তু বোকা সেজে থাকে। দুটোর মধ্যে কোনটা সেটা বোঝার জন্যে সুভদ্র মাজি দীনবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে চলল।

(৪)

সেদিন দেরি করে বাড়ি ফেরার শাস্তি হিসেবে আদিত্যকে তিন-চারদিন বাড়িতে বন্দী থাকতে হল। তারপর তার মাথায় একটা ফন্দি এল। ডাঃ রায় তাকে নিয়মিত মর্নি ওয়াক করতে বলেছেন এটা কেয়া জানে। অতএব ডাঃ রায়ের কথাটা বলে তার কাছে প্রাতঃভ্রমণের অনুমতি চাওয়া যেতেই পারে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেয়াকে অনুমতি দিতে হয়েছে। তবে শর্ত হল, আদিত্য দেশবন্ধু পার্কের ভেতরেই হাঁটবে, বাইরে কোথাও যাবে না। একটু বাইরে বেরোনোর লোভে আদিত্য আজকাল তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ছে। ক'দিন তাড়াতাড়ি উঠে ভোরের দীনেন্দ্র স্ট্রিট, তাদের পাড়ার পার্ক, প্রাতঃভ্রমণকারী স্বাস্থ্যান্বেষী বৃদ্ধ সবই বেশ আপন লাগছে তার।

ভোরবেলাকার রুটিন ছবিগুলো আদিত্যর মুখস্থ হয়ে গেছে। পার্কের উল্টো ফুটপাতে যে মনিহারি দোকানটা আছে সেটা বেশ ভোর ভোর খুলে যায়। দোকানের মালিক বাবলু, যার ভাল নামটা আদিত্য জানে না, সারা সপ্তাহ দোকানের পেছনেই থাকে। বাবলুর পরিবার থাকে হুগলির কোনও গ্রামে। প্রতি রবিবার দোকান বন্ধ রেখে বাবলু বাড়ি যায়। বাবলুর দোকানে সাবান-টুথপেস্ট-ক্রিম-পাউডার ছাড়াও খাতা-পেন্সিল, পাঁউরুটি-বিস্কুট এমনকি দুধ বা ডিমও পাওয়া যায়। আদিত্য পার্কে চক্কর মারতে মারতে দ্যাখে দুধ নিয়ে মাদার ডেয়ারির গাড়ি এল, সাইকেল ভ্যান

চেপে পাঁউরুটি নিয়ে এল পাঁউরুটিওলা। তার বাক্সে পাঁউরুটি ছাড়াও কেক এবং দিশি বিস্কুট থাকে। তারও কিছু পরে মোটর বাইকের দু'দিকে দুটো লোহার খাঁচায় ডিমের স্তূপ সাজিয়ে ডিমওলা আসে। আদিত্য হাঁটা থামিয়ে অবাক হয়ে দ্যাখে কী অসাধারণ নৈপুণ্য লোকটার। একটাও না ভেঙে দিনের পর দিন দোকানে দোকানে হাজার হাজার ডিম পৌঁছে দিচ্ছে।

হাঁটা সেরে বাড়ি ফেরার পথে আদিত্য ওই দোকানটা থেকে দুধ পাঁউরুটি কেনে। মাঝে মাঝে ডিম। দিশি বিস্কুট। ডাক্তার আদিত্যকে কুসুমটা বাদ দিয়ে ডিম খেতে বলেছে। ডিমের কুসুমগুলো আপাতত ফ্রিজে জমা হচ্ছে। ডিমের কুসুমের সঙ্গে চকলেট মিশিয়ে কেয়া নাকি এক রকম কেক বানাতে শিখেছে। আরও কয়েকটা কুসুম জমা হলে সে বলেছে সেই কেকটা বানাবে। বানিয়ে ইস্কুলে নিয়ে যাবে, আদিত্যকে দেবে না। কারণ ডিমের কুসুম খাওয়া আদিত্যর বারণ। ফলে ওই কেক বানানোর ব্যাপারে আদিত্যর কোনও উৎসাহ নেই। কুসুম ছাড়া ডিম খেতে আদিত্যর অতি জঘন্য লাগে। তার মনে হয়, কুসুম ছাড়া ডিম যেন রাম ছাড়া রামায়ণ।

আজ ডিম পাঁউরুটি কিনতে কিনতে আদিত্যর কী খেয়াল হল, সে বাবলুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা আনস্লাইসড পাঁউরুটি রাখেন না?'

'রাখি তো। ওই যে দেখুন ব্রাউন ব্রেডের নিচে আছে।'

আদিত্য দেখল স্তূপীকৃত ব্রাউন ব্রেডের নিচে দু'টি আনস্লাইসড কোয়ার্টার পাউন্ড রুটি পড়ে আছে। সে বার করে হাত দিয়ে সামান্য টিপে দেখল তেমন নরম নয়। তার মানে বাসি।

'এগুলোকে তো টাটকা মনে হচ্ছে না।' আদিত্য আনস্লাইসড রুটি দুটো হাতে নিয়ে বাবলুকে দেখাল।

'এগুলো পরশুদিনের রুটি। নেবেন না দাদা। আপনি আমার রোজকার খদ্দের। আপনাকে মিথ্যে বললে কাল এসে চেপে ধরবেন। আপনি যদি আনস্লাইসড রুটি চান, আমি কাল সকালে রুটিওলার কাছ থেকে নিয়ে রাখব। আপনি কি হাফ পাউন্ড নেবেন, নাকি কোয়ার্টার পাউন্ড?'

আনস্লাইসড রুটিগুলোর গায়ে কম্পানির নাম লেখা আছে। ডিলিশাস কনফেকশানার। আদিত্য বলল, “আমি একটা হাফ পাউন্ডের লোফ নেব। কোন কম্পানি আনস্লাইসড রুটি ভাল বানাচ্ছে?'

‘আমার দোকানে তো এই ডিলিশাসের রুটিই আসে। খুব যে একটা চলে তা নয়। দু'চারজন অবশ্য নিয়মিত নেয়। তাদের জন্যে সকালে আসা টাটকা রুটি সরিয়ে রাখতে হয়। আপনি যদি নিতে চান আপনার জন্যেও কাল সরিয়ে রাখব।'

'ঠিক আছে। আধ পাউন্ড রেখে দেবেন। আমি এই সময় এসে নিয়ে যাব।' ‘আজ কিছু লাগবে না?”

‘বাড়িতে পাঁউরুটি আছে। আপনি শুধু আধ লিটার দুধ দিন।'

‘একটা নতুন বিস্কুট এসেছে। খেয়ে দেখবেন?'

‘নাঃ। আজ থাক। বাড়িতে অনেক বিস্কুট জমে গেছে। আচ্ছা, আমাদের ছোটবেলায় সেন বেকারির আনস্লাইসড রুটি পাওয়া যেত। এখনও পাওয়া যায়?”

‘সেন বেকারি? না দাদা আমি সেন বেকারির পাঁউরুটি আর রাখি না। আগে রাখতাম। এখন ওদের কোয়ালিটি খুব খারাপ হয়ে গেছে। বছর দুয়েক আগে আমার এক কাস্টমার এসে দেখাল, সেন বেকারির একটা আনস্লাইসড কোয়ার্টার পাউন্ড রুটি কাটার পর ভেতর থেকে একটা মরা আরশোলা বেরিয়েছে। ছোট আরশোলা নয়। দেড় ইঞ্চির বড় আরশোলা। কী ঘেন্নার কথা বলুন তো। এরা কীভাবে রুটি বানায় কে জানে? কিছু কমপ্লেন আগে থেকেই ছিল। কিন্তু ওই আরশোলা বেরোনোর পর থেকে আমি সেন বেকারির রুটি আর রাখি না।'

‘যে আপনাকে রুটি দেয় তাকে বললেন না?'

‘বললাম তো। রুটিওলা বলল, আমি কী করব? আমি কি রুটি বানাই? তোমার নেওয়ার হলে নাও, না হলে নিও না। আসলে রাস্তার চায়ের দোকানগুলোতে সেন বেকারির রুটি এখনও বেশ চলে। কারণ ওদের রুটির দাম অনেকটাই কম। ওইসব দোকানের খদ্দেররা বেশিরভাগই মুটে-মজুর। তাদের কাছে দামটা বড় ব্যাপার, কোয়ালিটি একটু খারাপ হলেও কিছু এসে যায় না। আর ঘুগনিতে একবার ডুবিয়ে নিলে রুটির নিজস্ব স্বাদ আর কী থাকে বলুন?'

বাড়ি ফেরার পথে আদিত্য ভাবছিল বাবলু মুদি একটু বেশি কথা বলে ঠিকই, কিন্তু ওর কথা থেকে অনেক সময় কিছু কাজের খবরও বেরিয়ে আসে। রুটির থেকে দেড় ইঞ্চি আরশোলা বেরোনোর ব্যাপারটা আদিত্যকে চিন্তায় ফেলেছে।

কেয়া ইস্কুলে বেরিয়ে গেলে আদিত্য বুঝতে পারে না একা একা বাড়িতে বসে কী করবে। কিছুক্ষণ অবশ্যই গান শোনা যায়, কিছুক্ষণ ঘুমোনো যায়, স্নানাহারেও কিছুটা সময় ব্যয় করা যায়, কিন্তু এই সব করেও যে সময়টা উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে তাকে কায়দা করা আদিত্যর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে আশার কথা এটাই যে এই সপ্তাহটা কোনও ক্রমে কাটিয়ে দিতে পারলে সামনের সোমবার থেকে আদিত্য বাইরে বেরোবার অনুমতি পেয়ে যাচ্ছে।

কেয়া বেরোল সাড়ে দশটা নাগাদ, পৌনে এগারোটা থেকে তার ক্লাশ। আজকাল গাড়ি কেনার ফলে সে বেশ দেরি করে বেরোচ্ছে। কাজের মাসি রান্নাঘরে ছ্যাঁকছোঁক করছে। মনে হয় আদিত্যর মধ্যাহ্নভোজনের প্রস্তুতি চলছে। আদিত্য কিছুক্ষণ খবর কাগজ পড়ল, কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে অশনি রায়ের কেসটা নিয়ে ভাবল, তারপর যখন মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে এবার চান করতে যাবে, তখনই কলিং বেলটা বেজে উঠেছে।

আদিত্য লক্ষ করেছে কলিং বেল বাজলেই রান্নার মাসি কালা হয়ে যায়, পাছে তাকে হেঁটে গিয়ে সদর দরজাটা খুলতে হয়। অতএব আদিত্যই উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। বিমল। হাতে মিষ্টির বাক্স। আদিত্যকে দেখে চওড়া করে হাসল।

'নাতি হয়েছে স্যার। তাই খবরটা দিতে নিজেই চলে এলাম।' বিমলকে ভীষণ খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল।

আদিত্য ভাবল, নাতনি হলেও কি বিমলকে এতটা খুশি-খুশি দেখাত? সে মুখে বলল, 'এস, এস, ভেতরে এস। এত ভাল খবর। বাচ্চা, বাচ্চার মা সব ভাল আছে তো?'

'ভাল আছে স্যার। সবাই ভাল আছে। আজকেই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছে। মানে ওর শ্বশুরবাড়ি কোদালিয়ায় ফিরেছে। আমাদের বাড়িতে তো জায়গা নেই।'

বিমল আদিত্যর পেছন পেছন বসার ঘরে ঢুকে মিষ্টির বাক্সটা টেবিলের ওপর রাখল। আদিত্য তার ইজিচেয়ারে বসে বিমলকে সামনের চেয়ারে বসতে বলল।

'তোমার বউ কোথায়?'

"ও এখন কিছুদিন মেয়ে এবং নাতির সঙ্গে কোদালিয়ায় থাকবে। মেয়েটার কাঁচা শরীর, বাচ্চাটাও তো একেবারে ছোট। মাকেই তো দেখতে হবে, তাই না স্যার?'

'সে তো বটেই। তা তুমি খাওয়া দাওয়া করছ কোথায়?'

'কোথায় আর করব স্যার, ওই রাস্তার হোটেলে। প্রথমে ভেবেছিলাম নিজেই রান্নাবান্না করব। কিন্তু দেখলাম ও আমার দ্বারা হবে না। যেটা রাঁধি সেটা মুখে দেওয়া যায় না।'

'শোনো, আজ দুপুরে তুমি আমার বাড়িতে খেয়ে যাবে। মানে, আজ দুপুরে আমরা এক সঙ্গে ভাত খাব।'

'সে কী? না, না। বলা নেই কওয়া নেই এরকম হুট করে চলে এসেছি। আপনার খুব অসুবিধে হবে। তাছাড়া বৌদিও তো বাড়ি নেই। না স্যার আমি একটু পরেই উঠে পড়ব। আপনাকে আর জ্বালাতন করব না।'

'কিছু জ্বালাতন নয়। আমাদের এখন একজন রান্নার মাসি আছে। সে-ই সব ব্যবস্থা করবে। তোমাকে শুধু কিছুক্ষণ একা একা বসে থাকতে হবে। আমি যতক্ষণ চান করব ততক্ষণ। তুমি একটু বোসো আমি আগে রান্নার মাসিকে বলে আসি।'

একটু গাঁইগুঁই করে বিমল খেতে রাজি হয়ে গেল।

রান্নার মাসি কেয়ার গুপ্তচর হতে পারে, কেউ এলে সদর দরজা খুলে দিতে গড়িমসি করতে পারে, কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে বাড়তি রান্না করতে তার কোনও আপত্তি কোনও দিন কেউ দেখেনি। মাসি জানাল, রেফ্রিজারেটারে যা শাক-সব্জি, মাছ-মাংস আছে তাই দিয়ে বিমলের খুব ভালোই হয়ে যাবে। আদিত্যর জন্যে অবশ্য অন্য ব্যবস্থা। কেয়ার কড়া হুকুম, ট্যালট্যালে চিকেন স্টু, এক কাপ ভাত আর এক বাটি টক দই, এর বাইরে আর কিছু আদিত্যকে দেওয়া যাবে না।

খাওয়া শেষ করে বিমল বলল, "আমি আর বেশিক্ষণ বসব না স্যার। আপনার এখন বিশ্রাম করা দরকার। শুধু একটা খবর দিয়ে চলে যাব।'

আদিত্যরও একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। এই ক'দিনে তার বিলক্ষণ দিবানিদ্রার অভ্যাস হয়েছে। সে একটা হাই অর্ধেক চেপে বলল, 'কি খবর?'

'সোমনাথ বাগের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমার যে বন্ধু সোমনাথের জায়গায় চাকরি পেয়েছে তার এক বন্ধু, সে আবার সোমনাথকেও চেনে, সন্ধানটা দিয়েছে।' 'কী সন্ধান দিয়েছে?' আদিত্য খেয়াল করল তার ঘুমটা খানিকটা চলে গেছে। ওই বন্ধুর বন্ধুটার সঙ্গে এসপ্লানেড না কোথায় যেন একটা সোমনাথের দেখা হয়েছিল। সোমনাথ ওকে বলেছে সে দেশে ফিরে গিয়ে একটা মনিহারি দোকান করেছে। খুব ভাল আয় হচ্ছে। দোকান করার টাকা কোথায় পেল, জিজ্ঞেস করতে ও বলেছে এক কাকা ওকে টাকাটা দিয়েছে। আমাদের এরকম কাকা কেন থাকে না স্যার?'

'ওর দেশ কোথায়?' আদিত্য ভাবছে।

‘শেয়ালদার মেন লাইনে চাকদা বলে একটা জায়গা আছে স্যার। সেখানে। আমি কি গিয়ে খোঁজ-খবর নেব?'

'এক্ষুনি দরকার নেই। '

‘তা হলে আমাকে এখন কী করতে বলেন?'

‘তোমাকে আপাতত কিচ্ছু করতে হবে না। কোনও দরকার হলে আমি তোমাকে ফোন করব।'

আদিত্য এখনও ভাবছে।

বিমল চলে যাবার পর আদিত্য ঘুমোবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রথম দশ-পনের মিনিট কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মনের মধ্যে নানা চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। সবই অশনি রায় সংক্রান্ত। সেন বেকারির ব্যাপারটাও মাথায় ঘুরছে। অশনি রায়ের রহস্যময়ী বান্ধবী, বাঙ্গুর এভিনিউ-এর ফ্ল্যাটে জোড়া খুন, সেন বেকারির পাঁউরুটির ব্যবসা, ড্রাগ অ্যাডিক্ট জয় তরফদারের মৃত্যু, অনন্যা সাহার স্বামী শুভব্রত সাহার আত্মহত্যা সবটাই মনে হচ্ছে এক সুতোয় বাঁধা। সুতোর জোড়গুলো অবশ্য এখনও অনেক জায়গায় বেমজবুত হয়ে আছে। ওগুলো শক্ত করা দরকার। তবু সব মিলিয়ে একটা হালকা ছবি আদিত্য দেখতে পাচ্ছে। ছবিটা ভাবতে ভাবতে আদিত্যর ঘুম এসে গিয়েছিল।

হয়ত মিনিট পঁয়তাল্লিশ ঘুমিয়েছিল আদিত্য, মোবাইল বাজার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। আদিত্য দুপুরে ঘুমোতে যাবার আগে সাধারণত মোবাইলটা সাইলেন্ট মোডে দিয়ে শোয়, কারণ এই সময়টা নানা রকম ফেরিওলা ফোন করে উৎপাত করে। 'আজ বিমল আসার ফলে মোবাইলটা সাইলেন্ট মোডে দিতে ভুলে গিয়েছিল।

ঘুম চোখে আদিত্য দেখল তার মোবাইলে মিতা অধিকারী নামটা ফুটে উঠেছে। মিতা অধিকারীটা আবার কে? ভাবতে ভাবতে আদিত্য ফোনটা ধরল। ‘আমি মিতা বলছি। মিতা অধিকারী। আপনাকে ওই অশনি রায়ের ব্যাপারটায় ফোন করেছিলাম, মনে আছে?'

আদিত্যর এবার মনে পড়েছে। তার ঘুমটাও কেটে গেছে।

‘মনে আছে। অবশ্যই মনে আছে। কেমন আছেন?'

‘ভাল আছি। কম্পানির কাজে কলকাতায় এসেছিলাম, আজ রাত্তিরে ফিরে যাচ্ছি। এই ক'দিন এত ব্যস্ত ছিলাম যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। খুব ইচ্ছে ছিল দেখা করার।'

‘দেখা হতো কিনা জানি না। আমি অসুস্থ হয়ে কিছুদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। তারপর বাড়ি ফিরে গত এক সপ্তাহ বাড়িতে। আমার স্ত্রীর কঠোর নির্দেশে ভিজিটার বন্ধ ।”

‘সে কী! কী হয়েছিল? সিরিয়াস কিছু?'

‘হৃদয়ঘটিত সমস্যা। ধূমপানের কুফল। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে আপাতত বিপদ এড়ানো গেছে। বুকের দু'দিকে দুটো স্টেন্ট বসেছে। এখন ভালই আছি।'

‘আই অ্যাম ভেরি সরি আদিত্যবাবু। আপনি এরকম অসুস্থ জানলে আমি কিছুতেই ফোন করতাম না। আপনি বিশ্রাম নিন। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন। আজ রাখি?' আদিত্য খেয়াল করল 'রাখি' বলেও মিতা অধিকারী ফোনটা রাখছে না। হয়ত কিছু একটা বলার আছে। সে বলল, 'আপনি মনে হয় কিছু একটা বলতে ফোন করেছিলেন।'

‘হ্যাঁ, তা করেছিলাম। কিন্তু আপনার এই শরীরে সেটা বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।'

‘আপনি বলুন না। আমার শরীর এখন ঠিক আছে।'

‘আসলে আমি ওই মহিলাকে আবার দেখেছি।'

“ওই মহিলা মানে যার সঙ্গে অশনি রায় দারুচিনিতে আসতেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই মহিলাই ।'

‘কোথায় দেখলেন ? '

‘আগে যেখানে দেখেছিলাম, সেখানে। আমাদের কম্পানির মালিক মুকেশ ঝুনঝুনওয়ালার ঘরে।'

‘আপনি র‍্যানডমলি এসে যখন ভদ্রমহিলাকে আপনাদের মালিকের ঘরে দেখছেন তখন ধরে নিতে হবে ওই ভদ্রমহিলা বেশ ঘন ঘন আপনাদের মালিকের ঘরে আসেন।' ‘আমারও ঠিক এটাই মনে হয়েছে। কিন্তু মালিককে তো সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না উনি কে, তাই সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারিনি।'

‘অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করেননি?'

‘করেছিলাম। গ্লোবাল-এর হেড অফিসে আমার এক বন্ধু কাজ করে, সে আমার সঙ্গে দারুচিনি-তেও কাজ করত, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

‘কী জিজ্ঞেস করলেন ? '

‘জিজ্ঞেস করলাম, মালিকের চেম্বার থেকে যে মহিলাকে বেরোতে দেখলাম, উনি কে? আগেও অনেকবার ওকে মালিকের চেম্বার থেকে বেরোতে দেখেছি।'

‘আমার বন্ধু বলল, তোর জানার কী দরকার? ওসব বড় ঘরের বড় বড় ব্যাপার। তোর আমার মতো হেঁজিপেঁজি ওসব ব্যাপার যত কম জানে ততই ভাল। তারপর আমার বন্ধু গলা নামিয়ে বলল, শুনলাম, ওই মেয়েটাকে নিয়ে মালিকের সঙ্গে মালিকের বউ-এর নাকি খুব ঝামেলা চলছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটার নাম কী? বন্ধু বলল, আমি জানি না। জানার দরকারও নেই। তোর এত কৌতূহল কেন বুঝতে পারছি না।'

“ওই ভদ্রমহিলা কি আপনাদের মালিকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে আসেন নাকি কোনও কাজে আসেন?'

‘আমি এটা খুব সাবধানে ওখানকার কাউকে কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কেউ কিচ্ছু বলতে পারল না। কাজে এলে নিশ্চয় কেউ না কেউ বলতে পারত। যখন কেউ বলতে পারছে না তখন ধরে নিতে হবে উনি পারসোনাল ভিজিটেই আসেন।

‘আর কিছু জানতে পারলেন?'

‘না, আর কিছু না। মোটামুটি এইটুকুই জেনেছি। ভাবলাম আপনাকে জানিয়ে রাখি। হয়ত আপনার কাজে লাগবে।'

‘ভাল করেছেন। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে অশনি রায়ের কি সম্প্রতি দেখা হয়েছে?' ‘অশনি রায়ের সঙ্গে? কই না তো।'

'ঠিক আছে। ভাল থাকবেন।'

‘আপনিও ভাল থাকবেন। পরের বার কলকাতায় এলে দেখা করব।' “নিশ্চয়।’

কেয়া এল ছ'টার একটু পরে। সারা বিকেল আদিত্য এই মুহূর্তটার জন্যে অপেক্ষা করছিল। এবার এক সঙ্গে চা খাবে। কেয়া এসে আদিত্যর কপালে হাত দিয়ে দেখল। যেন আদিত্যর জ্বর হয়েছে। বলল, ‘শরীর কেমন?

‘ভাল। দুপুরে ঘুমিয়েছি। তার আগে বিমল মিষ্টি নিয়ে এসেছিল। ওর নাতি হয়েছে। বউ মেয়ের কাছে আছে। তাই বিমল হোটেলে খাচ্ছে। ওকে দুপুরে খাইয়ে দিলাম।'

‘ভাল করেছ। কিন্তু ফ্রিজে তো বিশেষ কিছু ছিল না।'

‘যা ছিল তাই দিয়েই বেশ ভাল হয়ে গেছে। কাতলা মাছ ছিল। পালং শাক ছিল। কালকের রান্না করা খানিকটা চিকেনও ছিল। মাসি বড়ি আর মুলো দিয়ে একটা পালং শাকের ঘন্ট যা রেঁধেছিল না!'

‘তুমি খেলে?’

‘একটু খেয়েছি। দেখেই লোভ লেগে গেল। একটু না খেলে বিমলের পেট খারাপ হতো।'

‘তোমার খাওয়া উচিত হয়নি। মাসি রান্না করে ভাল, কিন্তু ভীষণ তেল দেয়। এই লোভেই তুমি গেলে।'

মাসি চা দিয়ে গেছে। চা খেতে খেতে আদিত্য দেখল সুভদ্র হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করেছে। বনানী দাসের খবর পাওয়া গেছে। উলুবেড়িয়ার কাছে একটা আশ্রমে থাকে । সারাদিন নাকি সাধন-ভজন নিয়েই আছে। আপনি চাইলে একদিন কথা বলে আসা যেতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১)

'আমি পল্লব সেন বলছি। শুনলাম আপনার নাকি শরীর ভাল নেই?' 'হ্যাঁ, শরীরটা একটু গণ্ডগোল করছিল। হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়েছিল। এখন ভাল আছি। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন আমার শরীর খারাপ?

'আপনাকে ফোন করেছিলাম। আপনার স্ত্রী ফোনটা ধরলেন। বললেন আপনি হাসপাতালে ।

"ওহো। আপনি ফোন করেছিলেন আমি জানতামই না। আমার স্ত্রী আমাকে বলতে ভুলে গেছে। আসলে ওর ওপর দিয়ে এত চাপ গেছে, ভুলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।'

'ঠিকই তো। তা আপনার কী হয়েছিল?'

'হার্টের প্রবলেম। দুটো আর্টারিতে ব্লক ছিল। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হল। দুটো স্টেন্টও বসেছে। এখন বাড়িতে। সুস্থ আছি। গতকাল থেকে অফিসে বেরোনোর পারমিশান পেয়েছি।'

ওরেব্বাবা! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! আপনাকে তা হলে বরং পরে কখনও ফোন করব। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন এই কামনা করি।'

'আমি এখন মোটামুটি সুস্থ। আপনি বলুন না কেন ফোন করেছিলেন। 'বিশেষ কিছু নয়। আমার বাড়িতে এই শুক্রবার একটা গানের বৈঠক অরগানাইজ করেছি। আজকাল তো ভাল শ্রোতা পাওয়া যায় না। সেদিন আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হল আপনি সমঝদার লোক। তা, এই ওস্তাদ পাকিস্তান থেকে আসছেন। দিল্লি আর মুম্বাইতে পাবলিক পারফরমেন্স দেবেন। একটা দিনের জন্যে কলকাতায় আসছেন। এখানে কোনও পাবলিক পারফরমেন্স দিচ্ছেন না। আমি অনেক কষ্টে ওঁকে আমার বাড়িতে গাইতে রাজি করিয়েছি। গুণী মানুষ। টাকা-পয়সার চাহিদা বিশেষ নেই। কিন্তু ভাল শ্রোতা চান। শুনেছেন, কলকাতার মানুষ গান-বাজনার সমঝদার। তাই রাজি হয়ে গেছেন। কিন্তু সেই পুরোনো কলকাতা তো আর নেই। ভাল, সমঝদার শ্রোতা তো হাতে গোনা।'

'এই পাকিস্তানি ওস্তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কী? কোথায় গান শিখেছেন?' আদিত্য খানিকটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল। পাকিস্তানি ওস্তাদদের সবার গান তার ভাল লাগে না। বিশেষ করে যে ঘরানাটা ওখানে সব থেকে বেশি চলে, সেই শাম-চৌরাসি ঘরানার গান আদৌ আদিত্যর কাপ অফ টি নয়।

'ওস্তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটাই তো সব থেকে ইন্টারেস্টিং। আপনি জানেন আসাদ আলি খাঁ বলে ফৈয়জ খাঁর এক ভাইপো না ভাগ্নে ছিল যাকে উনি ওঁর সব থেকে সুযোগ্য শিষ্য মনে করতেন? বীণকার আসাদ আলি নয়, ভোকালিস্ট আসাদ আলি। জানেন এর কথা ?

'ওরকম একজন ছিলেন জানতাম, তবে তেমন ভাল করে জানি না। ওঁর খুব বেশি রেকর্ড তো পাওয়া যায় না। উনি বোধহয় দেশভাগের ঠিক আগে বা ঠিক পরে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। ওঁর একটা বারোঁয়া শুনেছি। আর বোধহয় একটা ছায়া-কেদার। খুবই ভাল। কিন্তু আসাদ আলির তো এতদিন বেঁচে থাকার কথা নয়।'

'বাঃ, আপনি তো আসাদ আলির কথা জানেন। খুব বেশি লোক কিন্তু ওঁর কথা জানে না। যিনি আসছেন তিনি আসাদ আলি নন। আসাদ আলির শেষ দিকের শিষ্য। বয়েস বোধহয় ষাটের আশেপাশে। বিশুদ্ধ আগ্রা ঘরানা, যেটা আজকাল খুব বেশি শোনা যায় না। ওঁর কলকাতায় আসার কারণটাও ইন্টারেস্টিং। জানেন তো ফৈয়জ খাঁ সাহেব কলকাতায় আসতেন হিন্দুস্তান কম্পানিতে গান রেকর্ড করার জন্যে। এসে উনি বউবাজারে

কম্পানিরই একটা বাড়িতে থাকতেন। এই ওস্তাদ সেই বাড়িটা দেখতে আসছেন। এখান থেকে যাবেন বরোদা। ওখানে ফৈয়জ খাঁ সাহেবের কবর আছে। সেটা দেখে উনি মুম্বাই আর দিল্লিতে গান গেয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন। পাকিস্তানের মিউজিক ক্রিটিকরা এঁর গানের প্রশংশা করতে গিয়ে একেবারে নালে-ঝোলে হয়ে গেছে। সরি, উত্তেজনার বশে মুখ দিয়ে নর্থ-ক্যালকাটার ভাষা বেরিয়ে গেল। আসবেন ওঁর গান শুনতে?'

'আপনি যা বললেন তারপর তো না যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ক'টা থেকে গান শুরু?

'সন্ধে সাড়ে ছ'টা থেকে। ন'টা অব্দি চলবে। তারপর ডিনার। আমার বাগবাজারের বাড়িতে। ও হ্যাঁ। ওস্তাদের নামটাই তো বলা হয়নি। ওস্তাদের নাম শাহবাজ খান। '

দুপুর থেকে বৃষ্টি নামল। খবর হবার মতো বৃষ্টি নয়, মুগ্ধ হয়ে দেখার মতোও নয়। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, বর্ষাকালে যেমন সারাদিন ধরে ঝরে যায়। একঘেয়ে, বিরক্তিকর। এই বৈশাখ মাসেই বর্ষা এসে গেল নাকি? আদিত্য আপিসে এসেছিল। অশনি রায়ের কেসটার জন্যে অন্য ছোটখাট কয়েকটা কাজ বাকি পড়েছিল। মূলত কিছু পেপার ওয়ার্ক। আদিত্য ভেবেছিল সারাদিন কাজ করে বিকেলে গান শুনতে যাবে। কেয়া বলেছিল গাড়িটা আদিত্যকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আদিত্য রাজি হয়নি। বাগবাজার যাবার পক্ষে মেট্রোটাই সুবিধেজনক। তাছাড়া একটু হাঁটাও হবে। ডাক্তার আদিত্যকে রোজ হাঁটতে বলেছে। এখন এই বৃষ্টিটাই ঝামেলা বাঁধাল। খুব জোরে পড়ছে না, কিন্তু ভিজিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

একটা জিনিস আদিত্যর বেশ অদ্ভুত মনে হচ্ছে। কানু ধরা পড়ার পরে সেই ব্ল্যাকমেলার একেবারে চুপ মেরে গেছে। কানুর কথা যদি সত্যি হতো, অর্থাৎ কানা মুমতাজ যদি এর পেছনে থাকত, তা হলে সে কি আবার চেষ্টা করত না? এমন হতে পারে, যে মেয়েটির ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেলের দাবী এসেছে, সে এবং কানু মিলে ব্ল্যাকমেলটা প্ল্যান করেছে। মুমতাজ-টুমতাজ কেউ এর পেছনে নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, এরা ব্ল্যাকমেল করার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করল কেন? আরও প্রশ্ন, মুমতাজ বড় মাপের মাফিয়া। সে নিজে দেশে না থাকলেও তার সাগরেদরা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। তারা যদি জানতে পারে নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্যে কানু মিথ্যে করে মুমতাজকে ফাঁসাচ্ছে তা হলে কানুকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। কানু নিজেও সেটা জানে। তা হলে এই ঝুঁকিটা কানু নেবে কেন? ওই মেয়েটিকে খুঁজে বার করতে পারলে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত। কিন্তু কোথায় সে?

আবার অন্যদিকে রাজারহাটের বাড়িটাতে পুলিশ ওত পেতে বসে আছে। কিন্তু এখন অব্দি কোনও দল বা ব্যক্তি ছবি তোলার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এসে পৌঁছয়নি। দীনবন্ধু মাহাতো লোকটা যতটা জানার ভান করছে তার থেকে হয়ত অনেক বেশি জানে। হয়ত সুভদ্রর সঙ্গে প্রথম দিন কথা বলার পরই তার সন্দেহ হয়েছে। সে দলের লোকদের সাবধান করে দিয়েছে। পুলিশ দীনবন্ধুর মোবাইল ফোনটা বাজেয়াপ্ত করে কল-লিস্ট খুঁটিয়ে দেখছে। তার জায়গা-জমি-বাড়ি-টাকাকড়ি কী আছে সেটাও দেখছে। তাছাড়া এখনও রোজ তার জেরা চলছে। সুভদ্র বলছে, এই ম্যারাথন জেরার চাপে আজ না হোক তো কাল দীনবন্ধু ভেঙে পড়তে বাধ্য। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল, এখন অব্দি কোনও দিকেই কোনও দিশা দেখা যাচ্ছে না।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল, বৃষ্টি ধরার নামগন্ধ নেই। কেয়া মেসেজ করেছে, যদি গান শুনতে যাও উবার নেবে। কিপটেমি করবে না। আদিত্যর বাড়ি ফিরতে দেরি হবে বলে কেয়াও আজ দু'তিনজন কলিগের সঙ্গে সাউথ সিটিতে শপিং করতে গেছে।

আদিত্যর কোনও ধারণাই ছিল না আজকাল উবার পেতে কতটা দেরি হয়। ফলে যখন সে বাগবাজারে সেন বাড়ির বড় হলঘরটাতে পৌঁছল তখন ওস্তাদ শাহবাজ খানের তানপুরা বাঁধা হয়ে গেছে। তবলিয়া অঙ্কুশ সাহা হারমোনিয়ামের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তবলা বাঁধছে। হারমোনিয়াম বাদক শান্তনু ঘোষ প্রবীণ শিল্পী, বহু বড় বড় গায়কের সঙ্গে আদিত্য এঁকে বাজাতে শুনেছে।

মাটিতে শতরঞ্চির ওপর সাদা চাদর পেতে ঢালাও বসার ব্যবস্থা। এক নজর দেখে আদিত্যর মনে হল ঘরে জনা কুড়ির বেশি শ্রোতা হবে না। অনেকটা জায়গা এখনও খালি রয়েছে। আদিত্য একেবারে পেছনে গিয়ে বসল। পল্লব সেন ছাড়াও কয়েকটা চেনা মুখ চোখে পড়ল। তার মধ্যে একজন তারাপদ গাঙ্গুলি, গানের এনসাইক্লোপিডিয়া, আদিত্যর বাবার বিশেষ স্নেহধন্য। তারাপদ কাকা একেবারে সামনে পল্লব সেনের ঠিক পাশে বসেছেন। তারাপদ গাঙ্গুলি বা পল্লব সেন কেউই আদিত্যকে দেখতে পাননি ।

আদিত্য ভাবল, ভালই হয়েছে। দেখতে পেলে হয়ত সামনে ডাকতেন। সামনে বসতে আদিত্যর সংকোচ হয়, বিশেষ করে এই কারণে যে গানের কোনও কোনও মুহূর্তে তার মুখে ও শরীরে যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির জন্ম হয় সেটা সে কাউকে দেখাতে চায় না।

দেখে মনে হয় ওস্তাদজির বয়েস ষাটের নিচেই হবে। শীর্ণ মুখায়বব। মাথার চুল কাঁচাপাকা। পূরবী রাগ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলেন। আগ্রার স্টাইলে নোম তোম আলাপ করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর মধ্যলয়ে ফৈয়জ খাঁর সেই বিখ্যাত গান মথুরা না যাও মোরে কানহে'। আদিত্যর ভালই লাগছিল, বলা যায় বেশ ভাল লাগছিল, তবে নালে-ঝোলে হবার মতো কিছু মনে হল না। পূরবীর পর কেদার এবং সব শেষে কেদারে কোমল নিষাদ লাগিয়ে চাঁদনি কেদার। শেষতম রাগের ঝাঁপতাল বন্দিশটা, জানা গেল, ওস্তাদজির গুরু আসাদ আলি খাঁ সাহেবের। সাড়ে আটটার মধ্যে গান শেষ। পল্লব সেন একটা ঠুংরি শোনার আর্জি জানালেন। ওস্তাদজি সবিনয়ে জানালেন আল্লা নিশ্চয় আর একদিন তাঁকে ঠুংরি শোনানোর সুযোগ করে দেবেন, কিন্তু আজ তাঁকে উঠতেই হবে। কোনও এক জায়গায় নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।

গান শুনে আদিত্যর ভালই লাগল, কিন্তু মন ভরল না। পল্লব সেনের কথা শুনে সে হয়ত একটু বেশি আশা করে ফেলেছিল। আদিত্য ভাবছিল, আসলে এই ওস্তাদজি, তাঁর দাদা-গুরু ফৈয়জ খাঁকে হুবহু নকল করার চেষ্টা করেন। এঁর গলাটাও অনেকটা অল্প বয়সের ফৈয়জ খাঁর মতো। কিন্তু সমস্যা দুটো। হুবহু ফৈয়জ খাঁকে নকল করলে, তা সে যত ভাল নকলই হোক, কেউ খুব বড় শিল্পী হতে পারবেন না। সত্যিকারের বড় শিল্পী হতে গেলে নিজস্ব একটা রাস্তা, একটা স্টাইল খুঁজে বার করতেই হবে। আর তার থেকেও বড় কথা, ফৈয়জ খাঁর মতো মহান গায়ককে বড়জোর ওপর ওপর নকল করা যায়। কিন্তু তাঁর গলায় সুরের যে সূক্ষ্মতম কারুকাজ, যে ফাইনার নুয়ান্সেস, সেটা অন্য কারও পক্ষে রপ্ত করা অসম্ভব।

পাশের ঘরে নটার সময় ডিনার দেওয়া হবে, এখনও তার মিনিট কুড়ি দেরি আছে। পল্লব সেন ঘোষণা করলেন, কেউ যদি ডিনারের আগে একটা-দুটো ড্রিঙ্ক নিতে ইচ্ছা করেন তাঁদের জন্য পাশের ঘরে একটা ছোট বার আছে। আদিত্যর একটা হুইস্কি খেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সে এখনও ডাক্তারের কাছ থেকে মদ্যপানের ছাড়পত্র পায়নি। তাছাড়া তারাপদ গাঙ্গুলির উপস্থিতিতে তার পক্ষে মদ্যপান অসম্ভব। পল্লব সেন আদিত্যকে দেখতে পেয়েছেন।

'আরে আপনি এসেছেন। আমি তো ভাবলাম আপনি আসতেই পারলেন না।' পল্লব সেন দূর থেকে গলার স্বর উঁচু করে বললেন।

আদিত্য পায়ে পায়ে পল্লব সেনের দিকে এগিয়ে গেল।

'কেমন লাগল গান?' পল্লব সেন সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন।

'ভাল লাগল। তবে আমি আর একটু ভাল আশা করেছিলাম।'

'আমি তো বলব এত ভাল আগ্রা ঘরানার গান অনেকদিন শুনিনি। আপনার ভাল লাগল না? '

'না, না। ভাল লাগল। খুবই ভাল লাগল। তবে কিনা এই বয়সেও উনি ফৈয়জ খাঁর ছত্রছায়া থেকে বেরোতে পারলেন না। সত্যিকারের বড় শিল্পী হতে গেলে একটা নিজস্ব স্টাইল তো ডেভেলপ করতে হবে।'

'আমিও তো ঠিক এটাই বলছিলাম। ফৈয়জ খাঁকে যারাই অন্ধভাবে নকল করতে গেছে, প্রত্যেকের সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। ওই জিনিসের নকল হয় না।' তারাপদ গাঙ্গুলি পেছন থেকে বললেন। আদিত্যকে তিনি

তখনও খেয়াল করেননি। তারপর আদিত্যকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'আরে বাবা, আমার কী সৌভাগ্য, কাকে দেখছি! ' তারপর একটু থেমে বললেন, ‘তাই ভাবছি এটা কে? এ তো বেশ গান-টান বোঝে মনে হচ্ছে। অসিতদার ছেলে, গান বুঝবে না?'

আদিত্য লাজুক গলায় বলল, ‘ভাল আছেন তারাপদকাকা?'

‘এই বয়েসে যতটা ভাল থাকা যায় ততটা ভাল আছি। শরীরে নানা রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সেসব নিয়ে কথা বলতে ভাল লাগে না। তবে বাড়ি থেকে খুব একটা বেরুতে পারি না।'

‘আপনি আদিত্যবাবুকে চেনেন?” পল্লব সেন তারাপদ গাঙ্গুলির দিকে তাকিয়ে ঈষৎ বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

‘চিনি মানে? একে আমি জন্মাতে দেখেছি। এ কার ছেলে জানো? এ হচ্ছে অসিতদার ছেলে।’

‘অসিতদার ছেলে মানে?” পল্লব সেন এখনও আদিত্যর পরিচয়টা ঠিক ধরতে পারছেন না। ‘আমি তো জানি উনি আদিত্য মজুমদার। বেসরকারি গোয়েন্দা এবং একই সঙ্গে গানের সমঝদার।'

‘বেসরকারি গোয়েন্দা!' তারাপদ গাঙ্গুলি হতভম্ভ। বোঝাই যাচ্ছে, আদিত্যর এই পরিচয়টা তাঁর জানা ছিল না। আদিত্য লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে। অসিতবর্ণ মজুমদারের ছেলে বেসরকারি গোয়েন্দা। তারাপদকাকা কী ভাবছেন?

ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করার জন্যে আদিত্য মরিয়া হয়ে বলল, ‘তারাপদকাকা, আপনি তো জানেন বাবা মারা যাবার পর আমাদের অবস্থা কী হয়েছিল। বাড়িটাও বিক্রি হয়ে গেল। আমার লেখাপড়াটাও বন্ধ হয়ে গেল। অনেক কিছু চেষ্টা করলাম, কিছুই হল না। শেষে নেহাতই পেটের দায়ে গোয়েন্দাগিরি ধরেছি। করতে ভাল লাগে না। কাউকে বলতেও ভাল লাগে না। কিন্তু এটাই বাস্তব।'

তারাপদ গাঙ্গুলি চুপ করে আছেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। নীরবতা ভেঙে পল্লব সেন বললেন, ‘অসিতদা মানে কি আলিপুরের অসিতবর্ণ মজুমদার ?'

‘তাছাড়া কে?’ তারাপদ গাঙ্গুলি সম্বিত ফিরে পেয়েছেন। ‘এদের বাড়িতে আমি কার গান শুনিনি? নাইনটিন ফরটিজ-এ দু'বার ফৈয়জ খাঁও শুনেছি। আমি অবশ্য তখন খুবই ছোট।'

‘আমার বাবা আপনার বাবার বন্ধু ছিলেন। আপনাদের বাড়ির মজলিসের কথা আমি বাবার মুখে শুনেছি।' পল্লব সেন আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন।

উর্দিপরা খানসামা দরজায় দেখা দিয়ে বলল, পাশের ঘরে ডিনার তৈরি। তারাপদ গাঙ্গুলি ডিনার খাবেন না। বয়সের কারণে আজকাল বাইরের কোনও খাওয়া তাঁর হজম হয় না। তিনি বিদায় নেওয়ার পর আদিত্য খানিকটা স্বস্তি বোধ করছে।

ব্যুফে। মস্ত টেবিলে অসংখ্য খাদ্যবস্তু সাজানো । দিশি বিদেশির সমাহার। বেশিরভাগ খাদ্যই অবশ্য আদিত্যর চলবে না। আদিত্য ঠিক করল চিকেন রোস্ট এবং বয়েল্ড ভেজটেবলস-এ নিজেকে আটকে রাখবে। শেষে বড়জোর একটা ক্যারামেল পুডিং চলতে পারে।

‘আপনার কাছে একটা আর্জি ছিল।' ডিনার খেতে খেতে আদিত্য পল্লব সেনকে বলল।

‘বলুন, বলুন।

‘প্রথম যেদিন আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম, সেদিন বলেছিলাম আমি একজন সাংবাদিক। বাঙালির ব্যবসা নিয়ে একটা লেখা তৈরি করছি। তাই আপনার সঙ্গে দেখে করতে চাই। আপনি তো জানেন আমি নিজের পরিচয়টা মিথ্যে বলেছিলাম। আজ কিন্তু আর মিথ্যে বলব না। সত্যি কথাটা হল, কিছুদিন আগে স্থানীয় পুলিশ আপনাদের ডিসট্রিবিউশন ম্যানেজার শুভব্রত সাহার মৃতদেহ কৃষ্ণনগরে তার কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার করেছে। খবরটা আপনি নিশ্চয় জানেন।'

‘জানি। কিন্তু শুভব্রত সাহা তো আত্মহত্যা করেছে। সে নাকি কম্পানির টাকা চুরি করে ধরা পড়ে গিয়েছিল।'

‘কম্পানির থেকে সেটাই বলা হচ্ছে। স্থানীয় পুলিশও তাতে সায় দিচ্ছে। কিন্তু আসল সত্যটা বোধহয় আলাদা। আমরা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে চাই। তার জন্যে কৃষ্ণনগরে আপনাদের ফ্যাকটরিতে যেতে হবে। তদন্ত ছাড়াও কৃষ্ণনগর যাওয়ার আর একটা কারণ নস্টালজিয়া। আসলে সেন বেকারির পাঁউরুটির ব্যাপারে আমার একটা ভীষণ দুর্বলতা আছে। আমাদের বাবুর্চি ছিল নুরুল। সে সেন বেকারির ছাড়া অন্য কারও পাঁউরুটি রান্নাঘরে ঢুকতেই দিত না। তাই আমার সেন বেকারির ইতিহাসটা জানতে ইচ্ছে করে। ফ্যাকটরিটা দেখতে ইচ্ছে করে। ওখানে একটা ভিজিট অরগানাইজ করা যাবে?'

‘আপনি একাই যাবেন?'

‘না। একা যাব না। এটা একটা ফর্মাল ইনভেস্টিগেশন। আমার সঙ্গে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর যাবে। ব্যবস্থা করতে পারবেন ?'

পল্লব সেন ভাবছেন। কী ভাবছেন আদিত্যর পক্ষে আন্দাজ করা শক্ত। সে পল্লব সেনের মুখের দিকে তীর্থের কাকের মত তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে পল্লব সেন বললেন, ‘ঠিক আছে। ব্যবস্থা করা যাবে। আপনারা কবে যেতে চান?'

‘ধরুন যদি পরের সপ্তাহে যাই। সকালে যাব। সারাদিন ফ্যাক্টরি দেখব। সন্ধের ট্রেনে চলে আসব। আপনি শুধু একটু বলে দেবেন আমরা যাচ্ছি।'

‘সেটা তো একটা ফোন করে দিলেই হবে। পরের সপ্তাহে কবে যেতে চান?' ‘সোম বা মঙ্গল? অবশ্য তার আগে সুভদ্র, মানে সেই পুলিশ ইন্সপেক্টার যিনি আমার সঙ্গে যাবেন, তার সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে হবে। আপনাকে যদি শনিবার জানিয়ে দিই?'

‘নো প্রবলেম। জানিয়ে দেবেন। আরে মিহির, তুমি কোথায় লুকিয়ে ছিলে? এক্সকিউজ মি।' পল্লব সেন আদিত্যকে রেখে এগিয়ে গেলেন।

ডিনার শেষ করে আদিত্য এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কথা বলার মতো চেনা তেমন কেউ নেই। একটু দূরে পল্লব সেন কিছু মহিলা পরিবৃত হয়ে রয়েছেন। আদিত্যর মনে হল, এই অবস্থায় ওকে বিব্রত না করে চুপি চুপি কেটে পড়াই ভাল। পরে তো ফোনে কথা হবেই। হলঘরের দরজা দিয়ে বেরোতে যাচ্ছে, নারীকণ্ঠে নিজের নাম শুনে থমকে যেতে হল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কণ্ঠের অধিকারিণী সুন্দরী, ব্যক্তিত্বময়ী, অভিজাত ।

‘আদিত্যবাবু, আপনি ভাল করে খেয়েছেন তো? আমি তো কোনও দিকেই ভাল করে নজর দিতে পারলাম না।'

‘আমি খুব ভাল করে খেয়েছি। আপনি কত দিকে নজর দেবেন?' আদিত্য লাজুক গলায় জানাল।

“ও হো। আমি তো নিজের পরিচয়টাই এখনও দিইনি। আমি মালবিকা সেন, পল্লবের বৌদি।'

‘পরিচয় দেবার দরকার নেই। আমি আগেই বুঝতে পেরেছি।’আদিত্য সৌজন্যমূলক হাসল ।

‘আমি আপনাদের কথাবার্তা ওভারহিয়ার করছিলাম। পল্লবের মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু আপনাদের বাড়ির কথা আমার স্বামী সৌরভ খুব বলত। ও অনেকবার আমার শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে গান শুনতে গেছে। আজ আর আপনাকে আটকাব না, রাত্তির হয়ে গেছে। পরে একদিন আপনাকে সস্ত্রীক আসতে বলব। তখন অনেক গল্প করা যাবে।'

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আদিত্য ভাবছিল মালবিকা সেন জানলেন কী করে সে বিবাহিত? নাকি তার বয়সের যে কোনও পুরুষকে বিবাহিত বলে ধরে নেওয়াটাই স্বাভাবিক?

শনিবারের আগেই আদিত্য পল্লব সেনকে ফোন করল।

‘সুভদ্রর সঙ্গে কথা বলেছি। ও বলছে সোমবারটা ওর একটু কাজ আছে। কিন্তু সপ্তাহের বাকি দিনগুলো ও ফ্রি। সেক্ষেত্রে কি মঙ্গলবার যাওয়া যেতে পারে?'

‘শুনুন। আপনারা মঙ্গলবার যান। সারাদিন ফ্যাক্টরি দেখুন। তারপর রাত্তিরটা কিন্তু ওখানে থেকে যেতে হবে। ফ্যাক্টরির মধ্যে আমার একটা গেস্ট হাউস আছে। আপনারা সেখানে রাত্তিরটা থাকবেন। আমিও রাত্তিরে কোনও একটা সময় ফ্যাকটারিতে পৌঁছে যাব। পরদিন ভোরবেলা আমাদের ফ্যাক্টরি থেকে মাইল পনের দূরে জলঙ্গী নদীর একটা দ্বীপে আপনাদের নিয়ে যাব। ওখানে অপূর্ব সব পাখি আসে। পাখি-টাখি দেখে আপনারা আমার সঙ্গে কলকাতা ফিরে আসবেন। রাজি তো?'

‘অবশ্যই রাজি। এত চমৎকার প্রস্তাবে কেউ অরাজি হতে পারে? তবে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে। আমি যে একজন গোয়েন্দা আর আমার সঙ্গে যিনি যাচ্ছেন তিনি যে একজন পুলিশ অফিসার এই পরিচয়গুলো প্লিজ কাউকে জানাবেন না। পুলিশ বা গোয়েন্দার কাছে লোকে ওপেন আপ করতে চায় না। নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থাকে। সেটা আমাদের কাজের পক্ষে অসুবিধেজনক। আপনি বরং বলতে পারেন আমরা দুজন সাংবাদিক। বাঙালির পুরোনো ব্যবসাগুলো নিয়ে একটা লেখা তৈরি করছি। সেই সূত্রেই সেন বেকারির কারখানাটা দেখতে চাই।'

‘ঠিক আছে তাই বলব। আর কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে আমার ফ্যাক্টরি যাওয়ার ডিরেকশনটা আমি হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি। আপনারা ট্রেনেই যাচ্ছেন তো?'

‘হ্যাঁ। আমরা ট্রেনেই যাব।'

‘ঠিক আছে। তা হলে মঙ্গলবার রাত্তিরে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। রাত্তিরটা আপনারা আমার সঙ্গে ডিনার করবেন। আমি আমার ফ্যাক্টরিতে সমস্ত দরকারি ইনফরমেশন দিয়ে রাখব।'

(২)

দুটো দিন আদিত্য বাড়িতেই ছিল। সারাদিন ভাবছিল। দ্বিতীয় দিন বিকেলে সুভদ্র এসে হাজির। কেয়া তখনও ফেরেনি।

‘এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একবার চান্স নিয়ে দেখি, যদি বাড়িতে থাকেন।' ‘তুমি এসে খুব ভাল করলে। না এলে আমিই ফোন করতাম। সামনের মঙ্গলবার আমরা কৃষ্ণনগর যাচ্ছি সেটা তো আগেই কথা হয়ে গেছে। কিন্তু যাবার আগে দু'একটা কাজ সেরে নেওয়া দরকার। কী কাজ বলছি। দাঁড়াও দু'কাপ চায়ের কথা বলে আসি।' রান্নার মাসিকে চায়ের ফরমাশ জানিয়ে আদিত্য তার কালো নোটবইটা নিয়ে ফিরে এল। নোটবইএর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা জায়গায় থেমে গিয়ে নিজের মনেই বলল, 'হ্যাঁ, পাওয়া গেছে।'

সুভদ্র উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

‘দেখো, তুমি মৃত্তিকা মিত্র, পার্থ মিত্রর মার্ডার কেসটার ব্যাপারে আমাকে যা যা বলেছিলে আমি সব নোট করে রেখেছি। নোটে দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে, পার্থ মিত্র সেন বেকারির সোল ডিস্ট্রিবিউটার ছিল এবং সেই সুবাদে সেন বেকারির ওই ফ্ল্যাটটাতে থাকত। কিন্তু মৃত্তিকা কী করত সেটা কোথাও লেখা নেই। তুমি এটা বলনি আর আমিও জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। মৃত্তিকা মিত্রর ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানা জরুরি। জানো তো একটা কথা আছে, খুনিকে ধরতে গেলে যে খুন হয়েছে তার বিষয়ে ভাল করে জানা দরকার। মৃত্তিকা কি কিছু করত, নাকি পিয়োর হোমমেকার ?”

‘এটা আমার বলা উচিত ছিল। কোনও কারণে মিস হয়ে গেছে। মৃত্তিকা মিত্র একটা প্রাইভেট কম্পানিতে চাকরি করত। অ্যাকাউন্টস-এর কাজ, মানে কম্পিউটারে হিসেবপত্তর রাখা, ব্যাঙ্কে যাওয়া, কর্তাদের মিটিং-এর আগে হিসেবপত্র তৈরি করা, এইসব।'

‘তুমি এটা জানলে কী করে?'

'প্রথমে আমিই তো কেসটা ইনভেস্টিগেট করছিলাম। আমি মৃত্তিকা মিত্রর কাজের জায়গায় খোঁজ নিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, তারপর বল।'

'তারপর আর বলার কিছু নেই। মৃত্তিকা মিত্র সম্বন্ধে এইটুকুই জানতে পেরেছিলাম।' 'মৃত্তিকার কম্পানিটার নাম কী ছিল?'

'নামটা ঠিক মনে নেই। খাতায় লেখা আছে। আমি বাড়ি ফিরে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি। তবে এটা মনে আছে অফিসটা ক্যামাক স্ট্রিটে।'

'ঠিক আছে। নামটা তুমি পরে মেসেজ করে দিও। এবার বল, যে দু'জনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, মানে কানু আর দীনবন্ধু মাহাতো, তাদের কাছ থেকে কি আর কিছু জানা গেল ? '

'নাঃ। বিশেষ কিছুই আর জানা যায়নি।' সুভদ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমরা ভেবেছিলাম কানুর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে তাকে ফলো করে দেখা হবে সে কোথায় যায়, কার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু কানু পোড় খাওয়া ক্রিমিনাল। সে জানে তার কোনও ভিজিটার এলে পুলিশ সেই ভিজিটারকে ফলো করতে পারে। তাই সে কারও সঙ্গে দেখা করছে না। এদিকে কানু কিন্তু বেল চাইছে না। যদি ও বেল চাইত আমরা খুব একটা অপোজ করতাম না। মানে একটা আজেবাজে উকিল দাঁড় করাতাম যাতে ও বেলটা পেয়ে যায়। তারপর বেল নিয়ে ও কোথায় যায় ওকে ফলো করে দেখতাম। কিন্তু ও বেলও চাইছে না। আমরা তো নিজের থেকে ওকে ছেড়ে দিতে পারি না। ছেড়ে দিলে ও যদি বেপাত্তা হয়ে যায় তা হলে কেলেঙ্কারি হবে।'

'কিন্তু আমি শিয়োর ওর দোসর যে মহিলা রয়েছে বলে আমরা ভাবছি, ও তার সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবে। তুমি তো জান, জেল হাজতে টাকা দিলে সবই পাওয়া যায়। হাজতের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে একটা মোবাইল ফোন পাওয়া খুব শক্ত নয়। খোঁজ নিয়ে দেখ কানু এই রকম কোনও মোবাইল হাতে পেয়েছে কিনা।'

'পায়নি দাদা। আমরা জানি পায়নি। কারণ ওর ওপর সব সময় কড়া নজর রাখা হয়েছে। ও মোবাইলে ফোন করবে কখন?'

'শোন । তিনটে কাজ তোমাদের করতে হবে। এক, কানুর ওপর নজরদারিটা শিথিল করতে হবে। দুই, হাজতে তোমাদের একটা লোক ঢোকাতে হবে যে কানুকে তার মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করতে দেবে। তিন, কানু যাকে ফোন করবে তার নম্বরটা ট্রেস করতে হবে। দ্যাখো, কানু ফাঁদে পা দেয় কিনা।'

'বুঝেছি দাদা। চেষ্টা করে দেখছি।'

'আচ্ছা, আর আমাদের দীনবন্ধু মাহাতোর কী খবর?'

'লোকটা অতিশয় ধূর্ত। প্রথম দিন যা বলেছিল সেটাতেই স্টিক করে আছে। খুব অল্প লোকই এতদিন ধরে ইন্টারোগেশনের চাপ নিয়ে তার বয়ানে স্টিক করে থাকতে পারে। একটা ব্যাপার থেকে মনে হচ্ছে লোকটা কিছু একটা লুকোচ্ছে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, দীর্ঘ দিন ধরে একই প্রশ্ন করে গেলে কোনও নির্দোষ লোক ছোটখাট ডিটেলের ব্যাপারে নিজেকে কনট্রাডিক্ট করতে বাধ্য। এই লোকটা কিন্তু একবারের জন্যেও নিজেকে কনট্রাডিক্ট করেনি। তাই মনে হয় ও খুব কনশাসলি মিথ্যে বলছে। যেন একটা পার্ট মুখস্থ করে এসে আওড়ে যাচ্ছে।'

'আর ওই বাড়িটাতেও নিশ্চয় আর কেউ আসেনি?"

'নাঃ। কেউ আসেনি। আমরা সারভিলেন্স বজায় রেখেছি। তবে একটা পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। আন্ডারওয়ার্ল্ডে আমাদের অনেক ইনফর্মার আছে তো? ঐ ছবিগুলো দেখে একজন ইনফর্মারকে নাকি কেউ বলেছে সে ওই মেয়েটিকে চেনে। আমি এই লোকটার সঙ্গে এখনও কথা বলতে পারিনি। আমাদের

ইনফর্মারকে বলেছি তাকে লালবাজারে আমার কাছে নিয়ে আসতে। আমাদের ইনফর্মার বলেছে কাল দুপুরে লোকটাকে নিয়ে আসবে। আপনি কি তখন থাকতে পারবেন ?

'নিশ্চয় পারব। অবশ্যই পারব।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে সুভদ্র যখন চলে গেল কেয়া তখনও ফেরেনি। রাত্তিরে সুভদ্রর কাছ থেকে মেসেজ পেল আদিত্য। মৃত্তিকা যে কম্পানিতে কাজ করত তার নাম গ্লোবাল ট্রেডিং কম্পানি ।

যে লোকটা সুভদ্রর উল্টোদিকে বসে আছে তার তামাটে রঙ, পাকানো শরীর, হাড়ালো মুখ, শিরা ওঠা হাত। উচ্চতা বেশি নয়, সাড়ে পাঁচ ফুটের কমই হবে। শরীরটা এক সময় নিয়মে থাকত, এখন পেশিগুলো কিছুটা শিথিল হয়ে গেছে। মুখে অত্যাচারের ছাপ স্পষ্ট। লোকটার বয়েস এবং পেশা কী হতে পারে আদিত্য আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল। আদিত্যর মনে হল, লোকটার বয়েস পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। পেশায় নাবিক? ট্র্যাপিজের খেলোয়াড়? প্রাক্তন হকি বা ফুটবল প্লেয়ার? লোকটার মধ্যে সম্ভবত একটা বিদেশি রক্তও আছে। আদিত্যর শেষ অনুমানটা যে ঠিক সেটা অচিরেই বোঝা গেল।

'আপনার নাম?' সুভদ্র লোকটাকে জিজ্ঞেস করল।

'সাইমন রবার্ট।' লোকটার বাংলায় সামান্য টান আছে।

'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান? '

'হ্যাঁ। তবে বর্ন অ্যান্ড এট আপ ইন ক্যালকাটা।'

'থাকেন কোথায় ?

'কিডেরপুর। ফ্যানসি মার্কেটের কাছে।'

'কী করেন?"

'আগে রেসিং হর্স-এর জকি ছিলাম। এখন অড জবস করি।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ। রেসিং হর্সের জকি। এটা আদিত্যর মাথায় আসেনি। চেহারার সঙ্গে মিলছে। এরা খুব লম্বা হয় না। ওজনটাও কম রাখতে হয়। কিন্তু টাফ, মাসকুলার হতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে, জকি জীবন শেষ হবার পর লোকটা শরীরের ওপর নানারকম অত্যাচার করেছে।

'অড জবস মানে কী ধরনের কাজ?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'টলিগঞ্জে একটা হর্স রাইডিং স্কুল আছে। আই টীচ রাইডিং দেয়ার। ইন দ্য ইভিনিং আই ওয়ার্ক ইন আ নাইট ক্লাব।'

'হোয়াট সর্ট অফ ওয়ার্ক?'

'আই ওয়ার্ক অ্যাজ এ সিকিউরিটি গার্ড।'

'সিকিউরিটি গার্ড না বাউন্সার?'

'বিট অফ বোথ।'

"এতে চলে যায় ?'

'ভাল চলে না। দ্যাটস দ্য রিসন আইম হিয়ার। আই এক্সপেক্ট টু গেট সাম মানি ফর দ্য ইনফরমেশন আইম গনা প্রোভাইড।'

'আপনি বলছেন আপনি ছবির ওই মেয়েটিকে চেনেন। আপনি কী করে মেয়েটির আইডেন্টিটি নিয়ে শিয়োর হচ্ছেন?' সুভদ্র সরাসরি কাজের কথায় এল।

'লুক স্যার। দ্য গার্ল ইন দ্য পিকচার ইজ শবনম, হু ওয়াজ কনসিডার্ড টু বি দ্য পর্ন কুইন অফ ক্যালকাটা টেন ইয়ারস ব্যাক।'

'পর্ন কুইন? শবনম?' সুভদ্র খবরটা হজম করার চেষ্টা করছে।

'বাট হাউ ক্যান ইউ বি শিওর ইটস হার?' আদিত্য এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

'আই অ্যাম শিয়োর বিকজ আই ওয়াজ হার কো অ্যাক্টর ইন আ নাম্বার অফ স্ট্যাগ ফিল্মস, প্রোভাইডেড অফ কোর্স ইউ কল দ্যাট অ্যাক্টিং।' সাইমন রবার্ট মিটি মিটি হাসছে।

আদিত্যর মনে হল লোকটার নির্লজ্জতার মধ্যে একটা নিরাসক্তি আছে। ঘরে স্তব্ধতা। আদিত্য এবং সুভদ্র দু'জনেই নিজের মতো করে সাইমন রবার্টকে বোঝার চেষ্টা করছে।

কিছুক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভেঙে সুভদ্র বলল, "তা হলে আপনি বলতে চাইছেন যে এই মহিলার সঙ্গে আপনি একাধিক পর্ন ফিল্ম-এ কাজ করেছেন এবং তাই আপনি জোর দিয়ে বলতে পারছেন যে এই মহিলার নাম শবনম।'

'দ্যাটস কারেক্ট। আমি ঠিক এটাই বলতে চাইছি। আমি জানি এটা শবনমের ছবি বিকজ আই নো হার বডি লাইক দ্য ব্যাক অফ মাই হ্যান্ড।'

'আপনি তো বললেন আপনি ঘোড়দৌড়ের জকি ছিলেন। হঠাৎ এইসব আর্ট-কালচারের লাইনে এলেন কী করে?।' আদিত্য হালকা গলায় বলল।

'ইটস আ লঙ স্টোরি। কিন্তু আমাকে বলতে হবে কারণ পুরোটা না বললে আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আর আমাকে বিশ্বাস না করলে আপনারা আমাকে আমার ইনফরমেশনের জন্যে টাকাও দেবেন না। অ্যান্ড আই রিয়ালি নিড দ্য মানি।'

সাইমন রবার্ট কিছুক্ষণ থেমে দম নিল। তারপর বলতে শুরু করল, 'দেখুন আমার একটা পুলিস রেকর্ড আছে। তাই কিছু মিথ্যা বললে বা কিছু চেপে গেলে আপনারা ঠিক ধরে ফেলবেন। দেয়ারফোর আই শ্যাল টেল দ্য ট্রুথ অ্যাণ্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ।

'আমি প্রায় কুড়ি বছর ধরে ক্যালকাটা রেস কোর্সে জকির কাজ করেছি। ম্যাডরাস, ব্যাঙ্গালোর, পুনে, উটি এইসব জায়গাতেও কাজ করেছি, কিন্তু আই ওয়াজ মেনলি স্টেশনড ইন ক্যালকাটা। অ্যান্ড আই ওয়াজ আ গুড জকি। আই ওয়াজ মেকিং এনাফ মানি ফর আ ডিসেন্ট লিভিং বাট আনফরচুনেটলি অবসেসিভ গ্যাম্বলিং রুইন্ড মি। আমার বাজারে প্রচুর ধার হয়ে গেল। ধার শোধ দিতে গিয়ে আমি ঘুষ নিতে শুরু করলাম। ঘুষ নিয়ে কয়েকটা শিয়োর রেস হেরে গেলাম। এবং ফাইনালি আমি ধরা পড়ে গেলাম। কট রেড হ্যান্ডেড। কয়েক বছরের জেল হয়ে গেল। মোর ইম্পরটেন্ট, মাই কেরিয়ার অ্যাজ আ জকি ওয়াজ ফিনিসড। জেল থেকে বেরিয়ে দেখলাম সারভাইভাল ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট। এই সময় একজন আমাকে ব্লু ফিল্ম-এ নিয়ে আসে।'

যে ইনফর্মার সাইমনকে নিয়ে এসেছিল সে ঘরে ঢুকেছে। এতক্ষণ সে বাইরে বসেছিল।

'ওর কি অনেক সময় লাগবে? আমি তা হলে এগোচ্ছি। পরে আপনার সঙ্গে কথা বলে নেব।' ইনফর্মারটি সুভদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল।

আদিত্য আন্দাজ করল সাইমনকে ধরে আনার জন্য ইনফর্মারটির কিছু অর্থপ্রাপ্তি আশা করছে যেটা নিয়ে সে পরে সুভদ্রর সঙ্গে কথা বলতে চায় ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি এখন যাও। পরে যোগাযোগ কোরো। আর শোনো, দরজায় নক না করে এইভাবে কখনও আমার ঘরে ঢুকবে না। যাও, এখন যাও।' সুভদ্র বিরক্তিটা লুকোতে চাইছে না। 'আপনি বলুন।" শেষের কথাগুলো সাইমনের প্রতি।

'আই ওয়াজ মরালি ডেড আফটার আই স্টার্টেড মাই নিউ জব। আই ওয়ার্কড লাইক আ ডেড ম্যান। অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম আই হিট দ্য বটল। অদ্ভুত ব্যাপার হল, আই ওয়াজ ভেরি সাকসেসফুল ইন মাই নিউ কেরিয়ার। আই হ্যাড আ গুড ফিজিক অ্যান্ড মোর ইম্পরট্যান্ট, আই হ্যাড অ্যান অফুল লট অফ স্ট্যামিনা হুইচ ইজ এসেনশিয়াল ইন দ্যাট কাইন্ড অফ ট্রেড।'

‘সেই সময় কি আপনার সঙ্গে শবনম বলে মেয়েটির আলাপ হয়?' আদিত্য কাজের কথায় আসতে চাইছিল। এই লোকটির জীবনকাহিনী শুনতে তার আর ভাল লাগছে না।

‘হ্যাঁ। এই সময়।’

‘এটা কতদিন আগে হবে?' সুভদ্র আবার ইন্টারোগেশনের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। ‘ধরুন দশ বছর। বাট আই কান্ট বি এক্স্যাক্ট।'

‘এই মেয়েটির বিষয়ে আপনি কতটুকু জেনেছিলেন?'

‘ভেরি লিটল। শি নেভার ওপেনড আপ। নেভার টকড অ্যাবাউট হারসেলফ।

উই হ্যাড আ পিওরলি প্রফেশানাল রিলেশানশিপ।'

“ও কোথায় থাকে, ওর বাড়িতে কে আছে এসব কোনওদিন বলেনি?'

‘না। কিচ্ছু বলেনি। তবে আই হ্যাড আ ফিলিং দ্যাট শি হ্যাড আ স্টেডি বয়ফ্রেন্ড। মাঝে মাঝে ওর বয়ফ্রেন্ডের ফোন আসত।

‘আপনি কতদিন ওই কাজটা করেছিলেন ?”

‘চার বছর। দেন আই লস্ট মাই স্ট্যামিনা অ্যান্ড বিকেম ইউজলেস টু দ্য ইন্ডাসট্রি। ইট ওয়াজ বিকজ অফ এক্সেসিভ ড্রিকিং। আই হ্যাড টু কুইট।’

‘শবনম বলে মেয়েটি কি তখনও ইন্ডাস্ট্রিতে ছিল?'

‘না, না। আমি ছেড়ে দেবার কিছু দিন আগে ভেরি মিস্টিরিয়াসলি শি জাস্ট ডিস্যাপিয়ার্ড। নো ওয়ান কুড ট্রেস হার। শি জাস্ট ভ্যানিসড।’

‘এটা কত বছর আগে হবে?'

‘লেট মি সি। রাফলি সাত-আট বছর আগে শবনম ডিস্যাপিয়ার্ড। নো ওয়ান হ্যাজ সিন হার ইন আ স্ট্যাগ ফিল্ম এভার সিন্স।'

‘আচ্ছা আপনি কখনও রাজারহাটে কোনও বাড়িতে শুটিং করেছেন?' আদিত্য হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নটা শুনে সাইমন রবার্ট কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, “কোথায় কোথায় শুটিং করেছি সেটা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। এটা প্রোফেশানাল সিকরেট।'

একটু পরে সাইমন রবার্ট যখন বিদায় নিল তখন রোদ্দুর পড়ে এসেছে।

(৩)

কলকাতায় অনেক পুরোনো রাস্তার নতুন নামকরণ হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু কলকাতাবাসী নতুন নামগুলো মনে রাখেনি। কে আর মনে রেখেছে সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর নাম এখন মেঘনাদ সাহা সরণী, পাম অ্যাভিনিউ-এর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সরণী, পার্ক স্ট্রিটের নাম মাদার টেরেসা সরণী? আবার কিছু কিছু রাস্তা আছে যাদের নতুন নাম জনমানসে চালু হয়ে গেছে। যেমন আপার সারকুলার রোডের বদলে এপিসি রায় রোড এবং লোয়ার সারকুলার রোডের বদলে এজেসি বোস রোড নাম দুটো আজকাল ভালই চলছে। এজেসি বোস রোড থেকে বেরিয়েছে ক্যামাক স্ট্রিট। দু'টি রাস্তার সংযোগস্থলে একটি ফলক রয়েছে যেখানে ক্যামাক স্ট্রিটকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু এই নতুন নামটা আদৌ কি কেউ ব্যবহার করে? কেন একটা রাস্তার ক্ষেত্রে নতুন নামটা বেশ চালু হয়ে গেল কিন্তু তার সংলগ্ন আর একটা রাস্তার ক্ষেত্রে হল না, আদিত্য মনে মনে এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল। তাকে যেতে হবে ক্যামাক স্ট্রিটে শ্রীলেখা টাওয়ার বলে একটা বাড়ির পাঁচতলায়, গ্লোবাল ট্রেডিং কম্পানির অফিসে। সঙ্গে সুভদ্রও আছে।

দিন এখন বেশ বড়। ফলে নগরপালের নির্দেশে রাস্তার বাতিস্তম্ভগুলো জ্বলে উঠলেও সূর্যের আলো নিবে আসেনি। ক্যামাক স্ট্রিটের একমুখী ট্র্যাফিক পার্ক স্ট্রিটের দিক থেকে আসছে, ফলে এজেসি বোস রোড দিয়ে গাড়ি নিয়ে ঢোকা যাবে না। এটা যে সুভদ্রর ড্রাইভারের অজানা ছিল তা নয়। কিন্তু এজেসি বোস রোডে

আসতেই হতো কারণ সেখানে পুলিশের দপ্তরে সুভদ্রর একটা কাজ ছিল। আদিত্য আর সুভদ্র ঠিক করেছে পুলিশের দপ্তরে গাড়িটা রেখে শ্রীলেখা টাওয়ার অব্দি হেঁটে যাবে।

এজেন্সির মোড় থেকে শ্রীলেখা টাওয়ার মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। বাড়িটা আটতলা। একতলায় গাড়ি রাখার জায়গা, দোতলা থেকে আসল বাড়ি শুরু হয়েছে। লিফটের পাশে নেমপ্লেটগুলো দেখে মনে হল এই বাড়িটাতে পাঁচমেশালি আপিস ছাড়াও কয়েক ঘর গেরস্থ বাস করে।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। সুভদ্রর মন খচ খচ করছিল, এত দেরিতে গিয়ে গ্লোবাল ট্রেডিং-এর অফিসে কাউকে পাওয়া যাবে তো? আদিত্য তাকে বারবার আশ্বস্ত করেছে, সরকারি দপ্তর হলে কাউকে পাওয়া যেত না। কিন্তু প্রাইভেট কম্পানিরা অত তাড়াতাড়ি কর্মচারিদের ছুটি দেয় না। মালিকও অনেকক্ষণ অফিসে থাকে।

মালিক মুকেশ ঝুনঝুনওয়ালাকে অবশ্য পাওয়া গেল না। তিনি আউট অফ টাউন, কাজে জয়পুর গেছেন। চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার স্বরূপ মহাপাত্র অফিসের চার্জে। অতএব তার সঙ্গেই কথা বলতে হবে। ভদ্রলোক পুলিশ দেখে বেশ ঘাবড়েছেন। ‘কী ব্যাপার বলুন তো? কোনও গণ্ডগোল হয়েছে?' মহাপাত্র সাহেব চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। মনে হয় ওড়িয়া নন, মেদিনীপুরের বাঙালি। তবে পুলিশ দেখে গলা কাঁপছে।

‘না, না কোনও গণ্ডগোল হয়নি। আপনার টেনশানের কোনও কারণ নেই। আমরা কিছু ইনফরমেশানের জন্যে এসেছি। কী ইনফরমেশান পরে বলছি। তার আগে বলুন আপনি কত বছর কাজ করছেন এখানে?' সুভদ্র ঠাণ্ডা গলায় বলল।

‘সামনের জুন মাসে কুড়ি বছর পুরো হবে।'

‘তার আগে কোথাও কাজ করতেন?'

‘একটা অডিট ফার্ম-এ আর্টিকল ক্লার্ক ছিলাম। যেটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবার জন্য ম্যান্ডেটারি।'

‘এখানে জয়েন করার পর চার্টার্ড পাশ করলেন?'

'হ্যাঁ। তাও অনেকদিন হয়ে গেল।'

‘অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবেননি?'

‘আসলে এটা তো ছোট একটা কম্পানি। আমি এর সবটাই প্রায় জানি। একটা মায়া পড়ে গেছে। ভয় হয়, বড় কম্পানিতে গেলে হয়ত হারিয়ে যাব। কম্পানির মালিক মুকেশ ঝুনঝুনওয়ালাও খুব ভাল মানুষ। এখানে শান্তিতে আছি। সব থেকে বড় কথা, আমার অ্যামবিশানটাই কম।'

‘আমাদের এখানে আসার কারণটা এবার বলি। কয়েক বছর আগে মৃত্তিকা মিত্র এবং তার স্বামী পার্থ মিত্র তাদের ফ্ল্যাটে খুন হন। মৃত্তিকা আপনাদের কম্পানিতে চাকরি করতেন। আমরা মৃত্তিকার সম্বন্ধে একটু খোঁজ-খবর নিতে এসেছি।'

‘কিন্তু মৃত্তিকার ব্যাপারটা তো নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। খুনি ধরাও পড়েছিল। এতদিন পরে আবার কী হল?'

‘যাকে খুনি বলে ধরা হয়েছিল সে হাইকোর্টে বেকসুর খালাস হয়ে গেছে। পুলিশ এবার ডিভিশন বেঞ্চে যাবে। অর্থাৎ কেসটা রিওপেনড হয়েছে। আমরা তাই আবার নতুন করে এভিডেন্স সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি।'

স্বরূপ মহাপাত্র চুপ করে আছে। বোধহয় কী বলবে বুঝতে পারছে না। সুভদ্র বলল, ‘আমরা আপনাকে মৃত্তিকা মিত্রকে নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করব। প্রথম প্রশ্ন, মৃত্তিকা এখানে কী ধরনের কাজ করতেন? '

‘অ্যাকাউন্টস-এর কাজ। আমাদের ছোট কম্পানি বলে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হতো। ভাউচার এনট্রি থেকে ব্যালেন্স শিট বানানো, ব্যাঙ্ক রিকনসিলিয়েশান, সবই অল্পবিস্তর করতে হতো। মৃত্তিকা স্টেটমেন্টগুলো তৈরি করত, আমি পরে সেগুলো চেক করে ভেরিফাই করতাম। তবে একটা ব্যাপার বলতেই

হবে। মৃত্তিকার কমপিউটার স্কিলস ছিল অসাধারণ। মূলত ওর কমপিউটার নলেজের ওপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টসটা প্রায় পুরোপুরি কমপিউটারাইজ করে ফেলেছিলাম।'

'মৃত্তিকা মিত্র কতদিন আপনাদের কম্পানিতে কাজ করেছিল?'

'খুব বেশি দিন নয়। বছর তিনেক বছর হবে। তার মধ্যেই ও কিন্তু কাজে বেশ সুনাম অর্জন করেছিল।'

'ওকে কি কখনও ব্যাঙ্কে যেতে হতো?'

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে যেতে হতো। আমাদের কয়েকটা ব্যাঙ্ক লোন নেওয়া ছিল। সেগুলোর ব্যাপারে কথা বলতে যেতে হতো।

'আপনাদের মেন ব্যাঙ্কার কে?' আদিত্যর প্রশ্ন।

'আমাদের দুটো বড় লোন আছে। দুটোই স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে। আর পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে একটা ওভারড্রাফট ফেসিলিটি আছে। এই দুটোই মেন ব্যাঙ্ক। এছাড়া আরও কয়েকটা ছোটখাট অ্যাকাউন্ট আছে।'

'আপনাদের কি সাউথ এশিয়ান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে কোনও অ্যাকাউন্ট আছে? কেন জিজ্ঞেস করছি, বলি। অশনি রায়, যাকে মৃত্তিকার মার্ডার চার্জে ধরা হয়েছিল, এই ব্যাঙ্কটিতে কাজ করতেন। আমরা বোঝার চেষ্টা করছি, ব্যাঙ্কের কাজের সূত্রে অশনি রায়ের সঙ্গে মৃত্তিকা মিত্রর কখনও আলাপ হয়েছিল কিনা।' আদিত্য প্রশ্নটা করে স্বরূপ মহাপাত্রর মুখের অভিব্যক্তিটা লক্ষ করছিল। স্বরূপ মহাপাত্র কিছু একটা ভাবছে।

'আমার যতদূর মনে পড়ছে সাউথ এশিয়ান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সল্ট লেক ব্রাঞ্চে আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট ছিল। কিন্তু সেটা অনেক দিন আগে ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে।'

'কতদিন আগে অ্যাকাউন্টটা ক্লোজ করা হয়েছে, বলতে পারবেন?'

'অফ হ্যান্ড পারব না। পুরোনো রেকর্ড দেখে বলতে হবে।'

"ঠিক আছে। আপনাকে দু'দিন পরে ফোন করে জেনে নেব। আচ্ছা, আপনাদের মেন ব্যবসাটা কীসের?"

'আমরা গারমেন্টস এক্সপোর্ট করি। মেনলি শাড়ি। ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে এথনিক শাড়ি প্রোকিওর করে আমরা ইউ এস এ-তে এক্সপোর্ট করি।'

'আপনাদের গত পাঁচ-দশ বছরের ব্যালেন্স শিট পাওয়া যাবে?'

'আমাদের ব্যালেন্স শিট? সেটা কেন আপনাদের দরকার হচ্ছে? আমাদের কম্পানি এর মধ্যে আসছে কোথায়? ইন এনি কেস, পুলিশ অথরিটির কাছ থেকে কোনও লিখিত অর্ডার ছাড়া আমি ব্যালেন্স শিট দিতে পারব না। আমাকে মাফ করবেন।' 'ঠিক আছে অর্ডার বার করে পাঠিয়ে দেব।' সুভদ্র চোয়াল শক্ত করে বলল। 'আচ্ছা, গারমেন্টস এক্সপোর্ট ছাড়া আপনাদের কি আর কোনও ব্যবসা আছে?' 'এই কম্পানির নেই। তবে মালিকের অন্য ব্যবসা আছে।'

'কীসের ব্যবসা?'

'আমি যতদূর জানি এনটারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে মুকেশজির বেশ কিছু ইনভেস্টমেন্ট আছে। বিশেষ করে বাংলা, ভোজপুরি এবং ওড়িয়া সিনেমায় ওঁর ইনভেস্টমেন্ট সিগনিফিকেন্ট। কিন্তু এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

'ঠিক আছে। এতেই হবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার আর একটা প্রশ্ন ছিল। ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আমার এক বোনের বন্ধু এখানে কাজ করে, নাম মিতা অধিকারী বোধহয় কলকাতার বাইরে কোথাও পোস্টেড। ওর ফোন নম্বরটা আমার বোনের কাছে ছিল, কিন্তু কোনও কারণে হারিয়ে গেছে। আপনি কি ফোন নম্বরটা দিতে পারবেন? বোন চাইছিল।'

'মিতা অধিকারী? সে তো জয়পুরে পোস্টেড। অনেকদিন আসেনি। আমার কাছে তো নম্বরটা নেই, তবে আমাদের পারসোনেল ডিপার্টমেন্টে পেয়ে যাবেন?'

'মিতা অধিকারী শেষ কবে কলকাতায় এসেছিল?'

'তা বছর দুয়েক তো হয়ে গেছে।

'বছর দুয়েক? ঠিক আছে বোনকে বলব।'

পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের গজানন সাঁতরার কাছ থেকে মিতা অধিকারীর ফোন নম্বর পাওয়া গেল। আদিত্যর কাছে মিতা অধিকারীর যে নম্বরটা আছে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা নম্বর।

সাউথ এশিয়ান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক একটি বেসরকারি বহুজাতিক সংস্থা। এদের হেড অফিস ম্যানিলায়। এক সময় এরা ভারতের বাজারটা ধরার জন্য বেশ মরিয়া হয়ে দেশের বিভিন্ন শহরে একটার পর একটা শাখা খুলে যাচ্ছিল। কয়েক বছর হল এদের ব্যবসা-নীতি বদলেছে। ভারতে এরা এদের রিটেল ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে। অনেকগুলো শাখা বন্ধ হয়ে গেছে। যেগুলি আছে তাতে মূলত ব্যাক-অফিসের কাজ হয়। যেমন, অন্য কোনও দেশে যে ধারের দরখাস্তগুলি এসেছে সেগুলিকে মূল্যায়ন করা হয়। আন্তর্জাতিক কেনাবেচার ওপরে যে ব্যাঙ্ক গ্যারেন্টি লাগে সেটা তৈরি করা হয় । ম্যানিলা বা সিঙ্গাপুরের তুলনায় ভারতে এখনও শ্রমের দাম অনেক কম। ফলে এইসব কাজ এখানে করিয়ে নেওয়াটা লাভজনক। সল্ট লেকের শাখাটাতেও এখন এইসব কাজ হচ্ছে।

পুলিশ থেকে আসছি বলাতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার দৃশ্যত অখুশি। মনে হল, পুলিশ আসতে পারে ম্যানেজার জানত। ম্যানেজারের নাম নিমগ্ন দাশগুপ্ত।

'দেখুন, সম্প্রতি আমাদের ব্রাঞ্চ থেকে অনেকে ছাঁটাই হয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার নিজের থেকেই ছেড়ে দিয়েছে। তাই আমরা গ্রসলি আন্ডারস্টাফড। আপনাদের বেশিক্ষণ সময় দিতে পারব না।' নিমগ্ন দাশগুপ্ত বিরক্ত মুখে বলল।

'আমরা শুধু একটা অ্যাকাউন্ট সম্বন্ধে জানতে চাই। অ্যাকাউন্টটা কবে খোলা হয়েছিল, কবে বন্ধ হয়ে গেল, কীরকম ট্রানজ্যাকশান হতো অ্যাকাউন্টটাতে এইটুকু।'

'হ্যাঁ, জানি। গ্লোবাল ট্রেডিং-এর অ্যাকাউন্টটা তো?'

'হ্যাঁ, ওটাই। আপনি কী করে জানলেন?' সুভদ্র অবাক।

'আজ সকালে গ্লোবাল ট্রেডিং থেকে ফোন করে জানতে চাইছিল ওরা কবে অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করেছিল। ওরা পুরোনো কাগজপত্র কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। বলল, পুলিশ নাকি ওই অ্যাকাউন্টটা সম্বন্ধে জানতে চায়। তখনই মনে হচ্ছিল ওই অ্যাকাউন্টটা সম্বন্ধে জানার জন্য আমাদের ব্রাঞ্চেও পুলিশ আসতে পারে।'

'বেশ। বুঝতে পারলাম। তা আপনারা কি ওই অ্যাকাউন্টটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?'

'দেখুন, এটা তো কারেন্টলি চালু অ্যাকাউন্ট নয়। তাই এখনকার কমপিউটারে ট্রানজাকশানগুলো থাকবে না। যে সব অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেছে আমরা সেই সব অ্যাকাউন্টের ট্রানজাকশানগুলো হার্ড ডিস্কে তুলে স্টোররুমে রেখে দিই। সেখানে গিয়ে খুঁজে দেখতে হবে ওটা কোন হার্ড ডিস্কে আছে। কাজটা বেশ লেবোরিয়াস। আর আমাদের স্টাফ শর্টেজ। খুব তাড়াতাড়ি আমরা ওই অ্যাকাউন্টটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না। একটু সময় দিতে হবে। 'কতটা সময়?'

'এই ধরুন এক সপ্তাহ। রেকর্ডটা খুঁজে পেয়ে গেলে আপনাকে ফোন করে জানিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে তাই দেবেন।' সুভদ্র খানিকটা হতাশ গলায় বলল।

'আচ্ছা, আমি একটা অন্য প্রশ্নে আসছি।' আদিত্য মৃদু গলায় বলল। 'অশনি রায়কে কি আপনি চিনতেন? এই ব্রাঞ্চেই কাজ করতেন উনি।'

'অশনি রায়? মানে যে মার্ডার চার্জে অ্যাকিউসড হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই অশনি রায়।'

'তার কথা এতদিন পরে কেন জানতে চাইছেন?'

'আপনি হয়ত জানেন হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে অশনি ছাড়া পেয়ে গেছে। পুলিশ সম্ভবত ডিভিশন বেঞ্চে যাবে। তাই কেসটা রিওপেনড হচ্ছে।'

'আই সি। তা, গ্লোবাল ট্রেডিং-এর অ্যাকাউন্টটা সম্বন্ধেও কি সেই কানেকশানে জানতে চাইছেন? যদিও ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আমি কানেকশানটা ঠিক ধরতে পারছি না ।'

'আছে একটা কানেকশন। সেটা যথা সময়ে রিভিলড হবে। আপনি এখন অশনি সম্বন্ধে যদি কিছু জানেন সেটা বলুন।' আদিত্য সাবধানে বলল।

'দেখুন অশনি আর আমি একই বছর জুনিয়ার ম্যানেজার হিসেবে এই ব্যাঙ্ক জয়েন করি। দু'জনের একই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড। আমরা দু'জনেই তখন সদ্য বিজনেস স্কুল থেকে বেরিয়েছি। তার আগে দু'জনেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছি। যদিও আলাদা আলাদা জায়গা থেকে। আমাদের প্রথম ট্রেনিং ম্যানিলায় হয়েছিল। ওখানেই অশনির সঙ্গে প্রথম আলাপ এবং কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বেশ বন্ধু হয়ে গেলাম। ট্রেনিং-এর পরে অশনি সল্ট লেকের এই ব্রাঞ্চে পোস্টিং পেল, আর আমি পোস্টিং পেলাম বালিগঞ্জে। অনেক সময় মিটিং থাকলে দু'জনকেই বিবাদী বাগে হেড অফিসে যেতে হতো। তখন দেখা হতো ওর সঙ্গে। তাছাড়া অফিস আওয়ারের পরেও দেখা হতো। রাত্তির অব্দি আড্ডা দিতাম। আমরা কেউই তখনও বিয়ে করিনি। অশনি ওর বাবা-মার সঙ্গে থাকত। ওর একজন স্টেডি গার্ল ফ্রেন্ড ছিল। তার কথা ও খুব বলত। আমি একেবারেই সিঙ্গল। বাবা-মাও মারা গেছে। দাদারা নর্থ বেঙ্গলে থাকে। ইন শর্ট, অশনির কম্পানিটা আমার খুব ভাল লাগত। কয়েকবার আমরা এক সঙ্গে বেড়াতেও গেছি। একবার গোয়া, একবার কেরালা, দু'বার দার্জিলিং।' নিমগ্ন দাশগুপ্ত পুরোনো দিনের স্মৃতিতে নিমগ্ন হয়ে গেছে।

'মানুষ হিসেবে অশনিকে আপনার কেমন মনে হয়েছিল? মানে অশনি সম্বন্ধে আপনার বেসিক ইম্প্রেশানটা জানতে চাইছি।'

'খুব ইমোশানাল। কিন্তু একই সঙ্গে প্রবল বুদ্ধিমান। ভেরি কুইক থিংকার। তাই ব্যাঙ্কেও খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করছিল। ওর মেন প্রবলেম ছিল ওর গার্লফ্রেন্ড অন্বেষা । আমি তাকে কখনও মিট করিনি, কিন্তু অশনির কাছে যা গল্প শুনতাম তাতে মনে হত মেয়েটি অসম্ভব অ্যামবিশাস এবং ডিমান্ডিং। মেয়েটির জন্য অশনি যা এক্সপেন্সিভ গিফট কিনত, আমি অবাক হয়ে ভাবতাম এত টাকা ও পায় কোথা থেকে? তারপর ভাবতাম, হয়ত বাবার কাছ থেকে পায়। ওর বাবা তো বিখ্যাত ডাক্তার। আমার মনে হতো, এই মেয়েকে বিয়ে করলে অশনি বিপদে পড়বে। মুখে কিছু বলিনি। যাই হোক, খুব কুইক সাকসেশনে অশনির দুটো মিসহ্যাপ হয়ে গেল। ওর মা মারা গেলেন এবং তার কয়েক বছর পরেই অন্বেষা আর একজনকে বিয়ে করে অ্যামেরিকা চলে গেল। মাস তিনেক হি ওয়াজ ইন এ মেস। তারপর ও ধীরে ধীরে রিকভার করছিল। কিন্তু ওই দু'টি দুর্ঘটনার পরে হি ওয়াজ এ চেঞ্জড ম্যান। মানে, ও অনেক বেশি সিনিকাল হয়ে গিয়েছিল।'

'আচ্ছা অশনি রায়ের যে আরেকটা অ্যাফেয়ার হয়েছিল এটা কি ও আপনাকে গল্প করেছিল?'

'বলেছিল ওর আরেকটা সম্পর্ক হয়েছে। কিন্তু ডিটেলটা, মানে কার সঙ্গে সম্পর্ক, কীভাবে হলো সেসব কিছু খুলে বলেনি। আমিও কখনও জোর করিনি। ভেবেছিলাম, সময় হলে ও নিজের থেকেই সব বলবে। কিন্তু তার আগেই এই ভয়ানক ঘটনাটা ঘটে গেল।'

'জেল থেকে বেরোনোর পরে কি অশনি আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল?' 'না, করেনি। আমি দু'একবার ফোন করে দেখা করতে চেয়েছিলাম। ও ডিসকারেজ করেছিল। বলেছিল, ও এখনও একটা ট্রমার মধ্যে আছে। একটু স্বাভাবিক হলে দেখা করবে।'

'আচ্ছা, মৃত্তিকা মিত্র, মানে যিনি খুন হয়েছিলেন, তাকে কি আপনি কখনও আপনাদের ব্যাঙ্কে আসতে দেখেছেন? আসলে, মৃত্তিকা গ্লোবাল ট্রেডিং-এ কাজ করত।'

'আই সি! এখন আমি কানেকশানটা বুঝতে পারছি। আমি মৃত্তিকা মিৎৰকে কখনও দেখিনি। দেখার কথাও নয়, কারণ আমি তখন এই ব্রাঞ্চে ছিলাম না।'

'যারা তখন ছিল তারা কি কেউ বলতে পারবে?'

'যারা তখন এই ব্রাঞ্চে ছিল তারা কেউই আর নেই। আমাদের হিউজ লে অফ হয়েছে। এখানকার চাকরি ছেড়ে কে কোথায় গেছে বলা শক্ত। হয়ত, দু'একজনকে পাওয়া যেতেও পারে যারা এখনও এই ব্যাঙ্কে কাজ করছে তবে অন্য ব্রাঞ্চে আছে। তেমন কেউ সত্যি আছে কিনা একটু চেষ্টা করলে জানা যাবে। আমাকে একটু সময় দিন।'

সাউথ এশিয়ান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আদিত্য সুভদ্রকে বলল, 'রবিবার উলুবেড়িয়া যাচ্ছি তো? তার আগে আমি দু'দিন বাড়িতে রেস্ট নেব।'

(৪)

গুগল ম্যাপ বলছে কলকাতা থেকে উলুবেড়িয়ার দূরত্ব ৪২.৬ কিমি, গাড়ি করে গেলে পৌঁছতে লাগবে এক ঘন্টা আঠেরো মিনিট। রবিবার বলে আদিত্য ভাবছিল আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে। বস্তুত তাড়াতাড়ি পৌঁছনো দূরের কথা, উলুবেড়িয়া পৌঁছতে আড়াই ঘন্টারও বেশি সময় লেগে গেল। উলুবেড়িয়া থেকে আর একটু পশ্চিমে গেলে গঙ্গা, উলুবেড়িয়া কালীবাড়ির ঘাট। তার কিছু দক্ষিণে, গঙ্গার ধারে, মাতাজির আশ্রম, আদিত্যদের গন্তব্যস্থল।

আদিত্যর ঘনঘন বাইরে যাওয়া নিয়ে কেয়া খুব চটে ছিল। তাকে এই শর্তে ঠাণ্ডা করা গেছে যে সেও আদিত্যদের সঙ্গে আসবে। সঙ্গে এলে সে আদিত্যর খাওয়া দাওয়া নিয়ে নজরদারি করতে পারবে। তাছাড়া গঙ্গা দেখবে। চাইলে এমনকি আশ্রমের রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পুজোও দিতে পারে।

সকাল সাড়ে ছটায় বেরিয়েও তাড়াতাড়ি যে পৌঁছন গেল না তার কারণ একাধিক। প্রথমত, জায়গায় জায়গায় বাজার বসেছিল। এক-একটা বাজার পেরোতে দশ-পনের মিনিট লেগে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় কারণ, মাঝরাস্তায় টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছিল। সেটাকে বদলে স্টেপনি বসাতে আরও মিনিট পনের গেল।

কেয়ার খিদে পেয়েছে। সে ঘোষণা করেছে কিছু না খেয়ে সে এক পাও এগোতে পারবে না। ফলে সুভদ্রর ড্রাইভার আদিত্যদের তিনজনকে একটা কচুরি-সিঙাড়ার দোকানে নামিয়ে দিয়ে জখম টায়ারটা সারাতে গেছে। কোনও সুখাদ্য অবশ্য আদিত্যর কপালে নেই। কেয়া তার জন্যে টিপিন-কেরিয়ারে ওট সেদ্ধ, ডিমসেদ্ধর সাদা অংশ এবং পাকা পেঁপে নিয়ে এসেছে। এইসব স্বাস্থ্যকর খাদ্য খেতে খেতে আদিত্য আড়চোখে দেখছিল কেয়াদের জন্যে আলুর দম সহ দু'টি করে সদ্য ভর্জিত ভীমাকার রাধাবল্লভী টেবিলে হাজির।

আদিত্যকে না দিয়ে রাধাবল্লভী খেতে কেয়ার খারাপ লাগছিল। সে আদিত্যকে বলল, 'রাগ কোরো না গো। তোমার শরীরটা নিয়ে চিন্তা করি বলেই তো এইসব খেতে দিই না। ডাক্তার আগে বলুক, তখন সব খাবে।'

আদিত্য ভাবল, এমন কোনও ডাক্তার কি আছে যে বলবে রাধাবল্লভী খাও, কিছু হবে না। মুখে বলল, "চিন্তা তো আমার শরীর নিয়ে নয়, তোমাদের শরীর নিয়ে। এই অখাদ্যগুলো কি না খেলেই নয়? তোমরাও তো বাড়ি থেকে ডিমসেদ্ধ আনতে পারতে।'

'আমি তো আনতে চেয়েছিলাম। সুভদ্র বলল উলুবেড়িয়ার এই দোকানটার রাধাবল্লভী নাকি জগদ্বিখ্যাত। কী সুভদ্র, বলনি?'

'বলেছিলাম বৌদি। এটাও বলেছিলাম, আমি একা একা খেতে পারব না। দাদা না খেলেও আপনাকে খেতে হবে। তবে আমি বলি কি বৌদি একটা রাধাবল্লভী দাদাকে অ্যালাও করুন। একটা খেলে কী আর এমন ক্ষতি হবে? বরং দাদার মেজাজটা খুশ থাকবে। কথায় কথায় আমাদের বকাবকি করবে না।'

সুভদ্র অনেক পেড়াপেড়ি করার পর কেয়া নিমরাজি হয়েছে। রাধাবল্লভী-আলুর দমে একটা কামড় দিয়েই আদিত্য বুঝল কেন একে জগদ্বিখ্যাত বলা হচ্ছে। সুভদ্রকে আদিত্যর যে ভাল লাগে তার কারণ আছে।

উলুবেড়িয়ার কালীবাড়িটা বেশ ঝকঝকে। দেখে মনে হয় নতুন। পাশে গঙ্গা। ঢেউ তুলে মাঝনদী দিয়ে স্টিমার যাচ্ছে। তার যাওয়ার ধাক্কায় নদীর পাড়ে নোঙর করা নৌকোগুলো লাফিয়ে উঠছে। হাতে কাজ না থাকলে এখানে আর একটু সময় কাটানো যেত। আদিত্যদের আরও দক্ষিণে যেতে হবে।

গঙ্গার ধারে কয়েকটা বেসরকারি পিকনিক স্পট। আজ রবিবার বলে প্রত্যেকটা ভর্তি। পিকনিক স্পটগুলোর বাইরে ঠাণ্ডা মফস্বল রবিবারের সকালে ঝিমোচ্ছে। আরও কিছুটা গিয়ে বড় রাস্তা থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ছোট একটা রাস্তায় ঢুকতে হল। ছোট রাস্তা ধরে মিনিট তিনেক গিয়েই মাতাজির আশ্রম, একেবারে গঙ্গার ধারে।

সাদা বাড়ি, সামনে বাঁধানো উঠোন, এক ধারে পাতকুয়ো, পেয়ারা গাছ, নিমগাছ, বট-অশত্থ, তুলসীমঞ্চ। ঠাহর করে দেখলে সাদা বাড়িটার পেছনে তিনটে মন্দির চোখে পড়বে। এক ধারে শিব-দুর্গা, অন্য ধারে দক্ষিণা কালিকা, মধ্যিখানে রাধাগোবিন্দের মন্দির। যদিও রাধাগোবিন্দের মন্দিরটাই আশ্রমের মূল মন্দির তবু, অনায়াসে বলা যায়, এখানে বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে শাক্ত ধর্মের একটা উদার মিশ্রণ ঘটেছে।

এখানে সন্ন্যাসিনীদের বলা হয় তপস্বিনী। আশ্রমে দশ-বারোজন তপস্বিনী বাস করেন। সবার মাথার ওপর আছেন মাতাজি। তিনি এদের সকলের গুরু মা। এঁরা সকলে মিলে আশ্রমের ভেতরে অল্পবয়সী গরিব মেয়েদের জন্যে একটা ইস্কুল চালান।

একই সঙ্গে ইস্কুল সংলগ্ন একটা ঘরে একটু বেশি বয়সের মেয়েদের শেখান হয় হাতের কাজ। তাছাড়া আশ্রমের ভেতরে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। সেখানে বারোমাস একজন নার্স এবং একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে পাওয়া যায়। এর ওপরে সপ্তাহে দু'দিন বাইরে থেকে অ্যালোপাথিক ডাক্তাররা এসে রুগি দেখে যান। আশ্রমের পেছনে একটা বাগান আছে। সেখানে শাক-সব্জি, ফল-পাঁকুড় ফলান হয়। ফলন এতটাই ভাল যে আশ্রমিকদের প্রয়োজন মিটে গিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। স্থানীয় বাজারে এই উদ্বৃত্ত শাক-সব্জি-ফলের খুব কদর।

এখানে তপস্বিনীদের সংসার-জীবন ভুলে গিয়ে সন্ন্যাস নিতে হয়। তাঁদের তখন নতুন নামকরণ হয় · ভক্তি, মুক্তি, দয়া, মমতা, ক্ষমা ইত্যাদি। নামকরণ করেন স্বয়ং মাতাজী। একবার নামকরণ হয়ে গেলে তপস্বিনী আর তার সংসার জীবনের নাম উচ্চারণ করতে পারেন না। আগের জীবনের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে পারেন না। এই একটা ব্যাপারে মাতাজি ভীষণ কড়া। তিনি বলেন, সংসারের সমস্ত বাধা-বন্ধন কাটিয়ে আসতে না পারলে তপস্বিনী হওয়া যায় না। তাই চট করে কাউকে তিনি আশ্রমে তপস্বিনী হিসেবে নিতে চান না। তপস্বিনী হতে গেলে অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়।

মাতাজির দর্শন পাবার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এই আশ্রমে আসে। মাতাজি বলেন, কাউকে জাগতিক কিছু পাইয়ে দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি মানুষকে শুধু শান্তির সন্ধান দিতে পারেন। তিনি বলেন, মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট তো কম নেই। একমাত্র ধ্যানের মধ্যে দিয়েই সেই দুঃখ-কষ্টের উপসম হতে পারে। তাই তিনি মানুষকে ধ্যান করতে শেখান।

আশ্রম সম্বন্ধে এইসব খবর যিনি দিচ্ছিলেন তিনি একজন অল্পবয়সী তপস্বিনী, নাম স্নেহ। তার কাছে জানা গেল আশ্রমের জন্য কিছু দরকারি জিনিসপত্র কিনতে করুণাদিদি উলুবেড়িয়া বাজারে গেছে। একটু পরেই চলে আসবে। সুভদ্রর ইনফর্মার আগেই জানিয়েছিল বনানী দাসের আশ্রমিক নাম করুণা।

এখানে এসে প্রথমেই নিজের পরিচয় দিয়ে মাতাজির সঙ্গে দেখা করেছিল সুভদ্র। আদিত্য আর কেয়া তখন রাধাগোবিন্দের মন্দিরে ঢুকেছিল। সুভদ্র মাতাজিকে বলেছিল, একটা পুরোনো খুনের মামলার ব্যাপারে পুলিশ বনানী দাস ওরফে করুণার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ব্যাপারটা কী সেটাও সংক্ষেপে বলেছিল। মাতাজি

বললেন তিনি ব্যাপারটা জানেন। করুণা তার কাছে কিছুই লুকোয়নি। এবং পুলিশের কাজে বাধা দিতেও তিনি চান না। পুলিশ নিশ্চয় করুণার সঙ্গে কথা বলতে পারে। তবে আশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী তার গার্হস্থ্য জীবনের কথা করুণা বলতে পারে না। যদি সে সেসব কথা বলতে না চায় তা হলে পুলিশ যেন তাকে জোর না করে। মেয়েটা এক সময় খুব কষ্ট পেয়েছে। সেই কষ্টের দিনগুলো ভুলে গিয়ে এখন সে শান্তিতে আছে। সেই শান্তি যেন তার থেকে কেড়ে নেওয়া না হয়। তারপর স্নেহ বলে মেয়েটিকে তিনি সুভদ্রর সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন যাতে তার কোনও অসুবিধে না হয়। সুভদ্র বলছিল, মাতাজির সঙ্গে কথা বললে সত্যিই শান্তি পাওয়া যায়।

'মাতাজি কি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন?' কেয়া ব্যগ্র হয়ে স্নেহ নামক তরুণী সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞেস করল।

'কেন করবেন না? মাতাজি সকলের সঙ্গে দেখা করেন। আপনাদের সঙ্গেও করবেন।'

আদিত্যরা তিনজন স্নেহর সঙ্গে বাগানে বসে কথা বলছিল। একটা নিমগাছের ছায়ায় বাঁধানো বসার জায়গা। সেখানে। সবুজ ঘাসের ওপর কাকেদের মিটিং চলছে। কয়েকটা কাঠবেরালি ব্যস্ত হয়ে একটা বটগাছে ওঠানামা করছে। এখান থেকে গঙ্গার খানিকটা দেখা যায়। বেশ চওড়া নদী। ওপারের বাড়িঘরগুলো খেলনা বাড়ির মতো দেখাচ্ছে। আদিত্য জানে, ওপারে বজবজ ।

'এখানে এলে মনে হয় সংসারের বাইরে চলে এসেছি। আচ্ছা, আপনাদের এখানে খবর কাগজ আসে?' কেয়া সরলভাবে বলল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। চারটে খবর কাগজ আসে। দুটো বাংলা, দুটো ইংরেজি। আমাদের তপস্বিনীদের মধ্যে কয়েকজন অবাঙালি।'

'তাহলে তো আপনারা সংসারের বাইরে নন। তাই না?'

'বাইরে কেন হব? আমরা মোটেই সংসারের বাইরে নই। তবে গার্হস্থ্য জীবনের বাইরে। আরে ওই তো করুণাদিদি এসে গেছে। আপনারা বসুন, আমি গিয়ে আপনাদের কথা বলছি।' আদিত্যদের বসিয়ে রেখে স্নেহ উঠে গেল।

স্নেহ আর করুণা দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আদিত্যরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে তাদের কথোপকথন শোনা যায় না। করুণার হাতে বাজারের থলি, প্লাস্টিকের ব্যাগ। স্নেহর কথা শুনে সে আদিত্যদের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখছে। কিছুক্ষণ কথা বলার পর করুণা সাদা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। স্নেহ আদিত্যদের দিকে এগিয়ে আসছে।

'চলুন, আপনাদের ভেতরে বসতে বলেছে। করুণাদিদি জিনিসপত্রগুলো রেখে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে।'

'আমি এইসব কথাবার্তার মধ্যে থাকব না। আমি একটু মন্দিরগুলো ঘুরে দেখতে পারি?' কেয়া বলল ।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমার সঙ্গে চলুন। আমি সব দেখিয়ে দিচ্ছি।' কেয়াকে নিয়ে তপস্বিনী স্নেহ অন্য দিকে চলে গেল।

একটা নিরাভরণ ঘরে আদিত্যদের বসানো হয়েছে। চেয়ার-টেবিল-খাট-পালঙ্ক কিছু নেই। মাটিতে মাদুর পেতে বসার ব্যবস্থা। একদিকের দেয়ালে রাধাগোবিন্দের ছবি, যে বিগ্রহ আদিত্য আর কেয়া একটু আগে দেখে এসেছে। উল্টোদিকের দেয়ালে চিত্রহীন একপাতাওলা একটা ক্যালেন্ডার। অন্য দুটো দেয়াল একেবারে ফাঁকা।

'বলুন, আপনারা কী বলবেন।' বনানী দাস ওরফে করুণা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে। 'আপনি আগে বসুন।' আদিত্য নম্রভাবে বলল।

করুণা একটা চাটাইএর আসনে বসেছে। আদিত্যদের থেকে একটু দূরে। রোগা, তপোক্লিষ্ট শরীর। ভাঙা গাল, উঁচু হনু, উন্নত নাক। গায়ের রঙ ধবধবে ফরসা। চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হয় ভেতরের মানুষটা যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে দূরে কোথাও রয়েছে।

'আপনারা কেন এসেছেন আমি জানি। মাতাজি আমাকে সব বলেছেন। কিন্তু আমি তো আমার অতীত জীবন নিয়ে কিছু বলতে পারব না। এটা আশ্রমের নিয়ম। মাতাজিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমি আমার অতীত নিয়ে কথা বলব না, ভাবব না, অতীত জীবনের আত্মীয়-বন্ধু-শত্রু কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না। সেই প্রতিশ্রুতি আমি ভাঙতে পারি না। এর জন্য আপনারা যা শাস্তি আমাকে দিতে চান আমি মাথা পেতে নেব। যদি বলেন, পুলিশের সঙ্গে অসহযোগিতা করার জন্য আমার জেল হবে। আমি তাতেও রাজি। কিন্তু দয়া করে আমাকে প্রতিশ্রুতি ভাঙতে বলবেন না ।'

আদিত্য কী বলবে বুঝতে পারছে না। সুভদ্রও চুপ করে বসে আছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আদিত্য বলল, 'আচ্ছা দিদি, ধরুন আমরা প্রশ্ন করে গেলাম আর আপনি হ্যাঁ কিংবা না বলে তার উত্তর দিলেন। এটা কী হতে পারে?'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে করুণা বলল, "না সেটাও চলবে না। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাকে অতীতের ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। সেটা আমি করতে চাই না।'

অনেক চেষ্টা করেও করুণাকে তার অতীত নিয়ে কথা বলাতে রাজি করা গেল না। হাল ছেড়ে দিয়ে আদিত্য সুভদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল, উঠে পড়া যাক। এখানে থাকলে শুধু সময় নষ্ট।' তারপর করুণার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আপনি কিন্তু দিদি নিজের সঙ্গে তঞ্চকতা করছেন। আমি হলফ করে বলতে পারি, আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় অতীতের বহু ঘটনা আপনার মনে উঁকি দিচ্ছিল। অতীতের ঘটনা মনে আনা যদি পাপ হয় তা হলে সেই পাপ আপনি করে ফেলেছেন।' করুণা ওরফে বনানী দাস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এইসব অবস্থায় কী করতে হবে আদিত্য বুঝতে পারে না। সুভদ্রও হতভম্ভ হয়ে বসে আছে।

অনেকক্ষণ পরে করুণা বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি পাপী, ঘোর পাপী। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে এখানে এসেছি। আমার সমস্ত পাপের কথা মাতাজিকে বলেছি। আর কাউকে বলার প্রয়োজন দেখি না। মাতাজি আমাকে স্বান্ত্বনা দিয়েছেন, অভয় দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। আমি এখানে এসে শান্তি পেয়েছি। আপনারা কি চান সেই শান্তি নষ্ট হয়ে যাক?'

'মেয়েটাকে অনেকক্ষণ ধরে আপনারা কষ্ট দিচ্ছেন। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আমার আশ্রম ছেড়ে আপনারা চলে যান। দয়া করে এক্ষুনি চলে যান।'

আদিত্য খেয়াল করেনি কখন মাতাজি নিজে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তার পেছনে কাঁচুমাচু মুখে কেয়া।

ফেরার পথে অনেকক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। গাড়ি পাঁচলা পেরোনোর পর আদিত্য কেয়াকে বলল, 'মাতাজির সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। আমি মাতাজিকে জিজ্ঞেস করলাম আমার দুশ্চিন্তা করার অসুখ। বিশেষ করে স্বামীকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হয়। কী করে মনকে শান্ত রাখব?'

'উনি ধ্যান করতে শিখিয়ে দিলেন। চোখ বুঝে মনটাকে একেবারে চিন্তামুক্ত করে ফেলতে হবে। এবং ওই অবস্থায় বসে থাকতে হবে। এক দিনে পারব না। তবে বললেন, চেষ্টা করে গেলে আস্তে আস্তে পারব।'

কিছুক্ষণ চলার পরে আদিত্য বলল, 'কোথাও দাঁড়িয়ে মধ্যাহ্নভোজনটা সেরে নেওয়া দরকার। কলকাতা পৌঁছন অব্দি অপেক্ষা করতে গেলে আমার নাড়ি-ভুঁড়ি হজম হয়ে যাবে।'

খিদে সকলেরই পেয়েছে, কিন্তু কোন খাদ্যটা আদিত্যর পক্ষে উপযুক্ত হবে এ-নিয়ে আবার একপ্রস্থ অশান্তি। আদিত্য বলছে, যা হোক কিছু খেয়ে নিলেই হয়। একদিন অনিয়ম করলে এমন কিছু মহাভারত

অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কেয়া সে কথা কিছুতেই মানবে না। স্বামী-স্ত্রীর বচসার মধ্যে সুভদ্র ঢোকার সাহস পাচ্ছে না। শেষে রাস্তার ধারে একটা ভাতের হোটেল পাওয়া গেল, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মেনুতে রুই-কাতলা-পাবদা, চিকেন, মটনের সঙ্গে 'রুগির ঝোল' বলে একটা আইটেম রয়েছে। হোটেলের পরিচারককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, যাদের কিছুই হজম হয় না তাদের জন্যে তেল মশলা ছাড়া রান্না করা ওই বিশেষ পদটি ওই এলাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয় । এরপর আর অন্য কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

খাওয়া শেষ করে সকলে গাড়িতে উঠতে যাবে এমন সময় আদিত্যর ফোনটা বেজে উঠল। গৌতম ফোন করছে।

'আরে করেছিস কী তোরা? গোখরোর ল্যাজে পা দিয়েছিস।'

'কী বলছিস? আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।' আদিত্য সত্যিই কিছু বুঝতে পারছে না।

'আমি বুঝিয়ে বলছি। ওপরওলার কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেছে গ্লোবাল ট্রেডিং এবং সাউথ এশিয়ান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কোনও কাগজপত্র চাওয়া যাবে না। ওই দুটো জায়গায় কোনও ইনভেস্টিগেশনও করা যাবে না। তোদের নাম করে নির্দেশ এসেছে। তোরা কি ওখানে গিয়েছিলি?'

'অবশ্যই গিয়েছিলাম। এবং কিছুটা প্রোগেসও করেছি। দুটো জায়গাতেই কিছু কাগজপত্র চেয়েছিলাম। গ্লোবাল ট্রেডিং তো সরাসরি ওদের ব্যালেন্স সিট দিতে অস্বীকার করল। বলল, হায়ার অথরিটির চিঠি লাগবে। আর সাউথ এশিয়ান ব্যাঙ্ক কয়েকটা দিন সময় চাইল। আমরা ভাবছিলাম তোকে দিয়ে বলালে তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলো পেয়ে যাব।'

'সে গুড়ে বালি। কিন্তু আমি বোঝার চেষ্টা করছি চাপটা এল কোথা থেকে। সম্ভবত কোনও পলিটিকাল নেতার কাছ থেকে চাপটা এসেছে। আমি ওটাকে রিভার্স করার চেষ্টা করছি। জানি না কতটা পারব। যতদিন না পারি ততদিন ওই দুটো জায়গায় যাস না। আজ রাখি রে।' মনে হল ওদিক থেকে গৌতম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গাড়িতে উঠে গৌতমের কথাগুলো সুভদ্রকে বলল আদিত্য। সুভদ্রকে রীতিমত হতাশ দেখাচ্ছে।

'আজ সারাদিনে শেষ পর্যন্ত কী পেলাম দাদা? একে তো বনানী দাস একটা কথাও বলল না। তার ওপর অ্যাডিশানাল কমিশনারের কাছ থেকে এই নির্দেশ। সারা দিন পরিশ্রমের নিট ফল তো শূন্য।"

'না, না। মোটেই শূন্য নয়। মোটেই শূন্য নয়। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা জানতে পেরেছি। প্রথমত, বনানী দাসের সঙ্গে কথা বলে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে অতীতে সে একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করে ফেলেছিল। কাজটা এতটাই গর্হিত যে এখন সেকথা স্মরণ করলেও সে শিউরে উঠছে। গর্হিত কাজটা কী সেটা এখন আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, গৌতমের ওপরওলার কাছ থেকে যে নির্দেশটা এসেছে তাতে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে উই আর অ্যাবসোলিউটলি অন দ্য রাইট ট্র্যাক। না হলে এত জরুরি নির্দেশ আসত না। চিন্তা কোরো না। আমাদের তদন্ত ঠিক পথেই চলছে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(১)

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আদিত্যর খুব বেশি যাওয়া হয়নি। ছোটবেলায় যখন তাদের অবস্থা ভাল ছিল তখন ছুটি-ছাটায় বাবার সঙ্গে প্রত্যেক বছর মধুপুর যাওয়া হতো। গিয়ে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ দিন থাকা হতো। শুধু মধুপুর, আর কোথাও নয়। মধুপুরে তাদের একটা মস্ত বাড়ি ছিল। আরও ছোটবেলায় একবার পুরী যাওয়া হয়েছিল। বিয়ের পর কেয়াকে নিয়ে আরও একবার। এছাড়া গোয়েন্দাগিরির কাজে দু'বার দিল্লি গেছে, একবার মুম্বাই। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আদিত্যর ভ্রমণবৃত্তান্ত এইটুকুই। বিয়ের পর সেইভাবে হানিমুনে যাওয়া হয়ে ওঠেনি এখনও।

আসল কথা হল, খুব দূরে কোথাও যেতে আদিত্যর ভাল লাগে না। সেদিক থেকে সে ঘরকুনো খাঁটি কলকাতার ঘটি। তবে পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে ঘুরতে আদিত্যর ভালই লাগে। আদিত্য ভাবে, দূরে কোথাও যাবার আগে নিজের জায়গাটা ভাল করে দেখা দরকার। কত জায়গার নাম সে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে–বালুরঘাট, শান্তিপুর, ঝাড়গ্রাম—কিছুই তো দেখা হয়নি। অবসর সময়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ দেখা আদিত্যর নেশা। এইভাবেই জলঙ্গী নদীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল।

জলঙ্গী। জলই যার অঙ্গ। কী সুন্দর নাম। ও'মেলি সাহেবের বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার-এ আদিত্য দেখেছিল দেড়শ-দু'শো বছর আগেও বাংলাদেশে কত জীবন্ত নদী ছিল। তারা এখন চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে। জলঙ্গী নদী ঠিক সে রকম না হলেও এখন তার কিছু অংশ রীতিমত শীর্ণ। তবে আদিত্য ছবিতে দেখেছে কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ-মায়াপুর অঞ্চলে, যেখানে নদীটা ভাগীরথীতে এসে পড়েছে সেখানে, তার ব্যাপ্তি আছে। জলঙ্গী নদী দেখা হবে বলে তাই আদিত্য কিঞ্চিৎ উত্তেজিত।

সকাল দশটা আঠাশে শেয়ালদা থেকে লালগোলা ছাড়ে, কৃষ্ণনগর সিটি পৌঁছোয় বেলা সাড়ে বারোটায়। সে ট্রেনটা ধরলে রাত্তিরের ঘুমটা ভাল হত, কিন্তু সাড়ে বারোটায় কৃষ্ণনগর পৌঁছলে কাজের দেরি হয়ে যাবে। অগত্যা ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কোনও রকমে এসে আদিত্যরা শেয়ালদা স্টেশন থেকে ভোর ছটা পঞ্চাশের হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস ধরেছে। সুভদ্রর অবশ্য ভোরে ওঠা অভ্যাস, তাই তার ভোরের ট্রেন ধরতে কোনও অসুবিধে নেই। ট্রেনে উঠে আদিত্য ঘুমিয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণনগর যাওয়ার পথটা প্রায় কিছুই দেখা হল না।

হাজারদুয়ারি বেশ দেরি করে কৃষ্ণনগর সিটি পৌঁছেচে। পৌঁছনোর কথা আটটা পঞ্চাশে, যখন পৌঁছল তখন সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। আদিত্য ভেবেছিল তারা পৌঁছতে পৌঁছতে এই প্রাচীন শহরে বিপুল কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু কলকাতায় যেমন নাভিঃশ্বাস ওঠা ব্যস্ততা, এখানে ইস্টিশনের বাইরে এসে তেমন কিছু চোখে পড়ল না। দু'চারটে টোটো যাত্রীর আশায় অপেক্ষা করছে। একটা জলখাবারের দোকান মনে হল সদ্য খুলেছে। দোকানের বাইরে বড় উনুনে লুচি ভাজা হচ্ছে। খদ্দের তেমন নেই। অনতিদূরে সাত-আটটা শালিক রাস্তার ওপর বসে ঝগড়া করছে।

শহরের উত্তরপ্রান্তে জলঙ্গী নদীর ধারে ঘুর্নি পুতুলপট্টি। কেষ্টনগরের মাটির পুতুল তৈরির জায়গা। ঘুর্ণি পেরিয়ে ৩১২ নম্বর হাইওয়ে ধরে আরও খানিক গেলে ভাণ্ডারখোলা। ভাণ্ডারখোলা থেকে আরও এক কিলোমিটার দূরে হাইওয়ের ওপরেই সেন বেকারির কারখানা। কৃষ্ণনগর স্টেশনের দিক থেকে এলে কারখানাটা বাঁ দিকে পড়বে। পল্লব সেন এই রকমই বলে দিয়েছেন।

আদিত্যরা একটা গাড়ি ভাড়া করতে চাইছিল, কিন্তু স্টেশনের বাইরে ভাড়া করার মতো কোনও গাড়ি চোখে পড়ল না। টোটোওলা বলল, সাড়ে বারোটা নাগাদ লালগোলা ঢোকার সময় দু'একটা ভাড়ার গাড়ি চলে আসতে পারে। আদিত্যরা অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না। তাই টোটোওলাকেই জিজ্ঞেস করতে হল, ভাণ্ডারখোলা পেরিয়ে সেন বেকারির যে রুটি-কারখানা আছে সেখানে সে যাবে কিনা। কারখানাটা টোটোওলার চেনা। সে বলল, ওখানে গেলে ফাঁকা ফিরতে হবে। তাই দু'পিঠের ভাড়া লাগবে। আদিত্যরা তাতেই রাজি।

টোটোওলার বয়েস বছর পঁচিশ, নাম শম্ভু। বাড়ি ভাণ্ডারখোলা থেকে আরও খানিকটা দূরে পূর্বপণ্ডিতপুর বলে একটা যায়গায়। রুটি কারখানার সামনে দিয়ে তাকে দু'বেলা যাতায়াত করতে হয়।

শম্ভু বলল, ‘আমাকে দশ মিনিট সময় দিতে হবে। চা-জলখাবার খেয়ে নেব।' সুভদ্র বলল, ‘আদিত্যদা, আমরাও স্টেশন থেকে কিছু খেয়ে নিই। এর পর আবার কখন খাবার জুটবে জানি না। কিন্তু আপনার তো এই বাজারের লুচি-তরকারি চলবে না। কিছু ফল-টল দেখব ?”

খাবার ব্যাপারে আদিত্য রাজি। অত ভোরে কিছুই খেয়ে বেরোন হয়নি। আসার পথে ট্রেনে ঘন্টাখানেক ঘুমোনোর পর বেশ খিদে পেয়ে গেছে। সে লুচির কড়ার দিকে কিছুক্ষণ সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য কেয়া কাল রাত্তিরে টিফিন গুছিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত চিকেন স্যান্ডউইচ। সুভদ্র এবং শম্ভু-ড্রাইভার যখন গরম গরম লুচি-তরকারি খাচ্ছিল তখন তাদের পাশে বেঞ্চিতে বসে টিপিন বাক্স খুলে শুকনো স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে আদিত্য ভাবছিল, যার যা কপাল ।

শম্ভু বলেছিল আধঘন্টায় পৌঁছে দেবে। খাওয়া-দাওয়ার পর সেই যে সে বাথরুম থেকে আসছি বলে উধাও হয়ে গেল আর তার দেখা নেই। আদিত্যরা দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে।

সুভদ্র বলল, 'আদিত্যদা, শুভব্রত সাহার ব্যাপারটা নিয়ে একবার লোকাল থানায় খোঁজ নিলে হতো না?'

‘হাতে সময় থাকলে একবার খোঁজ নিতে পার। তবে আমার মনে হয় না খুব একটা লাভ হবে।'

‘কেন বলছেন লাভ হবে না?'

‘দ্যাখো, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে শুভব্রতর মৃত্যুটা আত্মহত্যা নয়। শুভব্রত যদি কম্পানির টাকা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে লজ্জায়, অনুশোচনায় আত্মহত্যা করত তাহলে নিশ্চয় কম্পানি তার স্ত্রীকে অত দরাজ হাতে কমপেনসেট করত না। আমার বিশ্বাস, সেন বেকারির কোনও একটা দু'নম্বরি ব্যবসা আছে। সেই ব্যবসাটার সঙ্গে শুভব্রত সাহার মৃত্যুটা জড়িত। দু'নম্বরি ব্যবসা গোপন রাখার জন্য সেন বেকারি স্থানীয় পুলিশকে নিয়মিত টাকা দেয়। তাই শুভব্রত সাহার ব্যাপারটায় স্থানীয় পুলিশ মুখ বন্ধ রেখেছে। আমরা গেলে পুলিশ মুখ খুলবে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং মাঝখান থেকে যারা দু'নম্বরি ব্যবসাটা করছে তারা সাবধান হয়ে যাবে।' ‘আপনি কী করে শিয়োর হচ্ছেন সেন বেকারির দু'নম্বরি ব্যবসা আছে?' ‘একটু ভেবে দ্যাখো, সেন বেকারির পাঁউরুটি আর তেমন চলে না। আমার পাড়ার দোকানদার বলল কিছুদিন আগে তার এক খদ্দের দেখিয়েছে সেন বেকারির পাঁউরুটির ভেতরে একটা আস্ত মরা আরশোলা রয়েছে। যদি এটা সত্যি হয়, মিথ্যে হবার কোনও কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে ধরে নিতে হবে সেন বেকারি আর মন দিয়ে পাঁউরুটি বানাচ্ছে না। তা হলে তারা কী করছে? পল্লব সেনের লাইফস্টাইল দেখে মনে হয় না তার কোনও অর্থকষ্ট আছে। তার বাবুয়ানির টাকাটা আসছে কোথা থেকে?'

‘আপনি কি এই সব কারণেই সেন বেকারির কারখানা দেখতে এলেন?’

‘অবশ্যই। আসলে দুটো সম্ভাবনা আমার মাথায় ঘুরছে। একটু অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে, কিন্তু একেবারে ভিত্তিহীন নয়। প্রথম সম্ভাবনা, মৃত্তিকা মিত্র, পার্থ মিত্রর খুনের সঙ্গে সেন বেকারির একটা যোগ আছে। ঠিক কী যোগ এখনও বুঝতে পারিনি, কিন্তু সেন বেকারির বাড়িতে সেন বেকারির সোল ডিসট্রিবিউটার তার পত্নী সহ খুন হল অথচ সেন বেকারি এই খুনের সঙ্গে জড়িত নয় এটা কি হতে পারে?

তাছাড়া, অশনি রায়ের বিরুদ্ধে পুলিশ যে কেসটা সাজিয়েছে সেটাতে বিস্তর ফাঁক আছে । অশনি রায় বন্দুক চালিয়ে একজনকে খুন করবে এটা ভাবতে আমার অসুবিধে হচ্ছে। তবে অশনি রায়ও ধোয়া তুলসীপাতা নয়। ওই ছবিগুলো তার প্রমাণ। হয়ত আরও কিছু আছে। সোমনাথ বাগ বলে যে লোকটি বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ-এর ওই ফ্ল্যাটে খুনের সময় সিকিউরিটির কাজ করত সে আমাকে বলল সে নাকি একদিন মৃত্তিকা মিত্রর সঙ্গে অশনিকে দেখেছে। কথাটা যদি সত্যি হয় তা হলে অশনি আগে থেকেই মৃত্তিকাকে চিনত...। আরে, ওই তো শম্ভু ড্রাইভার আসছে। পরে কথা বলব।'

'কী ব্যাপার? এত দেরি কেন?' সুভদ্র তার বিরক্তিটা চেপে রাখতে চাইছে না। 'ভেরি সরি দাদা। খুব দেরি করিয়ে দিলাম আপনাদের। আসলে কী জানেন? এই সময় আমি কয়েকটা বাচ্চাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার ডিউটি করি। চারজন কেজির বাচ্চা, মর্নিং স্কুল থেকে ফেরে। সেটার একটা ব্যবস্থা না করে তো আপনাদের নিয়ে যেতে পারি না। অনেক কষ্টে একজনকে রাজি করিয়েছি। সে বলেছে বাচ্চাগুলোকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। এবার চলুন।'

রাস্তাঘাট ফাঁকা। টোটো বেশ জোরে চলছে। আদিত্যর মনে হল দশ কিলোমিটার যেতে আধঘন্টা নাও লাগতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের অন্য অনেক মফস্বল শহরে যেমন বাড়িগুলো একে অপরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, এখানে তেমন নয়। দুটো বাড়ির মধ্যে ফাঁকা মাঠ। ছেলেরা ফুটবল খেলছে। আকাশে মেঘ রয়েছে বলে রোদ্দুরের চোখ-শাসানি নেই। ভ্রমণের আদর্শ দিন।

'এখানে সরভাজা-সরপুরিয়ার ভাল দোকান কোনটা?" সুভদ্র শম্ভু ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল। 'কলকাতায় ফেরার সময় কিছু নিয়ে যেতে হবে।'

'দাদা, এখানে সব থেকে পুরোনো দোকান হল অধর চন্দ্র দাস। একশ কুড়ি বছরের পুরোনো দোকান। ওটাই সব থেকে ভাল। লোকে বলে, ওরাই নাকি প্রথম মাথা খাটিয়ে সরভাজা-সরপুরিয়া বানিয়েছিল। তার আগে ওসব মিষ্টি ছিলই না।'

'ঠিক আছে। কলকাতা ফেরার আগে ওখান থেকেই নিয়ে যাব। আদিত্যদা নেবেন নাকি? সরভাজা-সরপুরিয়া ?'

'নিতে তো হবেই। কেয়া বারবার বলে দিয়েছে। ওই অধরের দোকানের কথাই বলেছে। কেয়াদের বাড়ি বহরমপুর, কিন্তু কেষ্টনগরে ওদের অনেক আত্মীয়স্বজন থাকে। তাই কেয়া অধর দাসের দোকানের কথা খুব ভাল করেই জানে।'

বাইরে বাড়িঘর। ধানজমি। ইরিগেশনের খালে মেঘে ঢাকা আকাশের ছায়া পড়েছে। আবার বাড়ি, লোহা-লক্কড়ের দোকান, টিভির দোকান, জামাকাপড়ের দোকান, সাইকেল সারাই-এর দোকান। খেলার মাঠ। আমবাগান। পেট্রলপাম্প। একটা কালভার্ট, নিচে কালো জলে কচুরিপানা। ঠাণ্ডা মফস্বল।

'নদীটা কত দূরে?" আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'কোন নদী?'

'জলঙ্গী নদী। এখান থেকে কত দূর?'

'খুব দূরে নয়। তবে আমরা নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছি না।'

শম্ভু হঠাৎ গাড়িটা রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে থামিয়ে দিল। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বলল, 'একটা ফোন করে আসছি দাদা।' বলে একটা বাড়ির আড়ালে মিলিয়ে গেল।

একটু পরে শম্ভু ফিরে আসতেই সুভদ্র কড়া গলায় বলল, 'অ্যাই, তোমার ব্যাপারটা কী? হঠাৎ হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছ?'

'একটা ফোন করতে গিয়েছিলাম দাদা। ওই যে আমার বন্ধুটা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আসবে বলেছিল, ফোন করে খবর নিচ্ছিলাম ও গিয়েছিল কিনা।'

“তা ফোনটা তো গাড়িতে বসেই করতে পারতে।' সুভদ্র তীক্ষ্ণ গলায় বলল। ‘আসলে কী, হাইওয়ে থেকে আমার মোবাইলে ভাল সিগনাল আসে না।' শম্ভু আর কথা না বলে গাড়ি চালিয়ে দিল। আদিত্যর মনে হল শম্ভু সত্যি কথা বলছে না।

সেন বেকারির কারখানাটা বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে একটা পুরোনো বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তূপ। ইঁট বেরিয়ে যাওয়া দেয়াল, ইঁটের ভেতর থেকে দু'একটা বট-অশথ মাথা তুলেছে। শম্ভু ড্রাইভারের টোটো আদিত্যদের কারখানার গেটে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

গেটে চারজন কোমরে পিস্তল বাঁধা দরোয়ান। নিশ্চয় তাদের জানা ছিল আদিত্যরা আসবে, একজন ইন্টারকম তুলে বলল, ‘কলকাতা থেকে বাবুরা এসে গেছেন।' তারপর আদিত্যদের দিকে ফিরে বলল, ‘আপনারা স্যার এই বাঁধানো রাস্তাটা ধরে সোজা চলে যান। রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা একতলা বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন তো? ওটা কারখানার আপিস। ওখানে রিসেপশানে গিয়ে আপনাদের নাম বললেই হবে।'

ধ্বংসস্তূপ-মার্কা বাড়িটার পাশে আধুনিক একতলা বাড়িটা আদিত্য প্রথমে খেয়াল করেনি। যখন খেয়াল করল, দেখতে পেল একতলা বাড়িটার পেছন থেকে আর একটা দোতলা বাড়ি উঁকি মারছে যেটা আরও আধুনিক। আদিত্য আন্দাজ করল ওটাই পল্লব সেনের বাংলো।

কারখানাটা তেমন বড় না হলেও তার পাঁচিল-ঘেরা চৌহদ্দিটা বিশাল। বেশিরভাগটাই ঝোপ-জঙ্গল হয়ে রয়েছে। হয়ত কর্তা ইচ্ছে করেই জঙ্গল পরিষ্কার করাননি যাতে পাখিরা আসতে পারে। জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা গোডাউন রয়েছে। সম্ভবত কাঁচা মাল মজুত করার জন্যে। গেট থেকে কারখানার অফিসে পৌঁছতে প্রায় পাঁচ মিনিট লেগে গেল।

রিসেপশনের বিষণ্ণ মেয়েটি আদিত্যদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। বলল, “আপনারাই সাপ্তাহিক ব্যবসা-বাণিজ্য ম্যাগাজিন থেকে এসেছেন? আমাদের এম ডি স্যার মেসেজ পাঠিয়ে বলেছেন আপনাদের কারখানাটা ঘুরে দেখাতে। আমরা তার ব্যবস্থাও করেছি।

কিন্তু তার আগে আপনারা স্নান করে লাঞ্চ খেয়ে নিন। একটু বিশ্রামও করে নিতে পারেন। সেই ভোরবেলা নিশ্চয় কলকাতা থেকে বেরিয়েছেন।'

আদিত্য ঠিকই আন্দাজ করেছিল। আপিসবাড়ির পেছন দিকের দোতলা ইমারতটাই পল্লব সেনের বাংলো এবং কম্পানির গেস্ট হাউস। আদিত্য দূর থেকে বুঝতে পারেনি, বাড়ি আসলে একটা নয়, দুটো। গায়ে গায়ে লেগে আছে বলে দূর থেকে একটা দেখায়। বাঁদিকের বাড়িটা পল্লব সেনের বাংলো, ডানদিকেরটা গেস্ট হাউস। দুটোই আধুনিক, ঝাঁ-চকচকে। আদিত্য অবাক হয়ে ভাবছিল, কারখানার যখন এই হতদরিদ্র অবস্থা তখন গেস্ট হাউস এত চকচকে কেন?

‘গেস্ট হাউসে অনেক লোক আসে?' ঘণ্টা খানেক পরে দুপুরের খাবার খেতে খেতে আদিত্য আর সুভদ্র গেস্ট হাউসের বেয়ারার সঙ্গে গল্প করছিল। বেয়ারাটি জানাল তার নাম কালীকিঙ্কর। সবাই কালী বলে ডাকে। বেশি কথা বলা অভ্যাস। তাতে অবশ্য আদিত্যদের সুবিধে হয়েছে।

‘এই গরমকালে গেস্ট হাউস ফাঁকাই থাকে। খুব মাঝে মাঝে, হয়ত দশ-পনের দিন পরে কেউ এল। কিন্তু শীতকালের দু'তিন মাস গেস্ট হাউস প্রায় ভর্তি থাকে।' কালী গেলাশে জল ঢালতে ঢালতে জানাল।

দ্বিপ্রাহরিক খাদ্যতালিকাটি ছিমছাম। ভাত, মুসুরির ডাল, বেগুনভাজা, সর্ষে বাটা দিয়ে মাঝারি আকারের টাটকা এবং অতীব সুস্বাদু পাবদা মাছ দু'টি করে, কাঁচা আমের টক।

‘কারা আসে এখানে?' সুভদ্র খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল।

‘ছোট সাহেবের কিছু বন্ধু পাখি দেখতে আসে। প্রত্যেক বছরই আসে। কাছেই জলঙ্গী নদীর ধারে একটা জঙ্গল আছে। সেখানে হেন পাখি নেই দেখা যায় না।'

‘ব্যবসার কাজে কেউ আসে না?' আদিত্যর প্রশ্ন।

‘হয়ত আসে । আমরা তো সাহেব সকলকে চিনি না। ম্যানেজারবাবু বলতে পারবে । তবে শীতকালে কিছু সাহেব-মেমও আসে।'

‘সাহেব-মেম? পাখি দেখতে আসে?'

‘পাখি দেখতে আসে কিনা জানি না। তবে আসে। একজন আছে বয়স্ক সাহেব । সে তার মেমকে নিয়ে আসে। আবার কয়েকজন অল্পবয়সী সাহেব-মেমও আসে। অল্পবয়সীগুলো আমাদের দিশি রান্না খুব ভালবেসে খায়। বুড়ো সাহেব-মেম আমাদের মতো খায় না। তাদের জন্যে চিকেন স্টু, পুডিং এইসব রান্না হয়। আমাদের বাবুর্চি রামলাল বড় সাহেবের বাবার আমলের লোক। সে ওইসব রান্না খুব ভাল পারে।' ‘তোমাদের তো তাহলে দারুণ ব্যাপার। সাহেব-মেম, স্টু-পুডিং...' আদিত্য ভাতের সঙ্গে ডাল মাখতে মাখতে বলল ।

কালী বেয়ারা কী বুঝল কে জানে। তবে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ সাহেব। শীতকালে এখানে একেবারে উৎসব লেগে যায়। তারপর একটু থেমে বলল, ‘রাত্তিরে আপনারা কী খাবেন? ভাত না রুটি?'

‘আমি রুটি খাব।' আদিত্য জানাল।

‘আমি ভাত। রাত্তিরে কী খাওয়াচ্ছ?' সুভদ্র জিজ্ঞেস করল।

‘রাত্তিরে মাটন হচ্ছে। মুসুরির ডাল, বেগুন ভাজা। কুচো চিংড়ি দিয়ে এঁচোড়। আর কাতলা মাছ। শেষে সরভাজা।'

‘বাঃ। বেশ, বেশ। এ তো এলাহি ব্যবস্থা। তা তোমাদের ছোট সাহেবও কি এখানে খান? নাকি তার বাংলোতে রান্নার ব্যবস্থা আছে?' মেনু শুনে সুভদ্রকে খুশি মনে হচ্ছে।

‘কম দিনের জন্যে এলে এখানেই খান। যখন বেশি দিনের জন্যে আসেন তখন কলকাতা থেকে ঠাকুর নিয়ে আসেন। বাবুর্চি রামলালও তখন মাঝে মাঝে বাংলোতে গিয়ে রান্না করে। আজ রাত্তিরে এখানে আপনাদের সঙ্গে খাবেন। বুঝতে পেরেছেন তো আমরা এই সাহেবকে ছোট সাহেব বলি? বড় সাহেব ছিলেন ওর দাদা।'

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তাই তো বলা উচিত। তা বড় সাহেবের স্ত্রী মানে ছোট সাহেবের বৌদিও কি এখানে আসেন ?'

‘খুব কম আসেন। হয়ত দু'বছরে একবার। কিংবা আরও কম। যখন বড় সাহেব বেঁচে ছিলেন তখন খুব আসতেন।'

‘আচ্ছা, একটা কথা বল তো। তোমাদের এই পাঁউরুটি কারখানায় এত পাহারা কেন? এখানে ঢোকার সময় দেখলাম চারজন সিকিউরিটি গার্ড কোমরে বন্দুক বেঁধে পাহারা দিচ্ছে। কী এমন আছে এখানে যে এরকম কড়া পাহারা দিতে হবে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

কালীকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। খানিকটা চিন্তা করে সে বলল, ‘আগে এতটা ছিল না জানেন। মালিক শাড়ির ব্যবসা শুরু করার পর থেকে দেখছি সিকিউরিটি খুব বেড়েছে। ওই গোডাউনগুলোতে মনে হয় কোটি কোটি টাকার শাড়ি মজুত থাকে।' ‘শাড়ির ব্যবসা? সেন বেকারি শাড়িরও ব্যবসা করে নাকি?' আদিত্য সত্যিই অবাক হয়েছে।

‘পাঁউরুটির ব্যবসা তো তেমন চলে না। শুনতে পাই, মালিক তাই শাড়ির ব্যবসা ধরেছে। শান্তিপুর থেকে ট্রাক ভর্তি শাড়ি আসে। সেসব নাকি অ্যামেরিকায় বিক্রি হয়। আমাদের অবশ্য সবই শোনা কথা। অনেক টাকার মাল গোডাউনে থাকে। তাই সিকিউরিটি। তাছাড়া কিছুদিন আগে কারখানা থেকে এক ট্রাক পাঁউরুটি বেরোচ্ছিল। কারখানার গেটের সামনে সেটা লুট হয়ে গেল। সেরকম যাতে আর না হয় সেজন্যেও হয়ত সিকিউরিটি বাড়িয়েছে......। আপনারা কি খাওয়া হয়ে গেলেই বেরুবেন? রিসেপশন থেকে জিজ্ঞেস করছিল।'

‘আমরা ঘন্টাখানেক বিশ্রাম করে তারপর বেরোব।'

'আমার নাম তমাল বিশ্বাস। আমি জেনারেল ম্যানেজার প্রণব মাইতি সাহেবের পি এস, মানে পারসোনাল সেক্রেটারি। স্যার জরুরি কাজে কলকাতা গেছেন। ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। আপনারা কারখানা দেখবেন তো? স্যার বলে গেছেন আপনাদের সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখাতে। অবশ্য দেখার খুব বেশি কিছু নেই।” লোকটাকে একটু নার্ভাস দেখাচ্ছে।

তমাল বিশ্বাসের বয়েস মনে হয় চল্লিশের কাছাকাছি। রোগা শরীর। উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন-চার ইঞ্চির বেশি হবে না। নাকের ওপর কালো ফ্রেমের চশমা-জোড়া হয়ত মুখমণ্ডলকে খানিকটা বাড়তি গাম্ভীর্য দেবার উদ্দেশ্যে বসানো হয়েছিল। ব্যক্তিত্ব দেবার বদলে সেটা চেহারাকে আরও নিরীহ, আরও গুরুত্বহীন করে তুলেছে।

'আমরা তৈরি। এখনই যেতে পারি।' আদিত্য বলল।

'ঠিক আছে। এখনই চলুন। কারখানা পাঁচটা অব্দি খোলা। তার মানে আমাদের হাতে ঘন্টাখানেক সময় আছে।'

তমাল বিশ্বাস আগে আগে চলল। পেছনে আদিত্য এবং সুভদ্র। আদিত্যদের পাশাপাশি হাঁটার মতো আত্মবিশ্বাস বোধহয় তার নেই।

'এই কারখানাটা কতদিনের পুরোনো?” সুভদ্র হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল। 'নাইনটিন থার্টি এইটে এই কারখানাটা তৈরি হয়েছিল। বড় সাহেবের ঠাকুরদাদার আমলে। আগে এদের কারখানা ছিল খিদিরপুরে। কিন্তু সেখানে জায়গার অভাব বলে এখানে অনেকটা জমি কেনা হল। তার খানিকটা নিয়ে কারখানা হল। বাকি জমিটার জন্যে অন্য সব প্ল্যান ছিল। কিন্তু কোনওটাই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।' কথা বলতে বলতে তমাল বিশ্বাস আদিত্যদের পাশে চলে এসেছে।

'আপনার এখানে অনেকদিন হয়ে গেছে মনে হয়। কারখানার ইতিহাস যখন এতটা জানেন।' আদিত্য হালকাভাবে বলল।

'আমার এখানে কিন্তু খুব বেশিদিন হয়নি। পাঁচ বছরও পুরো হয়নি। সাড়ে চার বছরের একটু বেশি হয়েছে। আসলে কী জানেন, যে কোনও জায়গার ইতিহাসটা জানতে আমার খুব ইচ্ছে করে। বিশেষ করে যেখানে চাকরি করছি, তার ইতিহাসটা।' তমাল বিশ্বাস লাজুকভাবে হাসল।

'আপনি কি ইতিহাসের ছাত্র?'

'না, ফর্মালি কখনও ইতিহাস পড়িনি। বি কম পাশ করেছিলাম। তারপর কম্পিউটারে একটা ডিপ্লোমা। ইতিহাস পড়লে তো চাকরি পাওয়া যায় না। তাই বাড়ি থেকে পড়ায়নি।'

আদিত্য টের পেল তমাল বিশ্বাস একটু একটু করে সহজ হচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল, “আপনার বাড়ি কি এদিকে?” 'আমার বাড়ি চুঁচুড়ায়। ওখানেই জন্ম, পড়াশোনা। এখানে চাকরি পাবার আগে নর্থ বেঙ্গলের একটা চা বাগানে চাকরি করতাম। বাড়ি থেকে অত দূরে থাকতে মন টিকত না। তারপর এই চাকরিটা পেয়ে গেলাম।'

'এখন বাড়ি থেকে যাতায়াত করেন?'

'প্রথম কয়েক মাস করেছিলাম। খুব ধকল পড়ে যায়। জিএম সাহেব অনেক সময় সকাল সকাল ডেকে পাঠান। আবার কখনও কখনও রাত অব্দি কাজ করতে হয়। সাহেবকে বলতে উনি কারখানার চৌহদ্দির মধ্যেই একটা কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে দিলেন। কোয়ার্টার মানে একটা ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম। আমি একা মানুষ কোনও অসুবিধে হয় না।'

আদিত্য ভাবছিল তমাল বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করবে তার চুঁচুড়ার বাড়িতে কারা আছে। কিন্তু তার আগেই কারখানার দরজা এসে গেল।

পাঁউরুটির কারখানায় দেখার বিশেষ কিছু নেই। অন্তত সেন বেকারির কারখানায় নেই। কারখানাটা পুরোনো, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক। দেয়ালে-কড়িকাঠে কালো আস্তরণ পড়েছে। সন্দেহ নেই বহুদিনের ধোঁয়া-ধুলো-ময়লা জমে এমন হয়েছে। কারখানার ভেতরটা প্রায়ান্ধকার। অল্প পাওয়ারের বাল্ব জ্বেলে কুড়ি-পঁচিশজন কাজ করছে। এই রকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রুটি তৈরি হলে রুটির ভেতর দু'একটা আরশোলা থেকে যাওয়াটা আশ্চর্য নয়। আদিত্য ভাবছিল, সরকারের খাদ্য দপ্তর এখানে ইন্সপেকশান করে না? তাদের তো কিছু ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি আছে। এই কারখানা সেসব মেনে চলে বলে তো মনে হয় না ।

রুটি বানানোর প্রক্রিয়াটা সাদামাটা। অন্তত সেন বেকারির কারখানায়। একটা প্রাগৈতিহাসিক যন্ত্রে ময়দার সঙ্গে জল, তেল, দুধ এবং ইস্ট মেশানো হচ্ছে। যন্ত্র সেইসব উপকরণগুলিকে প্রবল শব্দ সহযোগে মন্থন করে দৈত্যাকার একটা ময়দার লেচি বানাচ্ছে। সেই লেচিগুলোকে বিভিন্ন সাইজে ছোট ছোট করে কেটে রাখছে কয়েকটি লোক। অন্য কিছু লোক সেই ছোট লেচিগুলোকে এক পাউন্ড, হাফ পাউন্ড, কোয়ার্টার পাউন্ড ইত্যাদি মাপের আলাদা আলাদা বাক্সে ভরে বেক করার চুল্লিতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। চুল্লি থেকে পাঁউরুটি হয়ে বেরোনোর পর আর একদল লোক সেই পাঁউরুটিগুলিকে তাদের আয়তন অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজের কাগজ দিয়ে প্যাকিং করছে। কাগজে মোড়া গরম পাঁউরুটি স্তূপীকৃত হয়ে জমা হচ্ছে একটা পেল্লায় ট্রেতে।

আদিত্যর মনে হল, এই কারখানায় আরও কিছুটা যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব ছিল। হয়ত অর্থনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয়ও ছিল। সে তমাল বিশ্বাসকে শুনিয়ে সুভদ্রকে বলল, ‘দ্যাখো, এই জন্যে বাঙালির ব্যবসা চলে না। ব্যবসা চালাতে গেলে তো কিছুটা পয়সা ঢেলে প্রোডাকশান প্রোসেসটাকে মর্ডানাইজ করতে হবে। এখানকার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সেই ১৯৩৮-এর পর টেকনলজির আর কোনও উন্নতি হয়নি। এই ব্যাপারটা কিন্তু তুমি তোমার রিপোর্টে নিশ্চয় লিখো।'

তমাল বিশ্বাস উসখুস করছে। মনে হচ্ছে সে কিছু একটা বলতে চায়।

আদিত্য বলল, ‘তমালবাবু কিছু বলবেন?'

‘আমার কিছু বলা শোভা পায় না, বিশেষ করে আপনাদের মতো সাংবাদিকদের সামনে। আপনারা নিশ্চয় অনেক দেখেছেন, অনেক পড়েছেন। তাই আপনাদের মতের মূল্য তো দিতেই হবে। তবে যদি অনুমতি দেন তা হলে একটা কথা বলতে পারি।’

‘বলুন, বলুন। আমরা তো শুনতেই এসেছি। আমরা সবার কথা শুনতে চাই।'

সুভদ্র তমাল বিশ্বাসকে ভরসা দিল।

‘আমি সামান্য মানুষ, হয়ত ভুল বলছি। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে তবু বলছি, কারখানাটা যদি আরও যন্ত্রনির্ভর হয়ে যেত, সেটা হতেই পারত যেমন আধুনিক রুটি কারখানাগুলো হয়েছে, তা হলে কিন্তু এতগুলো লোক এখানে চাকরি পেত না। পঁচিশটার বদলে পাঁচটা লোক আর কিছু যন্ত্র দিয়ে কাজটা হয়ে যেত। আমরা সেন সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি সেটা হতে দেননি।'

আদিত্য ভাবছিল। আপাতদৃষ্টিতে তমাল বিশ্বাসের কথার একটা যুক্তি আছে। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে যুক্তির ফাঁকটা ধরা যায়। তবে সেটা ধরতে আদিত্যর কয়েক মিনিট লেগে গেল ।

স্তূপীকৃত পাঁউরুটির দিকে তাকিয়ে সে বলল, ‘কিন্তু তমালবাবু, এভাবে কি ভেবে দেখা যায় না? কারখানাটা আধুনিক হলে, আপনাদের পাঁউরুটির মান বাড়ত, বাজারে আপনাদের বিক্রিও বাড়ত। তখন কারখানাটাকে আরও বড় করা যেত। ফলে আরও লোক এখানে কাজ পেত।'

তমাল বিশ্বাসকে কিছুটা বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। সে আদিত্যর কথার মর্মার্থটা ঠিক ধরতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তাই বুঝতে পারছে না কী উত্তর দেবে। তার ভাগ্য ভাল। উত্তর দেবার বিড়ম্বনা থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে একজন উর্দি পরা লোক এসে বলল, “জিএম সাহেব এসে গেছেন। এই বাবুদের তার ঘরে ডাকছেন।'

আপিসবাড়ির দোতলায় জিএম সাহেবের কামরা। তমাল বিশ্বাস আদিত্যদের সেখানে পৌঁছে দিল। আদিত্যর মনে হল, কারখানা দেখার এখানেই ইতি।

জিএম সাহেবের কামরার বাইরে একজন উর্দি পরা বেয়ারা বসে আছে। তমাল তাকে গিয়ে আদিত্যদের আগমন সংবাদ জানাল। বেয়ারা আদিত্যদের ভেতরে যেতে বলছে।

'বিশ্বাসবাবু আপনি একটু থাকুন। কেটে পড়বেন না। সাহেব ডাকতে পারে।' বোঝাই যাচ্ছে তমাল বিশ্বাসকে বেয়ারাও খুব একটা পাত্তা দেয় না। কিম্বা হয়ত জিএম-র খাস বেয়ারা বলে এই লোকটির একটু বেশি দাপট।

'না, না। কেটে পড়ব কেন? আমি এখানেই বসছি।' তমাল বিশ্বাস বেয়ারার টুলের পাশে আর একটা টুলের ওপর বসল। তারপর আদিত্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা ভেতরে যান। স্যার আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি এখানেই থাকছি। কিছু দরকার হলে স্যার আমাকে ডেকে নেবেন।'

জিএম প্রণব মাইতির ঘরটা বড়, হয়ত এক সময় সাজানো-গোছানোও ছিল, এখন অযত্নে মলিন হয়ে গেছে। দেয়ালগুলো রঙচটা, দেখে মনে হয় অনেক দিন মিস্তিরির হাত পড়েনি। টেবিলের একপাশে ডাঁই করা ফাইলের ওপর সাতপুরু ধুলো। যে কারখানাটা একটু আগে আদিত্যরা দেখে এল, ঘরটা মোটের ওপর তার চেহারা এবং মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রণব মাইতির বয়েস পঁয়ষট্টি তো হবেই, সত্তর হওয়াটাও আশ্চর্য নয়। পক্ককেশ, দড়ি-পাকানো হাত, গাল তোবড়ানো, কিন্তু চোখের দৃষ্টি সতর্ক, ঈষৎ ধূর্ত।

'আসুন, আসুন, বসুন। ছোটবাবু বলে দিয়েছেন যতক্ষণ না উনি আসছেন, আমি যেন আপনাদের দেখাশোনা করি। কিন্তু সকালটা থাকতে পারলাম না। একটা বিশেষ কাজে কলকাতা যেতে হল। গেস্ট হাউসে আপনাদের কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'না, না। কোনও অসুবিধে হয়নি। খাসা গেস্ট হাউস। খাসা রান্না। আমরা খুব ভাল আছি।' সুভদ্র দরাজ গলায় সার্টিফিকেট দিল।

'তাছাড়া আপনার পি এস তমালবাবু খুব যত্ন করে আমাদের কারখানাটা ঘুরিয়ে দেখালেন।' আদিত্যর সংযোজন। 'আমাদের তো কারখানা দেখতেই আসা।'

"আপনারা কোন খবরের কাগজে কাজ করেন?'

'খবর কাগজ নয়। একটা বাংলা ম্যাগাজিন। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে। নামও ব্যবসা-বাণিজ্য। ইংরেজিতে এরকম ম্যাগাজিন অনেক আছে। বাংলায় আমরাই একমাত্র।'

ব্যবসা-বাণিজ্য বলে সত্যিই একটা ম্যাগাজিন আছে। আদিত্যর এক বন্ধুর বন্ধু সেখানে কাজ করে। তার কাছ থেকে আদিত্য ওই ম্যাগাজিনটা সম্বন্ধে কিছু কিছু জেনে এসেছে।

'সেন বেকারি নিয়ে আপনাদের হঠাৎ উৎসাহ হল কেন? সেন বেকারির ব্যবসা তো আর আগের মতো নেই।' প্রণব মাইতি বেল বাজালেন। বাইরে অপেক্ষমাণ বেয়ারাটি ঘরে ঢোকার পর তাকে বললেন, 'তমালকে বল চায়ের ব্যবস্থা করতে।'

বেয়ারা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর প্রণব মাইতি বললেন, 'হ্যাঁ, যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম। আমাদের নিয়ে হঠাৎ আপনাদের এত উৎসাহ কেন? সেন বেকারির সেই পুরোনো নামডাক তো আর নেই।'

'আসলে আমার এই নবীন বন্ধুটি এই কিছুদিন আগে ব্যবসা-বাণিজ্য ম্যাগাজিনে অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকেছে। ওকে আমাদের সম্পাদক বাঙালির পড়ন্ত ব্যবসাগুলো নিয়ে একটা লেখা তৈরি করতে বলেছেন। মানে যে ব্যবসাগুলো আগে ভাল চলত, এখন আর তেমন চলে না, সেগুলো নিয়ে। আমি ওকে একটু সাহায্য করছি।' আদিত্য হাসবার চেষ্টা করল।

‘আপনাদের সম্পাদকের নাম কী?' প্রণব মাইতি বুলেটের মত প্রশ্ন করল। ‘সুমিত সেনশর্মা।’ ভাগ্যক্রমে উত্তরটা আদিত্যর জানা ছিল।

“আর আপনাদের নাম?'

‘আমি রবি মজুমদার আর ইনি আমার বন্ধু মলয় শূর।' আদিত্য দু'হাত জড়ো করে নমস্কার জানাল। তার দেখাদেখি সুভদ্রও ।

‘আপনাদের কোনও ভিজিটিং কার্ড আছে?'

‘না। মলয় তো সদ্য চাকরিতে জয়েন করেছে, ও এখনও ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। আর আমার ভিজিটিং কার্ডটা আমি আনতে ভুলে গেছি।' আদিত্য মুখটাকে কাঁচুমাচু করার চেষ্টা করল।

‘ভিজিটিং কার্ড আনেননি? ঠিক আছে, আপনার প্রেস কার্ডটা সঙ্গে আছে নিশ্চয় । সেটা দেখান।'

আদিত্য চুপ করে আছে। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রণব মাইতি আরও কড়া গলায় বললেন, “কিছু একটা আইডেন্টিটি কার্ড আছে কি আপনাদের সঙ্গে? আধার কার্ড? ড্রাইভিং লাইসেন্স? আমি বুঝব কী করে আপনারা ফ্রড নন? '

আদিত্য তবু চুপ করে আছে। সুভদ্র আপাদমস্তক বিভ্রান্ত। বোধহয় ভাবছে, আদিত্যদা এরকম কাঁচা একটা কাজ করল কী করে? একবারও ভেবে দেখল না এখানে আইডেন্টিটি কার্ড চাইতে পারে?

আদিত্যদের এখনও চুপ করে থাকতে দেখে প্রণব মাইতি এবার গলা খানিকটা নামিয়ে বললেন, ‘ছোটবাবু বলেছেন আপনাদের দেখাশোনা করতে। কিন্তু ছোটবাবু কি জানেন আপনারা ফ্রড? আসলে ছোটবাবু মানুষটা পাখি দেখা আর গান-বাজনার বাইরে কিছুই জানেন না। চারদিকের পৃথিবীটা সম্বন্ধে ওঁর ধারণা নেই বললেই চলে। ওঁকে ঠকানো খুব সহজ। তাই আমাকে এক্সট্রা কেয়ারফুল থাকতে হয়। আপনারা কী মতলবে এখানে এসেছেন জানি না। জানতে চাইও না। শুধু একটা কথা বলছি। এই মুহূর্তে আপনারা কারখানা ছেড়ে চলে যান। না হলে আমি সিকিউরিটি ডেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আপনাদের বার করে দেব।'

‘আমাদের আসল পরিচয়টা না জেনে আশা করি ওরকম বোকামি আপনি করবেন না।' আদিত্য এতক্ষণে মুখ খুলেছে। তার গলায় কর্তৃত্বের ছাপ। 'ইনি সুভদ্র মাজি। কলকাতা পুলিশ থেকে এসেছেন। আপনাদের ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজার শুভব্রত সাহার মৃত্যুর তদন্ত করতে। আমি আদিত্য মজুমদার, বেসরকারি গোয়েন্দা, পুলিশকে সাহায্য করছি। ভেবেছিলাম সাংবাদিক পরিচয়ে এলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে। তা, আপনি যখন আমাদের আসল পরিচয়টা জেনেই ফেললেন তখন আর তঞ্চকতার প্রয়োজন নেই। সরাসরি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। অবশ্য তার আগে আপনি সুভদ্র মাজির পরিচয়পত্রটা একবার দেখে নিতে পারেন। চাইলে আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভের লাইসেন্সটাও। সুভদ্র, তোমার অফিশিয়াল আইডেন্টিটি কার্ডটা একে একবার দেখাবে ? '

ঘরে অস্বস্তিকর নীরবতা। তার মধ্যেই তমাল বিশ্বাস একজন বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকেছে। বেয়ারাটির হাতে চায়ের ট্রে।

‘তমাল, এই দু'জন ভদ্রলোক, যাদের তুমি একটু আগে কারখানাটা ঘুরে ঘুরে দেখালে, আসলে সাংবাদিক নন। ইনি সুভদ্র মাজি, কলকাতা পুলিশ। আর ইনি আদিত্য মজুমদার, বেসরকারি গোয়েন্দা। এরা শুভব্রত সাহার মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করতে চান।'

‘কলকাতা পুলিশ থেকে এসেছেন? শুভব্রত সাহার মৃত্যুর ব্যাপারটা তদন্ত করতে চান?' তমাল বিশ্বাসকে বিপন্ন দেখাচ্ছে। ‘আমাকে কী করতে বলছেন স্যার?'

‘আপাতত কিছুই করতে বলছি না। আমিই এদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। তবে পরে তোমাকেও এরা কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন। তাই আগে থেকে বলে রাখলাম। আচ্ছা, কাল ভোরবেলা তো এদের নিয়ে ছোটবাবুর পাখি দেখতে যাবার কথা । তোমাকে ব্যবস্থা করে রাখতে বলেছিলাম। ব্যবস্থা হয়েছে?”

'হ্যাঁ স্যার। সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

'ব্যবস্থাটা করে রাখ। এদের আসল পরিচয়টা জানতে পারলে ছোটবাবু এদের নিয়ে পাখি দেখতে যাবেন কিনা জানি না। তবু ব্যবস্থাটা করা থাক। ঠিক আছে। তুমি এখন আসতে পার। বাইরেই থাক। দরকার হলে ডাকব।'

তমাল বিশ্বাস বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল। বলল, 'পরিমলকে ব্যবস্থাটা করতে বলেছিলাম স্যার। ও নিশ্চয় সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। তবু আমি একবার ওর সঙ্গে কথা বলে দেখে নিচ্ছি। ওর তো মোবাইল নেই। সামনা সামনি কথা বলতে হবে। আপনি নিশ্চিন্তে এদের সঙ্গে কথা বলুন স্যার। আমি এদিকটা দেখছি।' তমাল বিশ্বাস আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তমাল বেরিয়ে যাবার পর প্রণব মাইতি শান্তভাবে বললেন, 'চা খান। '

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনাদের কিন্তু ছদ্ম-পরিচয়ের দরকার ছিল না। এখানে আমরা সকলেই ল-অ্যাবাইডিং সিটিজেন। পুলিশ এসে কিছু জিজ্ঞেস করলে আমরা যেটুকু জানি এমনিতেই বলে দিতাম।'

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'শুভব্রত সাহা আপনাদের এখানে কত দিন কাজ করেছেন?'

'ঠিক কত দিন বলতে পারব না, ফাইল দেখে বলতে হবে। তবে বছর বারো তো হবেই। হয়ত আর একটু বেশি।'

'উনি কী কাজ করতেন?'

'শুভব্রত সাহা অ্যাকাউন্টস অফিসার হয়ে ঢুকেছিল। ছেলেটা বেশ চটপটে, চালাক-চতুর। তাই দেখে পরে ওকে ডিসট্রিবিউশন ম্যানেজার করে দেওয়া হয়।'

'কত দিন পরে?'

'এটাও ফাইল না দেখে একেবারে সঠিক বলতে পারব না। আমার যত দূর মনে পড়ছে, শুভব্রতর যখন প্রোমোশন হল তখন ওর আট-ন'বছর চাকরি হয়ে গেছে।'

'তার মানে তিন-চার বছর উনি ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ছিলেন?'

'মোটামুটি ওইরকমই হবে।'

'আচ্ছা, আপনার নিশ্চয় মনে আছে, এর আগে আপনাদের ডিসট্রিবিউশনটা দেখত যে কম্পানি তার মালিক পার্থ মিত্র খুন হয়েছিলেন?"

'হ্যাঁ...... মনে আছে।' প্রণব মাইতিকে দেখে মনে হল অস্বস্তিতে পড়েছেন। 'উনি খুন হওয়ার পরেই কি শুভব্রতবাবু ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজার হলেন?' 'হ্যাঁ। আমরা ঠিক করলাম বাইরের কম্পানিকে দিয়ে আর ডিসট্রিবিউশনটা করাব না। নিজেরাই নিজেদের মাল ডিসট্রিবিউট করব। সেই অনুযায়ী ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজারের পদটা তৈরি হল। জেলায় জেলায় বিক্রির জন্য এজেন্ট নিয়োগ করা হল।'

'আচ্ছা, শুভব্রত সাহা কত টাকা মাইনে পেতেন?'

'এটাও অফহ্যান্ড বলতে পারব না। খুব বেশি নয়। আমাদের দিশি কম্পানি তো। খুব বেশি আমরা দিতে পারি না। এই ধরুন মাসে ফিফটি থাউসেন্ড মতো পেতেন।' 'এই টাকাটা আপনারা ওর স্ত্রীকে দিয়ে যাবেন? শুভব্রত কম্পানির টাকা সরিয়েছে এটা জেনেও?'

'দেখুন, এটা আমার ডিসিশন নয়, ছোটবাবুর ডিসিশন। ছোটবাবুর দয়ার শরীর তাঁর মনে হল শুভব্রতর পরিবার না খেয়ে মরবে।'

'শুভব্রত চোর এটা আপনাদের কেন মনে হল?

"কিছু দিন ধরেই সন্দেহ হচ্ছিল। বিক্রি থেকে যতটা ক্যাশ-ফ্লো হবার কথা তার থেকে কম টাকা কম্পানির অ্যাকাউন্টে ঢুকছিল। এই ব্যাপারটা শুভব্রতর আনডারে। শুভব্রত যে অ্যাকাউন্টগুলো হ্যান্ডেল

করে সেগুলো চেক করে দেখলাম। চুরিটা খুব সহজেই ধরা পড়ে গেল।'

আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ভাবছে। সুভদ্র সাংবাদিক সাজতে গিয়ে ধরা পড়ে যাবার পর থেকে সেই যে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে আর মুখই খুলছে না। অবশেষে আদিত্যই আবার মুখ খুলল ।

'অন্য একটা প্রশ্ন করছি। আপনারা র-মেটিরিয়াল কোথা থেকে কেনেন?' 'ময়দা আসে ইউপি থেকে আর দুধটা লোকালি প্রোকিওর করা হয়। ইস্ট আসে বাংলাদেশ থেকে। '

'বাংলাদেশ থেকে ইস্ট? কেন? আমাদের দেশে ইস্ট পাওয়া যায় না?'

'আসলে, মুসলিমদের রুটি-কেক বানানোর একটা পুরোনো ট্র্যাডিশন আছে। সেই ট্র্যাডিশন মেনে বহুবছর ধরে ঢাকা থেকে আমাদের ইস্টের সাপ্লাই আসছে। এটা স্পেশাল এক ধরনের ইস্ট। অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।'

'কীভাবে আসে? বাই রোড?'

'আগে তাই আসত। বাহাত্তর সাল থেকে ভারত-বাংলাদেশ রিভার ট্রেড রুট খুলে গেছে। নদীপথে কিছু রুট আছে, যেগুলোকে বলা হয় প্রোটোকল রুট। সেই রকম একটা রুট দিয়ে আমাদের ইস্ট আসে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর-বরিশাল হয়ে সোজা নামখানা। সেখান থেকে ডায়মন্ডহারবার। আমরা মালটা ডায়মন্ডহারবার থেকে কালেক্ট করে নিই।'

'আচ্ছা, কিছুদিন আগে আপনাদের গেটের কাছ থেকে আপনাদেরই একটা পাঁউরুটি-ভর্তি ট্রাক লুট হয়েছিল না?'

'হ্যাঁ, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এত কষ্ট করে কেন পাঁউরুটির ট্রাক লুট করল কে জানে। হয়ত কিছু স্টারভিং ভিলেজার কাজটা করেছে। যাই হোক তার পর থেকে আমরা সিকিউরিটি অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছি।'

'আর একটা প্রশ্ন। আমরা শুনলাম সেন বেকারি সম্প্রতি শাড়ি এক্সপোর্ট-এর ব্যবসায় ঢুকেছে। এটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ ঠিক। বলতে পারেন খানিকটা বাধ্য হয়েই আমাদের অন্য ব্যবসায় যেতে হয়েছে। আমাদের পুরোনো মার্কেটটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। বাজারে ভীষণ কম্পিটিশন। নতুন নতুন কম্পানি নতুন নতুন প্রডাক্ট নিয়ে আসছে। টিকে থাকতে গেলে পুরো প্রোডাকশনটা ঢেলে সাজাতে হবে। তার জন্যে অনেক ইনভেস্টমেন্ট দরকার। সে টাকা আমাদের নেই। আমি ভেবে দেখলাম, তার থেকে সহজ অন্য কোনও ব্যবসায় যাওয়া। কাছেই শান্তিপুর, তাঁতিদের জায়গা। সেখান থেকে শাড়ি কিনে অ্যামেরিকায় এক্সপোর্ট করার সম্ভাবনাটা তখনই মাথায় এল।'

'কিন্তু এক্সপোর্ট করার জন্য তো বিদেশে একটা নেটওয়ার্ক দরকার। সেটা কীভাবে তৈরি করলেন?'

'আমাদের নিজস্ব কোনও নেটওয়ার্ক নেই। শুধু একটা বিজনেস পার্টনার আছে। আমরা শাড়ি প্রোকিওর করে তাদের দিয়ে দিই। তারা তাদের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সেই শাড়ি অ্যামেরিকায় বিক্রি করে।'

'আপনাদের বিজনেস পার্টনারের নাম কী?'

'গ্লোবাল ট্রেডিং এজেন্সি। খুব বড় কম্পানি। গারমেন্ট এক্সপোর্টের বিশাল বিজনেস এদের।'

জানলা দিয়ে আদিত্য বাইরে তাকাল। সন্ধে নামছে। দূরে কোনও মন্দিরে সন্ধ্যারতি হচ্ছে মনে হয়। ঘন্টার শব্দ ভেসে আসছে। দমকা হাওয়া। গাছের মাথাগুলো প্রবলভাবে দুলছে।

(৩)

প্রণব মাইতির আপিস থেকে বেরিয়ে আদিত্য বুঝতে পারছিল না এবার কোথায় যাবে। সুভদ্র এখনও গুম মেরে আছে। আকাশের মতিগতি ভাল নয়। দুটো লম্বা লম্বা গাছের ফাঁক দিয়ে যে এক টুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছে সেটা কালো মেঘে থমথম করছে।

‘গেস্ট হাউসে ফিরে গিয়ে পল্লব সেনের জন্যে অপেক্ষা করা যাক, কী বল?' আদিত্য সুভদ্রকে জিজ্ঞেস করল।

সুভদ্র উত্তর দেবার আগেই দু'জনে দেখতে পেল মেন গেটের রাস্তা দিয়ে তমাল বিশ্বাস দ্রুতপায়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

‘আপনাদের কথা হয়ে গেল?' তমাল বিশ্বাস সামান্য হাঁপাচ্ছে। ‘স্যার বলেছিলেন আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে। ভেরি সরি, আমি একটু বাড়ি গিয়েছিলাম। স্যারের চেম্বার থেকে আপনারা অনেকক্ষণ বেরিয়ে এসেছেন?'

‘না, না। এই তো বেরোলাম। ভাবছিলাম গেস্ট হাউসে ফিরে যাই। পল্লব সেন এখনও আসেননি বোধহয়?' আদিত্য ঘড়ি দেখল।

‘না। ছোট সাহেব এখনও আসেননি। আসলে, আমাদের কম্পানির মালিককে সকলে ছোট সাহেব বলে। সকলের দেখাদেখি আমিও তাই বলি।' তমাল বিশ্বাস লাজুকভাবে হাসল ।

‘আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হতো। আপনার সময় হবে?' ‘আমার সময়? কী যে বলেন। অবশ্যই হবে। স্যার তো আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে থাকতে বলেছেন।'

‘তা হলে গেস্ট হাউসেই ফিরে যাওয়া যাক। ওখানে বসে কথা বলা যাবে।' ‘সেটাই ভাল হবে । ওরা হয়ত একটু চায়েরও ব্যবস্থা করতে পারে।' সুভদ্র এতক্ষণে কথা বলেছে।

ওরা তিনজন গেস্ট হাউস পৌঁছনোর আগেই ঝড় উঠল। গাছের ডালগুলো যেভাবে দুলছে, ভয় লাগে গাছগুলো বুঝি এখনি উপড়ে পড়বে। একটু দূরে গোডাউনের প্লাস্টিকের শেডগুলো প্রবল হাওয়ায় শব্দ করেই চলেছে। বৃষ্টি নামল। প্রথমে দু'এক ফোঁটা, তারপর ঝমঝম করে। ভাগ্যক্রমে ততক্ষণে তিনজন গেস্ট হাউসে ঢুকে গেছে।

‘শুভব্রত সাহা, আপনাদের ডিসট্রিবিউশন ম্যানেজার, যিনি কিছুদিন আগে মারা গেছেন, আপনি কি তাকে চিনতেন?' মিনিট কুড়ি পরে আদিত্য চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

‘শুভব্রত সাহা? ...হ্যাঁ চিনতাম।' তমাল বিশ্বাসকে আড়ষ্ট দেখাল, তার বস প্রণব মাইতিকে যেমন দেখিয়েছিল। ‘কতটা চিনতেন?'

‘সাহা সাহেব তো ম্যানেজার র‍্যাঙ্কের, আর আমি সাধারণ অ্যাসিস্টেন্ট। একটা দূরত্ব তো থাকবেই। তবে সাহা সাহেব হাসিখুশি, দিলখোলা মানুষ ছিলেন। অফিসে সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন। তার মধ্যেই, আমার মনে হয় আমাকে একটু বেশি পছন্দ করতেন।'

‘কেন? আপনাকে আলাদা করে বেশি পছন্দ করতেন কেন?' সুভদ্র জিজ্ঞেস করল।

‘আসলে, সাহা সাহেবের কোয়ার্টারটা আমার কোয়ার্টারের পাশেই ছিল। সাহা সাহেবের মস্ত বড় কোয়ার্টার। অত বড় কোয়ার্টারে উনি একাই তো থাকতেন। ওর ফ্যামেলি কালেভদ্রে আসত। তা, একা থাকতে থাকতে মানুষের তো একটু অন্য মানুষের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে করতেই পারে। সেরকম ইচ্ছে সাহা সাহেবের মাঝে মাঝে হতো। তখন আমাকে ডেকে নিতেন। ওঁর রাধুনি একটা ছিল। কিন্তু তার রান্না খেতে খেতে সাহা সাহেবের অরুচি হত। তখন আমার ডাক পড়ত।'

‘আপনি শুভব্রত সাহার বাড়ি গিয়ে রান্না করে দিয়ে আসতেন ? '

‘হ্যাঁ। বিশেষ করে বিরিয়ানি বা মাংস খাবার ইচ্ছে হলে সাহা সাহেব আমাকে ডাকতেন। রান্নার মাসি ওসব রাঁধতে পারত না।'

‘বাঃ। আপনার এত গুণ দেখে বোঝা যায় না।' আদিত্য হালকা গলায় বলল। তমাল বিশ্বাস চুপ করে আছে। বুঝতে পারছে না আদিত্য ঠাট্টা করছে, নাকি প্রশংসা করছে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আদিত্য বলল, ‘মারা যাওয়ার আগে শুভব্রত সাহার ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন?

তমাল বিশ্বাস চুপ করেই আছে। এখন মনে হচ্ছে সে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারছে না। তার ভেতরে যেন একটা যুদ্ধ চলছে। সুভদ্র কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। আদিত্য ইশারায় তাকে চুপ করতে বলল। তমাল বিশ্বাস নিজেই ঠিক করুক সে কিছু বলবে কিনা, আর বললে কতটা বলবে।

'আমরা কি অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলতে পারি?' তমাল বিশ্বাস অবশেষে মুখ খুলেছে। 'এই জায়গাটা কথা বলার পক্ষে ভাল নয়।'

বাইরে রীতিমত বৃষ্টি পড়ছে। এই অবস্থায় গেস্ট হাউস থেকে বেরোনো মুস্কিল। 'আপনাদের কারও ঘরে গিয়ে কথা বলা যাবে?' তমাল বিশ্বাস নিচু গলায় বলল। আদিত্য ইতস্তত করছে। তার ঘরটা ভীষণ অগোছাল হয়ে আছে। দুপুরে খাবার পর কিছুক্ষণ বিছানায় গড়িয়ে নিয়েছিল। এলোমেলো চাদর, বালিশ না গুছিয়েই বেরিয়ে পড়েছে। চেয়ার এবং টেবিল দখল করে আছে ছাড়া জামাকাপড়। ওই রকম একটা ঘরে বাইরের কাউকে নিয়ে যেতে সংকোচ হয়।

'আমার ঘরে যাওয়া যেতে পারে।' আদিত্যকে আশ্বস্ত করে সুভদ্র বলল। সুভদ্র সত্যিই গোছানো স্বভাবের। তার ঘরে ঢুকে আদিত্য দেখল, পরিপাটি বিছানা, জামাপ্যান্ট ক্লজেটে, ব্যাগটা যত্ন করে টেবিলের তলায় রাখা। ঘরে একটা আরাম কেদারা, একটা চেয়ার। আদিত্য আরাম কেদারায় বসল, তমাল চেয়ারে। সুভদ্র খাটে, বালিশে ঠেশ দিয়ে আরাম করে বসল। তমাল বিশ্বাসকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে।

'বলুন এবার, কী বলবেন।' সুভদ্রর গলাটা খানিক অধৈর্য শোনাল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি। একটু আগে জিজ্ঞেস করলেন না মারা যাবার আগে সাহা সাহেবের মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখেছিলাম কিনা? মারা যাবার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সাহা সাহেবের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছিল। ওঁর বাড়ির পাশেই আমার বাড়ি বলে ঘটনাটা আমি খুব কাছ থেকে ঘটতে দেখেছিলাম।'

'ঘটনা? কী ঘটনা?' সুভদ্রকে ঈষৎ উত্তেজিত শোনাল।

'দেখুন, আমি যেটা বলব সেটা কম্পানির বিরুদ্ধে যেতে পারে। তাই অনুরোধ করছি, দয়া করে কাউকে বলবেন না যে এই কথাগুলো আমি বলেছি। সত্যি বলতে কি, আমি এখনও বুঝতে পারছি না কথাগুলো আমার বলা উচিত কিনা।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এখানে যে কথাগুলো আপনি বলবেন সেটা আপনার কম্পানির কেউ জানতে পারবে না।' আদিত্য অভয় দিল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তমাল শুরু করল।

'আমি যে ঘটনাটার কথা বলব সেটার সূত্রপাত বেশ কিছু দিন আগে। আমি তখন সবে কম্পানি জয়েন করেছি। এখান থেকে কিছু দূরে জলঙ্গীর ধারে কৃষ্ণচন্দ্রপুর বলে একটা জায়গা আছে। ওখানে সেন বেকারির আর একটা কারখানা ছিল। সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। শর্ট-সার্কিট হয়ে সেই কারখানায় আগুন লেগে যায়। একজন মারা যায়। কারখানাটাও সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। দোষটা কিন্তু কম্পানির। পুরোনো ওভেনগুলো অনেকদিন আগেই বাতিল করে দেওয়া উচিত ছিল। ইলেকট্রিকের তারগুলোও বদলানো উচিত ছিল। কর্তাদের গাফিলতিতে সেসব হয়নি। কিন্তু তার থেকেও খারাপ ব্যাপার হল পুরো দোষটা চাপিয়ে দেওয়া হয় সেই কর্মচারিটির ওপর আগুন লাগার ফলে যার মৃত্যু হয়েছিল।'

'ইনশিয়োরেন্স ছিল?'

'একদম ঠিক জায়গায় ধরেছেন। ইনশিয়োরেন্স অবশ্যই ছিল, এবং ইনশিয়োরেন্স কম্পানি যদি প্রমাণ করতে পারত ঘটনাটা কম্পানির নেগলিজেন্স-এর ফলে ঘটেছে তা হলে তারা এক পয়সাও দিত না। তাই ব্যাপারটা এমনভাবে সাজানো হল যাতে মনে হয় ওই কর্মচারিটির অসাবধানতায় দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। আসল কথাটা হল, যেহেতু পুরো দোষটা ওই কর্মচারিটির ঘাড়ে চাপানো হল, তাই তার পরিবার খুব অল্প ক্ষতিপূরণ পেল। জিএম সাহেবের ধারণা হল ওই কর্মচারিটিকে বেশি কমপেনসেশন দিলে ইনশিওরেন্স

কম্পানি ধরে নেবে আসল দোষটা সেন বেকারির। ইনশিয়োরেন্স-এর পুরো টাকাটা কম্পানি নিয়ে নিল। এবং বলতে খারাপ লাগে, এই জঘন্য প্ল্যানের পুরোটাই বেরিয়েছিল আমাদের জিএম প্রণব মাইতির মাথা থেকে। ওরকম খারাপ মানুষ আমি আর দেখিনি। '

'কিন্তু এর মধ্যে শুভব্রত আসছে কী করে?" সুভদ্র জিজ্ঞেস করল।

'বলছি কী করে আসছে। ধীরে ধীরে সব বলছি। তার আগে বলি, যে কর্মচারিটি কম্পানির দোষে মারা গেল, কিন্তু ক্ষতিপূরণ প্রায় পেলই না, তার নাম বিশ্বজিৎ দাস। বিএ পাশ ছেলে, চাকরি পায়নি তাই রুটির কারখানায় কাজ নিয়েছিল। ঠিক শ্রমিকের কাজ নয়, সুভারভাইজারের কাজ। রাত্তিরে যখন কারখানার শিফট শেষ হয়ে যায় তখন বিশ্বজিতের রোজকার কাজ ছিল সব কিছু একবার দেখে নিয়ে দরোয়ানকে কারখানা বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেওয়া। সেই রাত্তিরে যখন সে সব কিছু ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্যে কারখানায় ঢোকে তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল।' 'এই বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে কি আপনার আলাপ ছিল?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল। 'খুব বেশি আলাপ ছিল না। মুখ চিনতাম।'

'ঠিক আছে। তারপর বলুন।'

'মারা যাবার কিছুদিন আগে বিশ্বজিৎ বিয়ে করেছিল। তার বউ রেখা গরিব ঘরের মেয়ে, বাবা-মা কেউ নেই, বিয়ের আগে দাদা-বউদির সংসারে থাকত। বিশ্বজিৎ মারা যেতে রেখা অকূলপাথারে পড়ল। দাদা-বৌদির সংসারে ফিরে যাবার উপায় নেই । এদিকে বিশ্বজিৎও বিশেষ কিছু টাকা-পয়সা রেখে যেতে পারেনি। কম্পানিও তেমন কোনও ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে না। এই সময় সে মাঝে মাঝেই জিএম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসত। অফিস থেকে যদি আরও কিছু টাকা-পয়সা পাওয়া যায় তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করত। জিএম সাহেব তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখতেন । সারাদিন বসিয়ে রেখেও অনেক সময় দেখা করতেন না। ব্যাপারটা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমার ভীষণ খারাপ লাগত। কিন্তু আমি তো একেবারেই চুনোপুঁটি। প্রণব মাইতি স্যার যেখানে বলে দিয়েছেন টাকা দেবেন না সেখানে আমি কী করতে পারি?'

'আপনাদের ছোটবাবু ব্যাপারটা জানতেন না?'

'ঘটনাটা ঘটার সময় ছোটবাবু দেশে ছিলেন না। পাখি দেখতে নরওয়ে না ফিনল্যান্ড কোথায় যেন গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পরে জিএম সাহেব তাঁকে বললেন কৃষ্ণচন্দ্রপুরের কারখানা আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ইনশিয়োরেন্স কম্পানির কাছে ক্লেম সাবমিট করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ভাল টাকাই পাওয়া যাবে। আমার মনে হয়, একটা লোক যে কারখানার মধ্যে পুড়ে মারা গেছে সেটা ছোটবাবুকে জানানোই হয়নি।'

'তারপর?'

'তারপর এক সময় ইনশিয়োরেন্স-এর টাকাটা পাওয়া গেল। ছোটবাবু তাতেই খুশি। আর কিছু উনি জানতে চাননি। খুশি হয়ে উনি আবার কোথাও পাখি দেখতে চলে গেলেন।'

"আর রেখা দাস ?

'হ্যাঁ, সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। এই সময় রেখা দাসের সঙ্গে শুভব্রত সাহা স্যারের দেখা হয়। প্রণব মাইতি স্যারের কাছে সুবিধে করতে না পেরে রেখা দাস সাহা সাহেবকে গিয়ে ধরেছিল। সাহা সাহেব আমাদের জিএম-এর মতো অমানুষ নন। তাছাড়া পুরো ব্যাপারটা জানতেন বলে উনি রেখা দাসের প্রতি বেশ সিমপ্যাথেটিক ছিলেন। কিন্তু ওঁর পক্ষেও চট করে কিছু করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু রেখা দাস, ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করে, তেমনি করে সাহা সাহেবকে আঁকড়ে ধরল। কারখানা ছুটি হবার পরে আমি মাঝে মাঝেই ওকে সাহা সাহেবের কোয়ার্টারে আসতে দেখতাম। জিএম সাহেব আমাদের সকলের বস, কম্পানিটা উনিই চালান। ওঁকে টপকে রেখা দাসের জন্যে কম্পানির তরফ

থেকে কিছু করা সাহা সাহেবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু রেখা দাসকে যে উনি ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন এটা সাহা সাহেব নিজেই আমাকে বলেছিলেন।'

'রেখা দাসের বাড়ি কোথায়?'

'ওই কৃষ্ণচন্দ্রপুর অঞ্চলেই, যেখানে কারখানাটা ছিল। ওখানে বিশ্বজিৎ দাসের পৈতৃক একটা ছোট বাড়ি আছে। সেখান থেকেই রেখা দাস সাহা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসত । এইভাবে রোজ আসতে আসতে রেখা দাসের সঙ্গে সাহা সাহেবের একটা ঘনিষ্ঠতা তৈরি হল। আমার চোখের সামনেই ব্যাপারটা ধীরে ধীরে ঘটে গেল । আমি জানতাম সাহা সাহেবের বউ-মেয়ে আছে। তাদের এখানে দু'একবার আসতেও দেখেছি। তাই ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি। বিশ্বজিৎ দাসের পরিবারকে কম্পানির ফাঁকি দেওয়াটা যেমন ভাল লাগেনি, তেমনই বউ-বাচ্চা থাকতে একটা সদ্য বিধবা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানোটাও খারাপ লেগেছিল। আর মেয়েটাই বা কী রকম? এত তাড়াতাড়ি স্বামীকে ভুলে গেল? যাই হোক, আমি অতি সামান্য অফিস অ্যাসিস্টেন্ট, আমি আর কী বলব? তাই চুপ করেই ছিলাম। কিন্তু টের পেতাম ব্যাপারটা একটা খারাপ দিকে মোড় নিচ্ছে।'

'খারাপ দিক? মানে আপনি কি বলতে চাইছেন শুভব্রত সাহার মৃত্যুর সঙ্গে এই ব্যাপারটার যোগ আছে?'

'আমার তো তাই মনে হয়। এটা ছাড়া আমি তো কোনওভাবেই সাহা সাহেবের আত্মহত্যাটার ব্যাখ্যা পাচ্ছি না।'

'আপনি নিশ্চিত শুভব্রত সাহা আত্মহত্যাই করেছেন?' সুভদ্র তীক্ষ্ণ গলায় বলল। 'কেন? সকলে তো তাই বলছে। পুলিশও শুনলাম তাই বলছে। এটা কি অন্য কিছু হতে পারে?' তমাল বিশ্বাসের গলাটা বিভ্রান্ত শোনাল।

"না, না। আত্মহত্যাই হবে। আপনি বলুন কী বলছিলেন। আদিত্য তমাল বিশ্বাসকে ভরসা দিল।

'যেটা বলতে চাইছিলাম সেই খবরটা শুনলে আপনারা আঁতকে উঠবেন। খবরটা হল, সাহা সাহেব মারা যাবার সপ্তাহ খানেক আগে রেখা দাসের বাড়িতে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। রেখা দাস বিষ খেয়েছিল। পুলিশ এটাকেও আত্মহত্যাই বলছে। আরও শুনলাম, রেখা দাস নাকি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সত্যিই ছিল কিনা জানি না, লোকে বলছে ছিল। এসব পাড়াগাঁয়ে অবশ্য লোকে নানা গুজব রটায়। তবে রেখা দাসের সঙ্গে যে শুভব্রত সাহার কোনও যোগ থাকতে পারে এটা কেউ জানে না। আমি জানি কারণ ব্যাপারটা আমি চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। জানাজানির যেটুকু সম্ভাবনা ছিল সেটাও খুব কৌশলে কম্পানি চেপে দিয়েছে। আমাদের এই ছোট্ট জায়গায় সেন বেকারির এখনও বেশ দাপট আছে। আসলে জিএম সাহেব ভয় পাচ্ছেন, পুলিশ যদি জানতে পারে শুভব্রত সাহার আত্মহত্যার কারণ রেখা দাসের আত্মহত্যা, তা হলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়বে। বিশ্বজিৎ দাসের মৃত্যুর আসল কারণটা জানাজানি হয়ে যাবে। ইনশিয়োরেন্স কম্পানিও তাদের টাকা ফেরত চেয়ে মামলা করতে পারে।' ঘরে স্তব্ধতা। আদিত্য এবং সুভদ্র দু'জনেই নিজেদের মতো করে নতুন খবরগুলো হজম করার চেষ্টা করছে। সুভদ্রই আগে কথা বলল।

"তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, শুভব্রত সাহা এবং রেখা দাসের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যার জেরে রেখা দাস প্রেগনেন্ট হয়ে যায় এবং হয়ত শুভব্রতকে বলে তাকে বিয়ে করতে হবে। শুভব্রত রাজি হয় না, কারণ তার বউ-মেয়ে আছে। তার ফলে রেখা দাস আত্মহত্যা করে। রেখা দাসের আত্মহত্যার খবর পেয়ে শুভব্রত সাহার মনে তীব্র অনুশোচনা হয় এবং সেই অনুশোচনার কারণে কিছুদিন বাদে সেও আত্মহত্যা করে। এটাই বলছেন তো আপনি?'

'হ্যাঁ, মোটামুটি এটাই বলছি।'

এবার আদিত্য মুখ খুলল।

'আচ্ছা, আপনি এত কথা আমাদের কেন বলছেন বলুন তো? এসব বলে আপনার কী লাভ? বরং ক্ষতির একটা সম্ভবনা আছে। যদি সত্যিই ওই আগুন লাগার ঘটনাটা নিয়ে কম্পানি কোনও বিপদে পড়ে তা হলে তো আপনারও ক্ষতি। কম্পানির যা অবস্থা তাতে হঠাৎ বড় কোনও বিপদ এলে কম্পানি উঠেও যেতে পারে। তা হলে তো আপনারও চাকরি চলে যাবে।'

'আপনি ভীষণ সঙ্গত একটা প্রশ্ন করেছেন। আমি খুব সৎভাবে আপনার প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছি। দেখুন যেটা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি সেটা পুলিশকে জানানোর একটা প্রবণতা সব নাগরিকেরই থাকে। আমারও আছে। তবে এখানকার পুলিশকে এসব জানিয়ে খুব একটা লাভ নেই। তাই আপনাদের পেয়ে আমার কথাগুলো বললাম। এটা একটা কারণ, কিন্তু আমার কথাগুলো বলার আসল কারণ এটা নয় । আসল কথাটা হল, আমি এই কম্পানিতে খুব অপমানে আছি। এবং অপমানের মূল কারণ আমাদের জিএম প্রণব মাইতি। কারণে অকারণে লোকটা আমাকে অপমান করে। কম্পানিতে হয়ত আরও অনেকে এরকম আছে। কিন্তু আমার মতো এতটা অপমান আর কাউকে সহ্য করতে হয় না যেহেতু তাদের সারাক্ষণ জিএম-এর সামনে থাকতে হয় না। আমি অন্য একটা চাকরি পেয়ে গেছি। এই কম্পানি ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু কম্পানি ছেড়ে চলে যাবার আগে আমি চাই ওই লোকটার যেন একটা শাস্তি হয়। অন্তত ওর খারাপ কাজগুলোর কথা যেন সবাই জানতে পারে। বলতে পারেন প্রতিশোধ।'

তমাল বিশ্বাস হাঁপাচ্ছে। মনে হয় তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সে পকেট থেকে একটা ইনহেলার বার করে দুটো পাফ নিল।

'আপনার কি অ্যাজমা আছে?' সুভদ্র ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল। তমাল বিশ্বাস কথা বলতে পারছে না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। আদিত্য ইশারায় সুভদ্রকে অপেক্ষা করতে বলছে।

একটু পরে তমাল বিশ্বাস নিজে থেকেই বলল, 'উত্তেজনা হলে অ্যাজমাটা বাড়ে। এখন অনেকটা ঠিক হয়ে গেছি।'

'আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। এখন উত্তর দিতে পারবেন?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'পারব, বলুন।'

'সেন বেকারির কৃষ্ণচন্দ্রপুরের কারখানাটায় এখন কী হয়?"

'কিছুই হয় না। ওটা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।'

'অন্য একটা প্রশ্ন। আপনাদের জিএম বলছেন, শুভব্রত কম্পানির টাকা চুরি করে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তাই লজ্জায়, অপমানে সুইসাইড করে। আপনার কি মনে হয় শুভব্রত সাহা অসৎ ছিল?'

'দেখুন, ওপর ওপর দেখে কাউকেই তো ঠিক বোঝা যায় না। তবু বলব, সাহা সাহেবকে আমার কোনও দিনই অসৎ মনে হয়নি। তাছাড়া উনি খুব সাধারণভাবে থাকতেন। আমি যতদূর জানি, একটা ফ্ল্যাটও কিনতে পারেননি। কলকাতায় ওর পরিবার কম্পানির দেওয়া ফ্ল্যাটে থাকত ।

'আচ্ছা, একটা কথা বলুন। আপনাদের জিএম সাহেব একদিকে বলছেন শুভব্রত সাহা চোর। আবার অন্যদিকে কম্পানি ওর স্ত্রীকে বিপুল অর্থ সাহায্য করবে বলেছে। শর্ত, ওর স্ত্রী পুলিশ বা সাংবাদিকদের কাছে যেতে পারবে না। এই দুটো কি কনট্রাডিকটরি হয়ে গেল না?'

তমাল বিশ্বাস ভাবছে। অনেকক্ষণ ধরে ভাবছে। শেষে বলল, "আমার সন্দেহটাই তা হলে ঠিক। কম্পানির পুরোনো দোষ ঢাকবার জন্যে শুভব্রত সাহাকে চোর সাজানো হচ্ছে। এই প্রণব মাইতি লোকটা যে কতটা নিচে নামতে পারে এটা তার আর একটা প্রমাণ ।'

বাইরে বৃষ্টির বেগ বেড়েই চলেছে।

তমাল বিশ্বাস চলে যাবার পরে আদিত্য তার নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিল। ঘরের আলো নিবিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। জানলা দিয়ে হঠাৎ বাইরে তাকালে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ধীরে ধীরে একটা-দুটো গাছের অবয়ব ফুটে উঠবে। তাদের ডালপালাগুলো দমকা হাওয়ায় উথাল-পাথাল করছে। বৃষ্টির বেগ কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে।

কেউ দরজায় খট খট করছে। দুপুরের সেই কালী বেয়ারা।

'আপনার ঘরে আলো নেই স্যার?'

'আছে তো। আলোটা আমি ইচ্ছে করেই নিবিয়ে রেখেছি। ওই তো ফ্যান চলছে।' 'আসলে গেস্ট হাউসের সামনে একটা ইলেকট্রিকের পোস্ট পড়ে গিয়ে এক দিকের আলোগুলো জ্বলছে না। দেখছেন না, গেস্ট হাউসের সামনের রাস্তাটা একেবারে অন্ধকার। আপনাদের ফ্লোরে তা হলে আলো আছে।'

কালী বেয়ারা চলে যাচ্ছিল। আদিত্য গলা তুলে বলল, "তোমাদের ছোট সাহেব কি এসে গেছেন?'

'এখনও আসেননি মনে হয়। এলে দেখতে পেতাম। এই রাস্তা দিয়েই তো সাহেবকে বাংলোতে যেতে হয়। যা বৃষ্টি। সাহেব হয়ত পথে কোথাও আটকে পড়েছেন।'

আদিত্য ঘড়ি দেখল। আটটা বাজে। 'এক কাপ চা পাওয়া যাবে?' "নিশ্চয় স্যার। আপনার সঙ্গে যিনি আছেন উনিও খাবেন তো?" 'মনে হয় খাবেন। জিজ্ঞেস করে নাও না। উনি ওঁর ঘরে আছেন।' কালী বেয়ারা চা দিয়ে যাবার পর আদিত্য আরও কিছুক্ষণ অন্ধকারে বসে রইল। বাইরে বৃষ্টি আর হাওয়ার তাণ্ডব চলছে। বড় বড় গাছগুলো হাওয়ার দাপটে মাটিতে শুয়ে পড়তে পড়তে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। বলা শক্ত তারা কতক্ষণ হাওয়ার এই প্রবল দাপট সইতে পারবে। এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই চারটে ট্রাক কারখানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আদিত্যর জানলা থেকে খুব ভাল দেখা যাচ্ছে না, তবে মনে হচ্ছে ট্রাকে রুটি উঠছে। আদিত্য আন্দাজ করল, পাঁউরুটি এসেনশিয়াল গুড। কাল সকালের মধ্যে বিভিন্ন রিটেল আউটলেটে পৌঁছে দিতেই হবে। তাই ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে পাঁউরুটি ট্রাকে উঠছে। তবে আদিত্যর মনে পড়ে, ছোটবেলায় খুব ঝড়-বৃষ্টির দিনে বাড়িতে ফ্রেশ পাঁউরুটি আসত না। নুরুল বাবুর্চির মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। এখন নিশ্চয় দিনকাল বদলেছে।

ন'টা নাগাদ আদিত্যর ফোনটা বেজে উঠল। পল্লব সেন।

'এন এইচ থার্টিফোর-এ গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। মানে এখন যেটার নাম হয়েছে এন এইচ টুএলভ।' পল্লব সেনের গলাটা বিপন্ন শোনাচ্ছে।

"সে কী! কী করে হল?' আদিত্যর উৎকণ্ঠাটা বানানো নয়।

'নামেই ন্যাশানাল হাইওয়ে। রাস্তার জায়গায় জায়গায় একেবারে পুকুরের মতো গর্ত। তার ওপর এই জঘন্য ওয়েদার। একটা বিশাল গর্তে পড়ে গাড়ির অ্যাক্সেল ভেঙে গেছে।'

'আপনি এখন ঠিক কোথায় রয়েছেন? '

'কৃষ্ণনগর থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। এটা আন্দাজে বলছি। বেশিও হতে পারে। দু'দিকে জমাট অন্ধকার। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। অনেক দূরে একটা দুটো আলো দেখতে পাচ্ছি। হয়ত ওখানে কোনও লোকালয় আছে। আমাদের ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজারকে ফোন করেছি। ও একটা গাড়ি পাঠাবার চেষ্টা করছে। মুস্কিল হচ্ছে এত রাত্তিরে ড্রাইভাররা সবাই বাড়ি চলে গেছে। ওরা কোনও ড্রাইভারকে বাড়ি থেকে ধরে আনতে চেষ্টা করছে। এদিকে আমার গাড়ির ড্রাইভার ছাতা নিয়ে ওই দূরে আলোর দিকে হাঁটা দিয়েছে। যদি একটা মেকানিক পাওয়া যায়। সম্ভাবনা অবশ্য খুবই ক্ষীণ। আমি গাড়ির কাঁচ তুলে ভেতরে বসে আছি।'

"ও আচ্ছা। এবারে বুঝলাম আপনার দিক থেকে ঝড়-বৃষ্টির কোনও শব্দ কেন পাওয়া যাচ্ছে না।'

'শুনুন, আমি বেশিক্ষণ কথা বলব না। মোবাইলে খুব বেশি চার্জ নেই। আমি বলছি, আমার তো কৃষ্ণনগর পৌঁছনোর কোনও ঠিক নেই। আপনারা ডিনার করে শুয়ে পড়ুন। হোপফুলি কাল সকালে দেখা হবে। তবে এই ওয়েদার চলতে থাকলে পাখি দেখতে যাবার প্ল্যানটা ভেস্তে যাবে মনে হচ্ছে।'

'আরে না, না। পাখি দেখা নিয়ে ভাববেন না। আপনার এখানে তাড়াতাড়ি চলে আসাটাই এখন প্রায়োরিটি।'

আদিত্য মোবাইল রেখে উঠে দাঁড়াল। আলো জ্বালল। বাইরে বৃষ্টি কমার কোনও লক্ষণ নেই। সুভদ্রর ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিল। তারা দু'জন যখন প্রায় নীরবে ডিনার সারছে তখনও সমানে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছিল। ডিনার শেষ করে সুভদ্র নিজের ঘরের সামনে পৌঁছে চাবি ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'গুড নাইট আদিত্যদা। কাল সকালে দেখা হবে।'

'ঘরের ভেতরে চল, কথা আছে।' আদিত্য চাপা গলায় বলল।

সুভদ্র কিছুটা অবাক হয়েছে। 'কী ব্যাপার? কিছু হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। তবে আমার মন বলছে আজ রাত্তিরে কিছু একটা হবে। কী হবে খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু আন্দাজটা ভুল হতে পারে তাই এক্ষুনি কিছু বলব না।'

আদিত্য ঘরে ঢুকে ধীরে সুস্থে একটা চেয়ারে বসল। সুভদ্র খাটের ওপর বসে আদিত্যর পরবর্তী কথাগুলো শোনার জন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'একটা কাজ করতে হবে। এই বৃষ্টির মধ্যে কাজটা সহজ হবে না।' 'কী কাজ?'

'গেস্ট হাউসের বিছানার আরাম থেকে বেরিয়ে এই ঝড়বৃষ্টির রাত্তিরে আমাদের এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে থাকতে হবে যেখান থেকে ফ্যাক্টরি, গোডাউন এবং গেস্ট হাউসটা দেখা যায়। আমার ধারণা আজ রাত্তিরে এই জায়গাগুলোর কোনও একটাতে কিছু একটা ঘটবে।'

না ।

'এখন আমাদের বেরোতে হবে?' সুভদ্র নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে

'শুধু বেরতে হবে তাই নয়, সারারাত বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নজর রাখতে হবে এই কারখানায় কোথায় কী ঘটছে। তাছাড়া গেস্ট হাউস থেকে বেরোনোর সময় লুকিয়ে বেরোতে হবে, যাতে আমাদের কেউ দেখে না ফ্যালে।'

'কখন বেরোব?'

'আর ধর ঘন্টা খানেক ঘন্টা দেড়েক পরে। গেস্ট হাউসের চৌকিদারটা তার ঘরে ঢুকে গেলে। আসার সময় উঁকি মেরে দেখলাম এখনও লোকটা টুল পেতে মেন গেটের সামনে বসে আছে। আশা করি সারা রাত্তির বসে থাকবে না।

আদিত্যর আশা পূর্ণ হল না। বারোটা বাজতে যখন আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, তখনও উঁকি মেরে দেখা গেল গেস্ট হাউসের সদর দরজার সামনে লোকটা গ্যাঁট হয়ে বসে আছে।

'মনে হচ্ছে আমাদের ওপর নজরদারি করার জন্যই ওকে ওখানে বসানো হয়েছে।' আদিত্য ফিসফিস করে বলল। 'আমাদের অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। তার আগে আমাদের বিছানা দুটো পাশবালিশ দিয়ে সাজিয়ে রাখা যাক। যাতে দূর থেকে দেখলে মনে হয় আমরা ঘুমোচ্ছি।'

দোতলার বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা গরাদহীন জানলা। পাশ দিয়ে একটা ড্রেনপাইপ নেমে গেছে।

'এই এসকেপ রুটটা আমি আগেই দেখে রেখেছিলাম। বৃষ্টির জলে পাইপটা একটু স্লিপারি হয়ে আছে। এখান থেকে বেরোনোটা একটু অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, উই ক্যান ম্যানেজ।'

জানলা দিয়ে বেরোনোর আগে আদিত্য পল্লব সেন-এর নম্বরটা ডায়াল করল। মোবাইল সুইচড অফ। সম্ভবত চার্জ কম আছে বলে মোবাইলটা পল্লব সেন বন্ধ রেখেছেন।

আদিত্য আগে নামতে শুরু করল, একেবারে শেষ দিকে এসে অত্যন্ত আনাড়িভাবে হাত স্লিপ করে চিৎ হয়ে মাটিতে এসে পড়ল। ভাগ্যক্রমে ততক্ষণে সে মাটিতে প্রায় নেমেই এসেছিল। তাই শরীরে তেমন চোট লাগেনি। শুধু শ্যাওলা আর ড্রেনপাইপের গায়ে জমে থাকা ময়লায় শার্টের সামনেটা একেবারে নোংরা হয়ে গেছে। মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ার ফলে শার্টের পেছন দিকটাও। সুভদ্র কিন্তু অনেক স্মার্টভাবে নামল। জামা-প্যান্টে দাগটুকু লাগল না। পকেট থেকে রুমাল বার করে নোংরা হাত দুটো মুছে নিল শুধু। বোঝাই যায় সে আদিত্যর থেকে অনেক বেশি ফিট। আদিত্য ভাবছিল, কেয়া থাকলে তাকে কিছুতেই এইভাবে নামতে দিত না। বিশেষ করে বুকে স্টেন্ট

বসার পর।

‘একটু ঘুরে যেতে হবে। চৌকিদারটা গেস্ট হাউসের সামনের দিকটায় নজর রাখছে।' আদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে কিঞ্চিৎ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল দিয়ে তারা দু'জন কারখানার ঠিক উল্টোদিকে একটা পরিত্যক্ত শেড-এর সামনে এসে দাঁড়াল। এক সময় হয়ত এই জায়গাটাও কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হত, এখন দেখে মনে হয় বহুদিন অব্যবহৃত পড়ে আছে। জায়গাটায় সাপখোপের ভয় থাকাটাই স্বাভাবিক, বিশেষ করে এই ঘোর বৃষ্টিতে যখন সাপেদের গর্তগুলোয় জল ঢুকে গেছে। পুরো অঞ্চলটা এমনিতে কুপকুপে অন্ধকার । আদিত্যদের দুজনের দুটো মোবাইলের টর্চ-এর সাহায্যে একটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গা পাওয়া গেল, যার মাথার ওপর একটা শেড আছে। ওরা ঠিক করল ওখানেই অপেক্ষা করবে কারণ ওখানে দাঁড়ালে ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে কারখানা, গেস্ট হাউস এবং পল্লব সেনের বাংলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অথচ অন্ধকার এবং ঝোপের আড়াল রয়েছে বলে আদিত্যদের কেউ চট করে দেখতে পাবে না। তাছাড়া মাথার ওপর ছাউনিটাও দরকার কারণ বৃষ্টি এখনও সমানে হয়ে যাচ্ছে। অসুবিধের দিক হল, এখানে বসবার কোনও জায়গা নেই আর জায়গাটায় সাপ-খোপের ভয় ছাড়াও প্রচণ্ড মশার উৎপাত ।

রাত্তির বারোটা পঞ্চাশ অব্দি মশা তাড়িয়ে কেটে গেল। আদিত্য বা সুভদ্র দু'জনেই মোবাইল সাইলেন্ট মোডে রেখেছে এবং কেউই মোবাইল খুলতে পারছে না, পাছে মোবাইলের আলো কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাত্তির একটা নাগাদ বৃষ্টি থেমে গেল। গাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে জল ঝরছে। একটা বিদ্যুতের খুঁটি হাওয়ার আঘাতে উপড়ে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে মাটি ছুঁয়ে আছে। তার সঙ্গে সংলগ্ন বিদ্যুতের তারটাও মাঝে মাঝে মাটি ছুঁয়ে ফেলছে। তারটা যখনই মাটি ছুঁচ্ছে, তার থেকে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বেরোচ্ছে।

সুভদ্র উসখুস করছে। আদিত্য চিন্তামগ্ন। ‘ভাবছি, পল্লব সেন এখনও কেন এসে পৌঁছতে পারলেন না।' আদিত্য চিন্তিত গলায় বলল।

উত্তরে সুভদ্র কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার কথা শুরু হবার আগেই একটা গাড়ি, মাঝারি সাইজের একটা সিডান, কারখানার সামনে এসে থেমেছে। এত দূর থেকে তার রঙটা সাদাই মনে হচ্ছে। তবে রঙটা গ্রে, অফ হোয়াইট বা খুব হালকা নীলও হতে পারে। গাড়িটা কারখানার সামনে থেমেই রয়েছে। কিন্তু গাড়ি থেকে কেউ এখনও বেরোয়নি।

হঠাৎ জেনারেল ম্যানেজার প্রণব মাইতি কারখানার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে দু'জন সিকিউরিটি, প্রত্যেকের হাতে একটা করে সুটকেস। মনে হয় সুটকেসগুলোর ওজন আছে, কারণ সুটকেসের ভারে দু'জন সিকিউরিটিই ঈষৎ নুয়ে পড়েছে। গাড়ির ড্রাইভারের সিট থেকে একজন নেমে ডিকি খুলে দিল। সুটকেস দুটো গাড়ির ডিকিতে রাখা হল। ডিকি বন্ধ হল। প্রণব মাইতি পুরো ব্যাপারটা দেখভাল করছে। সে গাড়ির ড্রাইভারকে কিছু একটা বলল। ড্রাইভার গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিল। গেট খোলার শব্দ। গাড়িটা ধীরে

ধীরে কারখানার চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাইতি তার লোকজন নিয়ে আবার কারখানার ভেতর ঢুকে গেল। আদিত্য মোবাইল বার করে খুব দ্রুত কাউকে মেসেজ করছে।

আবার দীর্ঘ স্তব্ধতা। শুধু গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ার শব্দ। দূরে শেয়াল ডাকছে। আদিত্যদের সামনে ঘাসের ওপর দিয়ে সড়সড় করে কিছু একটা চলে গেল। সাপ? নাকি মেঠো ইঁদুর? রাত্তির পৌনে দুটো নাগাদ গেট খোলার শব্দ। একটা কালো এসইউভি ধীরে ধীরে এসে গেস্ট হাউস পেরিয়ে পল্লব সেনের বাংলোর সামনে থামল। ড্রাইভার তার আসন থেকে নেমে পিছনের সিটের দরজা খুলে দিতে যিনি টলতে টলতে নেমে বাংলোর মধ্যে ঢুকে গেলেন তিনি পল্লব সেন ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

'যাক, ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরলেন।' সুভদ্র না বলে পারল না। মিনিট পনের পরে কালি বেয়ারা খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে গেস্ট হাউস থেকে বাংলোয় ঢুকল।

'পল্লব সেনের ডিনার। অতক্ষণ মাঠের মধ্যে বসে থেকে ভদ্রলোকের নিশ্চয় খুব খিদে পেয়ে গেছে।' বলতে বলতে আদিত্য লক্ষ করল জিএম প্রণব মাইতি সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে আসছেন। সাঙ্গোপাঙ্গরা গেটে ডিউটি করতে চলে গেল। জিএম সাহেব নিজের বাংলোর দিকে পা বাড়ালেন।

আরও একটু পরে কালী বেয়ারা খালি বাসনপত্র নিয়ে গেস্ট হাউসে ফিরে গেল। সুভদ্র বলল, 'আমরা আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাব, আদিত্যদা?"

আদিত্য বলল, 'আর একটু দেখি। মন বলছে, আরও কিছু ঘটবে।'

উত্তরে সুভদ্র একটা লম্বা হাই তুলল। মশার উৎপাত না থাকলে সে বোধহয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়ত। অন্তত পরের এক ঘন্টা আদিত্যর ভবিষ্যৎবাণী মেলার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। ঘটনা বলতে মাঝে মিনিট পনের বৃষ্টি হয়েছিল, এখন তাও সম্পূর্ণ থেমে গেছে। ঝিঁঝি ডাকছে। রাত জাগা একটা পেঁচাও কোথাও একটা ডেকে উঠল। বাংলোতে যে দু'একটা আলো জ্বলছিল, সেগুলোও অনেকক্ষণ হল নিবে গেছে। শুধু উপড়ে যাওয়া বিদ্যুতের খুঁটিটার সংলগ্ন তার থেকে এখনও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঠিকরোচ্ছে।

সুভদ্র বলল, 'আর পারছি না, আদিত্যদা। আমি এবার ঘুমোতে যাচ্ছি। গেস্ট হাউসের সদর দরজা দিয়েই ঢুকব তো?'

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। ওদিকে তাকাও। দ্যাখো কী হচ্ছে।' আদিত্য কারখানার দিকে সুভদ্রর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

তিনটে লোক কারখানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের হাতে কিছু একটা রয়েছে। কী রয়েছে এত দূর থেকে আন্দাজ করা শক্ত। দু'জন কারখানার মধ্যে ঢুকে গেল। তৃতীয়জন গেস্ট হাউসের দিকে হাঁটা লাগিয়েছে। গেস্ট হাউসের চৌকিদারকে কী একটা বলে এই তৃতীয় লোকটা গেস্ট হাউসের ভেতরে ঢুকে গেল। আদিত্য আর সুভদ্র একাগ্রভাবে দেখছে।

মিনিট পাঁচেক পরে ফ্যাক্টরির ভেতর থেকে একটা হলুদ আলোর আভা দেখা গেল। তার কয়েক মিনিট পরে গেস্ট হাউসের দোতলা থেকেও।

'কারখানায় আগুন লেগেছে আদিত্যদা।' সুভদ্র চাপা গলায় বলল।

'আগুন নিজের থেকে লাগেনি, লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।' আদিত্য কথাগুলো বলে নিজের মোবাইলে একটা নম্বর ডায়াল করল। উল্টোদিক থেকে সাড়া পাবার পর, আদিত্য বলল, 'মাই অ্যাপ্রিহেনশন ইজ কারেক্ট। ফ্যাক্টরি ইজ অন ফায়ার। আ কেস 'অফ আরসন আই থিঙ্ক।' আদিত্য ফোনটা কেটে দিয়ে মোবাইলটা পকেটে পুরে রাখল ।

সুভদ্র কিছুটা হতভম্ভ। বলল, 'আমরা এখন কী করব আদিত্যদা ?'

'কিচ্ছু করব না। এখানেই অপেক্ষা করব। নদীয়ার এস পিকে আগুনের কথাটা জানিয়ে দিলাম। এক্ষুনি পুলিশ এবং দমকল এসে যাবে। ওরা এসে যা করার করবে।'

আগুনের লেলিহান শিখা গেস্ট হাউসের দোতলাটাকে গ্রাস করে ফেলেছে। কালী বেয়ারা আর চৌকিদার বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

'কেন গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলাম বুঝতে পেরেছ?' 'বুঝেছি আদিত্যদা। আপনার জন্যে আজকে প্রাণটা বাঁচল।'

কালী বেয়ারা পল্লব সেনের বাংলোতে ঢুকে গেল। বোধহয় মালিককে খবর দিতে যাচ্ছে। দু'জন সিকিউরিটিকে সঙ্গে নিয়ে জিএম প্রণব মাইতি ছুটতে ছুটতে কারখানার দিকে আসছে। তারা কারখানার কাছাকাছি পৌঁছনোর আগেই সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। দমকল এসে পড়েছে। দুটো দমকলের এঞ্জিন কারখানার চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পেছনে পুলিশ ভান। সব শেষে এস পি সাহেবের গাড়ি।

আদিত্য বলল, "চল এস পি সাহেবকে রিপোর্ট করে আসি।'

দমকল বাহিনী কাজে নেমে পড়েছে। পল্লব সেন, প্রণব মাইতির সঙ্গে কারখানার আরও অনেক কর্মচারি কারখানার বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরা সকলেই মনে হয় কারখানার কাছাকাছি থাকে। ভিড়ের মধ্যে তমাল বিশ্বাসের মুখটাও কয়েকবার আদিত্যর চোখে পড়ল। কারখানার চারদিকে পুলিশের ঘেরাটোপ, কাউকেই কারখানার খুব কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না ।

'আপনারা গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন দেখে খুব স্বস্তি পেলাম। কী কান্ড বলুন তো? আপনাদের নেমন্তন্ন করে ডেকে আনার পর একটা অঘটন ঘটে গেলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না।' পল্লব সেনের গলাটা আন্তরিকই শোনাল।

'কী করে আগুন লাগল কিছু বোঝা গেছে স্যার?" একটি কর্মচারি জিজ্ঞেস করল। 'এখনও ভাল করে বোঝা যায়নি। তবে কেউ কেউ বলছে শর্ট সার্কিট। একটা ইলেকট্রিকের পোস্ট ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল, সেখান থেকেই মনে হচ্ছে আগুনটা লেগেছে।

প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় কারখানার আগুন খানিকটা আয়ত্তে এল। কারখানাটা খানিকটা বাঁচানো গেলেও, গেস্ট হাউসের দুটো তলা একেবারে পুড়ে গেছে। অনেকগুলো গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ছিল ওখানে। সেগুলো সশব্দে ফেটে গিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছিল। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই, এটুকুই সান্ত্বনা।

কাজ শেষ করে দমকলের ইঞ্জিন দু'টো ফিরে গেল। পুলিশ বাহিনী এখনও কারখানা এবং গেস্ট হাউস ঘিরে রেখেছে। এস পি দীপক কুমার এগিয়ে এসেছেন। তার সঙ্গে পল্লব সেন এবং প্রণব মাইতি।

'আপনারা দয়া করে বাড়ি ফিরে যান। পুলিশকে কাজ করতে দিন।' এস পি সাহেব জনতার উদ্দেশে বললেন। তিনি বেশ ভালই বাংলা বলেন। কিন্তু কেউ তার কথা শুনে নড়ল বলে মনে হল না।

'আপনারা দয়া করে চলে যান। এখানে অকারণে ভীড় বাড়াবেন না। পুলিশকে কাজ করতে দিন।' এস পি সাহেব গলা তুলে আবার বললেন। তারপর গলা নামিয়ে পল্লব সেন এবং প্রণব মাইতিকে বললেন, 'আপনারা দু'জন থাকুন। আপনাদের সঙ্গে কথা কাছে।

দু'একজন যাবার উদ্যোগ করলেও বেশিরভাগ এখনও অনড়।

'এদের হটাও এখান থেকে।' এস পি সাহেব হুকুম দিলেন।

কয়েকজন কনস্টেবল লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যেতেই কৌতূহলী জনতা ছত্রভঙ্গ। এস পি সাহেব পল্লব সেন এবং প্রণব মাইতির দিকে তাকিয়ে বললেন,"আপনাদের বিরুদ্ধে আরসেন-এর কমপ্লেন আছে। আপনারাই আপনাদের কারখানায় আগুন লাগিয়েছেন।'

'আমরা কেন আমাদের কারখানায় আগুন লাগাব?' জিএম প্রণব মাইতি যেন আকাশ থেকে পড়েছেন। পল্লব সেন হতভম্ভ, বাকরুদ্ধ।

‘ইনশিয়োরেন্স ক্লেম করার জন্য আগুন লাগিয়েছেন। আপনাদের কারখানা তো খুব একটা চলে না। ইনশিয়োরেন্সের টাকা পাওয়া গেলে তো লাভ। এই রকম আগুন কিছুদিন আগে আপনাদের আরেকটা কারখানায় লেগেছিল না?

‘আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' পল্লব সেন এতক্ষণে কথা বলতে পেরেছেন। ‘আমার সঙ্গে চলুন, সব বুঝিয়ে দেব। আর আদিত্যসাব আপনারা দু'জনেও চলুন। আপনারা তো আই উইটনেস।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(১)

কেয়া আদিত্যর ওপর রাগ করেছে। প্রায় দু'দিন হতে চলল কথা বলছে না। মহা বিপদে পড়েছে আদিত্য। কী করবে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। একবার বসার ঘরে এসে বসে, একবার শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। আবার একবার রান্নাঘরে গিয়ে দ্যাখে কেয়া কী করছে। আদিত্য যে রান্নাঘরে ঢুকেছে কেয়া যেন খেয়ালই করেনি। আদিত্যকে উপেক্ষা করে একমনে নিজের কাজ করে যায়। ইচ্ছে করে গুনগুন করে গান করে। যেন ঘরে আর কেউ নেই। যেন দেখাতে চায় আদিত্যকে বাদ দিয়ে সে খুব ভাল আছে। মাঝে মাঝে কেয়ার ওপর ভীষণ রাগ হয়ে যায় আদিত্যর। এটা ঠিক যে সে একটা গন্ডগোল করে ফেলেছে। কিন্তু তাই নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা কী উচিত? আসলে দোষটা ঠিক তারও তো নয়। এটা তো তার পেশা। পেশার জন্য এটুকু তো করতেই হবে। দোষটা সুভদ্রর।

ঘটনার সূত্রপাত কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে আসার পর। ফেরার পরের দিন বোকা সুভদ্রটা আদিত্যদের বাড়িতে এল। এসে ফলাও করে গল্প করল আদিত্যদা কী অসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তাকে এবং নিজেকে রক্ষা করেছে। কীভাবে সে আর আদিত্যদা ড্রেন পাইপ বেয়ে নামল। আদিত্যদা কেমন ধপাস করে পড়ে গেল। তারপর সাপখোপের ভয় না করে সে আর আদিত্যদা কেমন সারা রাত্তির কারখানার ওপর নজর রাখল। তারপর হঠাৎ কেমন করে কারখানা আর গেস্ট হাউসটা জ্বলতে লাগল।

সুভদ্রর উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। আদিত্যর কত বুদ্ধি এটা বোঝানোর জন্যেই সুভদ্র কেয়াকে গল্পটা বলছিল। কিন্তু আদিত্য টের পাচ্ছিল গল্প যত এগোচ্ছে কেয়ার মুখ তত গম্ভীর হচ্ছে। সুভদ্রকে বলে দেওয়া উচিত ছিল কৃষ্ণনগরে কী ঘটেছে কেয়াকে যেন না বলে।

গল্প শেষ হবার পর আদিত্যর দিকে তাকিয়ে কেয়া থমথমে মুখে বলল, "এসব বাহাদুরি দেখানোর সময় একবারও মনে পড়ল না মাত্র কিছুদিন আগে তোমার স্টেন্ট বসেছে?'

কেয়ার মুড দেখে সুভদ্র বুঝতে পারল সে একটা বিরাট ফোফা করে ফেলেছে। দু'একটা কথা বলার পর সে মানে মানে কেটে পড়ল। সুভদ্র চলে যাবার পর কেয়া একটাই কথা বলেছিল।

'আমার কথাটা একবারও তোমার মনে পড়ল না? মনে হল না, তোমার কিছু হয়ে গেলে আমি কোথায় যাব?"

সেই শেষ কথা। তারপর দু'দিন হয়ে গেল আদিত্যর সঙ্গে কেয়া আর কোনও কথাই বলছে না।

মৃত্তিকা মিত্রর কেসটা ছাড়া আদিত্যর হাতে এখন আর কোনও কাজ নেই। মৃত্তিকা মিত্রর কেসটার ব্যাপারে আদিত্যর একটা ইনফর্মেশন দরকার ছিল। সেটার জন্যে তার উকিল বন্ধু সুনন্দ সরকারকে ফোনও করেছিল। কিন্তু সুনন্দর ফোনটা সুইচড অফ হয়ে আছে। তার মানে সম্ভবত সুনন্দ দেশে নেই। আদিত্য জানে মাঝে মাঝে এরকম হয়। পরিবার নিয়ে সুনন্দ বিদেশে বেড়াতে যায়। এখনও হয়ত বিদেশে বেড়াচ্ছে। সুনন্দ ফিরে আসা অব্দি অপেক্ষা করতে হবে।

বাকি কাজ বসে বসে চিন্তা করা। সেটা আপিসে বসে করা যায়, আবার বাড়িতে বসেও করা যায়। আপিসে কতক্ষণ আর থাকবে? সেই বাড়িতেই ফিরে আসতে হবে। বাড়ি ফিরে সারাক্ষণ তো আর মৃত্তিকা মিত্রর কেসটা নিয়ে ভাবা যায় না। কেয়ার রাগটা যদি একটু পড়ত তাহলে কেয়ার সঙ্গে গল্প করে করে সময়টা বেশ কেটে যেত। কেয়া কথা বলছে না দেখে দ্বিতীয় দিনের শেষ থেকে আদিত্য ওয়ার অ্যান্ড পিস পড়তে শুরু

করেছে। সেই কলেজে পড়ার সময় পড়েছিল। আর একবার পড়ার ইচ্ছে ছিল। একশ-দেড়শ পাতা পড়ার পর, বইটা ছাড়া যাচ্ছে না, এত টানটান। কেয়ার সঙ্গে ঝগড়ার কথাও প্রায় ভুলে গেছে। চারটে দিন কেটে গেল, তবু শান্তি এল না জেনারেল কুটুসভ এবং নেপোলিয়নের মধ্যেও নয়, আদিত্য আর কেয়ার মধ্যেও নয়। আদিত্য বইএর মধ্যে ডুবে আছে। ভাবছে, আর ক'টা দিন ঝগড়া চললে বইটা পড়া হয়ে যাবে।

পঞ্চম দিন সকালে বই রেখে আদিত্য আবার সুনন্দ সরকারের নম্বরটা ডায়াল করল। রোজ সকালেই নিয়ম করে একবার করে, রোজই নম্বরটা সুইচড অফ পায়। আজ, কী সৌভাগ্য, নম্বরটা বাজছে!

'কী রে, সাত সকালে ফোন? ব্যাপার কী?' সুনন্দর গলাটা খুশি-খুশি শোনাল। 'কবে থেকে তোকে ধরার চেষ্টা করছি। তুই কলকাতায় ছিলি না?' আদিত্য খানিক বিষণ্ণ গলায় বলল ।

'পাগল নাকি? সারা বছর কেউ কলকাতায় থাকে? আমি তো সুযোগ পেলেই পালাই।'

'কোথায় গিয়েছিলি?'

'এবার গিন্নিকে নিয়ে স্লোভেনিয়া গিয়েছিলাম। ওদের রাজধানী লুবলিয়ানায় আমার ভাগ্নেটা থাকে। বিলেত থেকে ইকনমিক্সে পিএইচডি করে বছর খানেক হল ব্যাঙ্ক অফ স্লোভেনিয়ায় চাকরি করছে। ব্যাঙ্ক অফ স্লোভেনিয়া ওদের সেনট্রাল ব্যাঙ্ক, মানে আমাদের যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। যাই হোক, প্রথমে ভাগ্নের কাছে ক'টা দিন কাটালাম। ছবির মত শহর লুবলিয়ানা। ভাগ্নের রান্নাঘর থেকে আল্পস দেখা যায়। ওখান থেকে ক্রোয়েশিয়া গেলাম। ফিরে এসে সাত দিন ইটালি ঘুরলাম, ত্রিয়েস্তে, রোম, ফ্লরেন্স, ভেনিস। আমার আগে একবার দেখা। গিন্নির এই প্রথম। কাল রাত্তিরে ফিরেছি। তা আমাকে ধরার চেষ্টা করছিলি কেন ?

'হ্যাঁ, বলছি। তোর কি মনে আছে বছর ছয়েক আগে হাইকোর্টে একটা মামলা উঠেছিল কার্ডিওলজিস্ট অসীমাভ রায়ের এগেন্সটে। মামলা করেছিল বনানী দাস বলে এক মহিলা। তার বক্তব্য ছিল ডাঃ রায় তার স্বামীকে টাকার লোভে অপরেশনের পরামর্শ দিয়ে মেরে ফেলেছেন। আসলে অপরেশনের কোনও দরকার ছিল না। মামলাটা ছিল ডাঃ অসীমাভ রায় এবং ডাঃ সমীরণ সান্যালের বিরুদ্ধে। ডাঃ সমীরণ সান্যাল অপরেশনটা করেছিলেন। সেই সময় কেসটা নিয়ে বেশ হইচই হয়েছিল। তোর মনে আছে?'

'খুব ভালই মনে আছে। এমনিতেই হয়ত মনে থাকত, কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখার একটা বিশেষ কারণ ছিল। আসলে ডাঃ সমীরণ সান্যাল ওপেন হার্ট সার্জারি করে আমার বাবাকে প্রায় দশ-পনের বছর বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। অসাধারণ ডাক্তার। তাঁর এগেন্সটে কেস, মনে তো থাকবেই। আমি ডাঃ সান্যালের হয়ে দাঁড়াতে রাজি ছিলাম। কিন্তু ওদের হয়ে লোয়ার কোর্ট থেকেই অরুণকান্তি ব্যানার্জী তাঁর টিম নিয়ে লড়ছিলেন। অরুণকান্তি ব্যানার্জীর ওপর তো আর কোনও কথা চলে না। তাই আমি আর দাঁড়ালাম না। তবে কেসটা খুব ক্লোজলি ফলো করতাম।'

'উল্টোদিকে কে দাঁড়িয়েছিল?'

'উল্টোদিকে বাচ্চু সেন, মানে অরূপ সেন দাঁড়িয়েছিল। বাচ্চুদাও বিরাট লইয়ার। আমার দাদার মতো। সেই বিলেত থেকে চেনা। তবে বাচ্চুদার কিচ্ছু করার ছিল না। কেসটার কোনও মেরিটই ছিল না, বাচ্চুদা কী করবে?"

'তুই আমার একটা উপকার করে দিবি? বাচ্চু সেনের সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিবি? বেশি সময় নেব না, বড় জোর দশ মিনিট। একটু কথা বলিয়ে দিতে পারবি?' আদিত্য কাতর গলায় বলল।

'ঠিক আছে। তোর কত তাড়াতাড়ি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দরকার?' 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আজ হলে আজ।'

'ওক্কে। তুই তাহলে আজ দুটো নাগাদ হাইকোর্ট পাড়ায় চলে আয়। আমার চেম্বারটা তো তুই চিনিস। ওখানে চলে এলে আমি তোকে বাচ্চুদার কাছে নিয়ে যাব। বাচ্চুদার চেম্বার আমার চেম্বার থেকে দু'মিনিট।'

'আমি ওই মহিলাকে বলেছিলাম ওর কেসটা দাঁড় করানো অসম্ভব। এমন দু'জন অত্যন্ত রেপিউটেড মেডিকাল প্র্যাকটিশনারের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে যাদের ট্র্যাক রেকর্ড ইমপিকেবল। তাছাড়া সমস্ত মেডিকাল

রিপোর্ট বলছে আপনার হাসবেন্ড-এর ক্ষেত্রে ওপেন হার্ট সার্জারিটাই একমাত্র অপশন ছিল, যদিও তাতে রিস্ক কিছু কম ছিল না। সব থেকে বড় কথা, আপনি নিজে রিস্ক আছে জেনেও কনসেন্ট ফর্মে সই করেছিলেন। আমি কী করে আপনার কেসটা দাঁড় করাব? ভদ্রমহিলা নাছোড়।'

বাচ্চু সেনের বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে। তোবড়ানো গাল, টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক, কালো ফ্রেমের চশমার আড়ালে একজোড়া অন্তর্ভেদী চোখ। গায়ের রঙ সাহেবদের মতো ফরসা। দেখে মনে হয়, বাচ্চু সেনের শরীরে বিদেশী রক্ত আছে। পরে, বাচ্চু সেনের চেম্বার থেকে বেরিয়ে, সুনন্দকে জিজ্ঞেস করে আদিত্য জানতে পারল বাচ্চু সেনের ঠাকুমা আইরিশ।

'শেষ পর্যন্ত কেসটা আমাকে নিতেই হল। সবাই বলাবলি করতে লাগল আমি খুব লোভী হয়ে গেছি। টাকার জন্যে যে কোনও কেস নিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন টাকার জন্যে কেসটা আমি নিইনি। ভগবানের দয়ায় আমার টাকার কোনও অভাব নেই। কাজেরও অভাব নেই। ওই কেসটা না নিয়ে আমি অনায়াসে অন্য কোনও কেস নিতে পারতাম। তাতে একই টাকা রোজগার হত। আসলে আমি ভদ্রমহিলার হাত থেকে বাঁচার জন্যে কেসটা নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা দিনের পর দিন আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অনেক রাত্তির হয়ে যেত, তাও নড়তেন না। শি ওয়াজ সাচ আ নুইসেন্স। শেষে আমার স্ত্রী বললেন, কেসটা নিয়েই নাও।'

'আর তুমি বৌদির কথা শুনে নিয়ে নিলে।' সুনন্দ মুচকি হাসল। 'সবাই বলত তুমি নাকি বিধবা মেয়েটার সঙ্গে লাইন মারছ।'

'আমার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই ওইরকম অখাদ্য, আন-সফিসটিকেটেড, হাফ-এডুকেটেড, ছিঁচকাঁদুনে একটা মেয়ের সঙ্গে লাইন মারব। ওর সঙ্গে তো কথাই বলা যেত না। দু'একটা কথা বলতে বলতে স্বামীর নাম করে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলত। ডিসগাস্টিং।'

'তারপর কী হল?" আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'যা হবার তাই হল। অরুণকান্তি ব্যানার্জীর জেরার সামনে মেয়েটা দাঁড়াতেই পারল না। সব থেকে বড় কথা, সমস্ত মেডিকাল রিপোর্ট আমাদের এগেন্সটে ছিল। আদালত তো ইমোশান দিয়ে চলে না, এভিডেন্স দিয়ে চলে। সমস্ত এভিডেন্স আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। ফলে আমরা গোহারান হেরে গেলাম।'

'এটা সিঙ্গল বেঞ্চে তো?' সুনন্দ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ সিঙ্গল বেঞ্চ। হেরে গিয়ে মেয়েটার অ্যাটিটিউড পুরো বদলে গেল। আগে কাকুতি-মিনতি করত। এবার রেগে আগুন। বলল, আপনি টাকা খেয়ে ইচ্ছে করে আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনাকে দেখে নেব। আমি রেগে যেতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম। পাগলের ওপর রাগ করে কী লাভ? আর ততদিনে আমি শিয়োর হয়ে গেছি যে মেয়েটা পাগল। তারপর একদিন শুনলাম বনানী দাস ডিভিশান বেঞ্চে যাবে বলে উকিল খুঁজছে। বলাই বাহুল্য, কোনও ভাল লইয়ার ওর কেসটা নিতে চাইল না। শেষে ও একটা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ল। হাইকোর্ট পাড়ায় তো জোচ্চোরের অভাব নেই।'

জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ল মানে?' আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

'একটি উকিল, সে নিজেকে ব্যারিস্টার বলে জাহির করত, যদিও আদৌ সে ল পাশ করেছিল কিনা সন্দেহ, বনানীকে বোঝাল ডিভিশন বেঞ্চে তার জয় অবধারিত। বনানী তো এটাই শুনতে চায়। সে বেজায় খুশি হয়ে সেই জোচ্চোরটাকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে যেতে লাগল। পরে শুনেছিলাম এর জন্যে তাকে বসতবাড়িটা বিক্রি করতে হয়েছিল।'

'তার মানে তুমি নিয়মিত বনানী দাসের খোঁজ-খবর রাখতে?' সুনন্দর ঠোঁটে বক্র হাসি ।

'অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, রাখতাম। পরের দিকে মেয়েটার জন্যে আমার বেশ চিন্তা হত। শি ওয়াজ এক্সট্রিমলি ভালনারেবল। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। আমার কথা তো আর ও শুনবে না।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? শুনলাম ও নাকি ডিভিশন বেঞ্চে যাবে। ওই জোচ্চোরটা ওকে বুঝিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের কিছু জজ ঘুষখোর, কিন্তু সবাই নয়। তাদের কপাল মন্দ তাই খারাপ জজের খপ্পরে পড়েছিল। সেই জজ টাকা খেয়ে ওকে হারিয়ে দিয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চে গেলে এরকম হবে না। তবে শেষ পর্যন্ত বনানী দাস আর ডিভিশন বেঞ্চে যায়নি। কেন যায়নি, জানি না। জোচ্চোরটার হাত থেকে ও কী করে মুক্তি পেল তাও জানি না। মুক্তি পেয়ে কোথায় গেল সেটাও আমার অজানা।'

'বনানী দাস এখন কোথায় আছে আমি জানি। তার সঙ্গে আমরা দেখা করে এসেছি। সেই কাহিনিটা আপনাকে বলছি। কিন্তু তার আগে বলুন, ওই উকিল, যে ডিভিশন বেঞ্চে বনানীর হয়ে লড়বে বলেছিল, যাকে আপনি জোচ্চোর বলছেন, সে এখন কোথায়? তার নামটাই বা কী? '

'সে এখন কোথায় ঠিক বলতে পারব না। হাইকোর্ট চত্বরে অনেকদিন তাকে দেখি না। লোকটার নামটা ছিল কিছু একটা নন্দী। স্বপন নন্দী বা ওইরকম একটা কিছু। নামটা স্বপন ছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে। তবে টাইটেলটা নন্দী। আপনি এক কাজ করুন। দীপঙ্কর রায় বলে আমাদের এসোশিয়েশনের একজন পাণ্ডা আছে। সুনন্দ তাকে খুব চেনে। দীপঙ্করকে বলা হয় হাইকোর্টের গেজেট। ওর কাছে হয়ত ওই নন্দীর খবর পেতে পারেন।'

বাচ্চু সেনের চেম্বার থেকে আদিত্যরা যখন বেরোল তখন তিনটে বেজে গেছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল দশ মিনিটের, কার্যত দেখা গেল কথায় কথায় এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে।

'এই দীপঙ্কর রায়ের সঙ্গেও কিন্তু তোকেই যোগাযোগ করিয়ে দিতে হবে।' আদিত্য রাস্তায় বেরিয়ে বলল।

'দেখছি কী করা যায়। কিন্তু তার আগে আমার চেম্বারে চল। চা খাই।'

চেম্বারে বসে সুদৃশ্য বোন চায়নায় সুগন্ধী দার্জিলিং চা খেতে খেতে সুনন্দ তার এক জুনিয়ারকে ফোন করল।

'দীপঙ্কর রায়কে এখন কোথায় পাব জান? মানে, অ্যাসোসিয়েশনের দীপঙ্কর। একটু দরকার ছিল। এক্ষুনি কথা বলতে পারলে ভাল হয়। একটু দেখ না ধরে আনতে পার কিনা।'

একটু পরে সুনন্দর জুনিয়ার অঞ্জন কুন্ডু যাকে সঙ্গে নিয়ে চেম্বারে এসে ঢুকল তার বয়েস সুনন্দর থেকে কমই হবে। হাসিখুশি, নাদুসনুদুস চেহারা। মাথা জোড়া টাক।

'কী দাদা? এত জরুরি তলব কীসের?' দীপঙ্কর রায় চেয়ারে বসতে বসতে বলল। 'চা খাওয়ান। আপনার অফিসের চা-টা কিন্তু অনবদ্য।'

'চা তো নিশ্চয় খাওয়াব। কিন্তু কেন তোমাকে দরকার সেটা বলি। ইনি আমার বাল্যবন্ধু আদিত্য মজুমদার। এর একটা ইনফর্মেশন দরকার যেটা একমাত্র তুমিই দিতে পারবে।'

'আদিত্য মজুমদার? মানে গোয়েন্দা আদিত্য মজুমদার? আরেব্বাবা। আপনি তো মশাই বিখ্যাত লোক। আপনার কথা কত বার পেপারে পড়েছি। বলুন, বলুন কী জানতে চান।' দীপঙ্কর রায় আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল ।

'আপনার নিশ্চয় মনে আছে বছর ছয়েক আগে বনানী দাস বলে একজন মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী করে ডাঃ অসীমাভ রায় এবং ডাঃ সমীরণ সান্যালের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। কেসটা কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ অব্দি গিয়েছিল। আপনার মনে আছে?'

'খুব মনে আছে। খুব মনে আছে। কিন্তু এতদিন পরে কেন জিজ্ঞেস করছেন? কেসটা ডিভিশন বেঞ্চে যাবে নাকি?'

'না, না। তা নয়। বনানী দাস আর মামলা-টামলার মধ্যে যাবে বলে মনে হয় না। আমার জিজ্ঞাস্য অন্য। ডিভিশন বেঞ্চে যিনি বনানী দাসের হয়ে লড়বেন বলেছিলেন, কিছু একটা নন্দী, তিনি এখন কোথায় বলতে

পারেন? সম্পূর্ণ অন্য একটা কেসে তার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। '

'সজল নন্দী। জালি লোক। ক্রিমিনালদের হয়ে লড়ত। শোনা যায়, জাজদের ঘুষ দেবার চেষ্টা করত। তারপর একদিন কোনও এক জাজকে ঘুষ দিতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। ফলে এখন আর কোর্টে দাঁড়াতে পারে না। অ্যাডভোকেট হিসেবে ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে গেছে, আইনের ভাষায় যাকে বলে, ডিসকোয়ালিফায়েড অন গ্রাউন্ডস অফ মরাল টারপিটিউড। আমি যতদূর জানি লোকটা এখন বাড়িতে বসে ক্রিমিনালদের নানা রকম লিগাল অ্যাডভাইস দেয়। ক্রিমিনালরাই ওর ক্লায়েন্ট।'

'এই সজল নন্দী লোকটা কোথায় থাকে বলতে পারেন?'

'আগে তো বেহালায় থাকত। এখনও সম্ভবত ওখানেই থাকে। আপনি যদি ওর সঙ্গে দেখা করতে চান, একটা ফোন করে গেলে সব থেকে ভাল হবে।'

"ওর ফোন নম্বর আছে আপনার কাছে?'

'আছে। এই কোর্ট সংক্রান্ত এমন জিনিস নেই যেটা আমার কাছে পাবেন না।' দীপঙ্কর রায় একটা তৃপ্তির হাসি হাসল।

'তার মানে আপনার সঙ্গে সজল নন্দীর যোগাযোগ আছে?'

'কিছুটা আছে। খুব বেশি নেই। কেন বলুন তো?"

'আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যাব। আপনার রেফারেন্স দেওয়া যাবে?' 'স্বচ্ছন্দে। আমার সঙ্গে সবার সদ্ভাব।' দীপঙ্কর রায় এক গাল হাসল। আবার চা এসেছে। এবার তিন কাপ ।

জেনারেল কুটুসভের রাত্তিরে ঘুম হয় না। সেদিন রাত্রেও কুটুসভ জেগে বসে আছেন এমন সময় দূত খবর আনল নেপোলিয়নের সৈন্যদল মস্কো ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শীত, অনাহার ও ক্লান্তি তাদের ভেতরে ভেতরে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। খবরটা প্রথমে কুটুসভের বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরে যখন বুঝলেন খবরটা সত্যি, তিনি বললেন, ঈশ্বর অবশেষে আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন। আদিত্য ওয়ার অ্যান্ড পিস বন্ধ করল। একটু আগে সে আর কেয়া পাশাপাশি বসে একটাও কথা না বলে নিঃশব্দে ডিনার শেষ করেছে। কেয়া এখন রান্নাঘরে। লেফট ওভার ফ্রিজে তুলে রাখছে। আদিত্যর মনে হল, ঢের হয়েছে, আর নয়। সে হঠাৎ বসার ঘর থেকে রান্নাঘরে গিয়ে কেয়াকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। তার অতর্কিত আক্রমণে কেয়া হতচকিত। আদিত্যর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে করতে কেয়া বলতে লাগল, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমায়।'

কেয়ার গলার আওয়াজ ক্রমশ কান্নায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সেই কান্নায় দুঃখ নেই, শুধু রাশি রাশি অভিমান আছে। আদিত্য আজ কিছুতেই কেয়াকে ছাড়বে না। জাপটে ধরে আছে। কেয়া যতই চেষ্টা করুক আদিত্য কিছুতেই কেয়াকে ছাড়বে না। কেয়া ধীরে ধীরে আদিত্যর কাছে নিজেকে সমর্পণ করছে।

এখন আদিত্য আকুল হয়ে কেয়াকে আদর করছে। কেয়া সেই আদর শুষে নিচ্ছে, দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি পড়লে মাটি যেমন জল শুষে নেয়। তাদের মধ্যে কোনও কথা হচ্ছে না, শুধু একটা শরীর আর একটা শরীরের ভাষা বুঝতে পারছে।

কেয়ার সঙ্গে আদিত্যর ভাব হয়ে গেল।

(২)

সজল নন্দীর সঙ্গে যোগাযোগ করা গিয়েছিল। আদিত্য নিজের পরিচয় দেয়নি, নামটাও বানিয়ে বলেছিল। আর বলেছিল, একটা আইনি পরামর্শ নেবার জন্য দেখা করতে চায়। তার সঙ্গে দীপঙ্কর রায়ের রেফারেন্সটাও দিয়েছিল। সজল নন্দী পরের দিন সন্ধে সাড়ে সাতটায় সময় দিয়েছে।

গন্ডগোল পাকিয়ে সুভদ্র সেই যে ডুব মেরেছিল, আর সে উদয় হয়নি। আদিত্য নিজের থেকেই সুভদ্রকে ফোন করল।

'শোনো, একজনকে জেরা করার দরকার। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। লোকটা অতি ধূর্ত। পুলিশ সঙ্গে না থাকলে মুখ খুলবে না। একটা গাড়ি জোগাড় করতে পারবে? কাল সন্ধে সাড়ে সাতটায় বেহালা পৌঁছতে হবে।'

'নিশ্চয় যাব আদিত্যদা। গাড়ি জোগাড় হয়ে যাবে।' একটা দোষ করে ফেলেছে বলে সুভদ্র যেন আদিত্যর জন্য বাড়তি কিছু করতে চায়। একটু থেমে সে বলল, 'ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন ? ”

'কাল তুমি আমাকে আমার অফিস থেকে তুলে নিও তাহলে। গাড়িতে যেতে যেতে বলব ব্যাপারটা কী। ইতিমধ্যে একটা জিনিস জেনে নিই। কিছুদিন ধরে জিজ্ঞেস করব ভাবছি, করা হয়নি। কানু বলে সেই যে লোকটাকে আমরা ধরেছিলাম তার থেকে আর কিছু পাওয়া গেল?'

'তেমন কিছু পাওয়া যায়নি, আদিত্যদা। আপনি বলেছিলেন জেলের মধ্যে কানুকে একটা মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করে দিতে। আমরা তাই করে দিয়েছিলাম। খুব একটা লাভ হল কিনা জানি না। মোবাইল ফোনে কানু একবারই একজনের সঙ্গে কথা বলেছে। আমরা নম্বরটা ট্রেসও করেছি। লোকটা সম্ভবত একজন উকিল।'

'উকিলটার নাম ঠিকানা বলতে পারবে?'

'অফ হ্যান্ড পারব না। আমি তো কেসটা আর হ্যান্ডেল করছি না। আমি ইতিমধ্যে জেনে নিয়ে কাল আপনাকে বলে দেব।'

'আর দীনবন্ধু মাহাতো?'

'সেখানেও কিছু এগোনো যায়নি। লোকটা তার সেই পুরোনো গল্পটাতেই স্টিক করে আছে। ভেরি ফ্রাসট্রেটিং।'

'কী আর করা যাবে। সব সময় তো ভাগ্য কাজ করে না। ঠিক আছে তা হলে কাল দেখা হচ্ছে।'

পরের দিন সকালটা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরিতে অনেকটা সময় কাটাল আদিত্য। দীপঙ্কর রায়ের সহায়তায় কিছু পুরোনো কেসের ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়ল। কাজ করতে করতে কখন বেলা পড়ে এসেছে আদিত্য টের পায়নি। আপিসে ফিরে কেয়ার দেওয়া টিপিনটা গোগ্রাসে খেয়ে নিয়ে শ্যামলকে চা আনতে বলল। মনটা খুশি-খুশি। বোধহয়

এবার মৃত্তিকা হত্যা রহস্য সমাধানের দিকে এগোচ্ছে। তবে কয়েকটা জিনিস এখনও ধোঁয়াটে রয়েছে। পরিষ্কার করতে হবে।

সাড়ে ছ'টা নাগাদ সুভদ্রর ফোন। 'আদিত্যদা নিচে অপেক্ষা করছি। নেমে আসুন।' সজল নন্দীর বাড়ি এবং চেম্বার বেহালার রায় বাহাদুর রোডে। ঠিক রায় বাহাদুর রোডের ওপর নয়, বারিক পাড়া রোড বলে ছোট একটা রাস্তা রায় বাহাদুর রোড থেকে বেরিয়েছে, বাড়িটা সেখানে। সৌভাগ্যক্রমে জায়গাটা আদিত্যর চেনা। তার ইস্কুলের বন্ধু সুপ্রিয় লাহিড়ি ওখানে থাকত। ইস্কুলে পড়ার সময় সুপ্রিয়র বাড়িতে আদিত্য বেশ কয়েকবার গিয়েছে। কলেজে পড়ার সময়ও। তারপর বহুদিন এই অঞ্চলে আসা হয়নি।

একটা সময় জায়গাটা ক্লাইড ফ্যান বলে পরিচিত ছিল। ক্লাইড ফ্যানের কারখানার নামে জায়গার নাম। সেই কারখানা বহুদিন উঠে গেছে। অঞ্চলটার চেহারাও আমূল বদলে গেছে। আদিত্য জায়গাটা চিনতেই পারছিল না। চোদ্দ নম্বর বাসগুমটিতে একটাও বাস নেই। ফাঁকা বাসগুমটির সামনে দিয়ে আদিত্যরা ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে বাঁ দিকে বেঁকল। চোদ্দ নম্বর বাসটা বোধহয় আর চলে না।

আদিত্যর বন্ধু সুপ্রিয় লাহিড়ি এখানকার বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে রাজারহাট নিউ টাউনে চলে গেছে। সুপ্রিয়দের পুরোনো বাড়িটা ভেঙে প্রোমোটার যে নতুন পাঁচতলা বাড়িটা তুলেছে সেই বাড়িটা পেরিয়ে আরও মিনিট কয়েক যাবার পর সজল নন্দীর বাড়িটা বাঁ হাতে পড়ল। তিনতলা বাড়ি। নতুন রঙ হয়েছে। একতলায়

সজল নন্দীর চেম্বার। নেমপ্লেটে লেখা, সজল নন্দী, লিগাল অ্যাডভাইসার। ঘড়িতে সাতটা কুড়ি । কলিং বেল বাজানোর পর যে লোকটি দরজা খুলে দিল সে পুলিশের ইউনিফর্মে সুভদ্রকে দেখে খানিকটা ঘাবড়েছে।

'সজল নন্দী আছেন? তাকে খবর দাও। বল, পুলিশের লোক দেখা করতে এসেছে।' সুভদ্র ধমকের স্বরে বলল।

'বাবু আপিসঘরে মক্কেলের সঙ্গে কথা বলছেন।' পরিচারকটি মিনমিন করে জানাল।

'ঠিক আছে। তুমি খবর দাও। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।' আদিত্য অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বলল।

ইতিমধ্যে আদিত্যরা একটা বড় ঘরে এসে পৌঁছেচে। এক ঝলক দেখে মনে হয় সেটা একটা ওয়েটিং রুম। বড় ঘরের সংলগ্ন একটা ছোট ঘর আছে। সম্ভবত সেখানে বসে সজল নন্দী মক্কেলদের আইনি পরামর্শ দেয়। আদিত্য আর সুভদ্র ওয়েটিং রুমে বসল। পরিচারক ছোট ঘরে ঢুকে খবর দিতে গেছে।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পরে একটি রোগা, লম্বা মাঝবয়সী লোক ছোট ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল। পুলিশ দেখে সে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর অস্বাভাবিক দ্রুততায় সে সদর দরজার দিকে পা বাড়াল। আরও কিছুক্ষণ পরে পরিচারকটি এসে বলল, 'বাবু আপনাদের ডাকছেন।

ঘরটা ছোট হলেও আরামদায়ক। কড়া এসি চলছে। ওয়েটিং রুম থেকে ছোট ঘরে ঢুকলে আবহাওয়ার তফাৎটা বোঝা যায়। সজল নন্দীর চেয়ার-টেবিল বেশ সৌখিন। উল্টোদিকে মক্কেলদের বসার চেয়ারগুলোও তাই।

আদিত্য মনে মনে সজল নন্দীকে যেমন কল্পনা করেছিল লোকটা আদৌ সেরকম নয়। আদিত্য ভেবেছিল সজল নন্দী লোকটা রোগা-সিড়িঙ্গে-ধূর্ত টাইপের দেখতে হবে। কার্যত দেখা গেল লোকটা রীতিমত সৌম্যদর্শন। মাথার চুলগুলো অকালে সাদা হয়ে গিয়ে তার চেহারাকে আরও সম্ভ্রান্ত করে তুলেছে।

'বলুন আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?' সজল নন্দীর কথা বলার ধরনটাও বেশ মার্জিত। 'আমার কিন্তু সাড়ে সাতটায় একজন মক্কেল আসার কথা। তাকে খুব বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখাটা সমীচীন হবে না।'

'আমার মনে হয় না সাড়ে সাতটায় আপনার আর কোনও মক্কেল আসবে। আমিই আপনাকে ফোন করে সাড়ে সাতটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম। তখন যে নামটা বলেছিলাম সেটা অবশ্য আমার আসল নাম নয়।' আদিত্য শান্তস্বরে বলল।

'আসল নাম নয়?' সজল নন্দীকে বিভ্রান্ত শোনাচ্ছে। নাকি লোকটা বিভ্রান্ত হওয়ার অভিনয় করছে?

'না, আমার আসল নাম আদিত্য মজুমদার। আমি পেশায় বেসরকারি গোয়েন্দা। আর ইনি কলকাতা পুলিশের ইন্সপেকটার সুভদ্র মাজি।'

তথ্যটা হজম করতে সজল নন্দী কিছুটা সময় নিল। তারপর সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তা বেশ, তা বেশ। কিন্তু এই গরিবের বাড়িতে আপনাদের মতো মহাত্মাদের পদধূলি কেন পড়ল জানতে পারি কি? সাম্প্রতিক কালে কোনও আইন ভেঙেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

'অবশ্যই জানতে পারেন। না জানলে আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন কী করে?' 'আপনাদের প্রশ্নের জবাব আমি যে দেবই সেটা জানলেন কী করে?' 'জবাব না দিলে আপনাকে লালবাজারে তুলে নিয়ে যাব। ওখানে নিয়ে গিয়ে কথা বার করার নানা রকম উপায় আমাদের হাতে আছে।' সুভদ্র ঠান্ডা গলায় বলল । 'আমাকে লালবাজারে তুলে নিয়ে যাবেন? আমার অপরাধটা কী? দেশে আইন-টাইন নেই নাকি? তুলে নিয়ে গেলেই হল?'

'শুনুন, একাধিক কারণে আপনাকে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়। আপাতত, একটা কারণ বলছি। আপনি নিশ্চয় জানেন কিছুদিন আগে কানু বলে একজন দাগী আসামী ডাঃ অসীমাভ রায়কে ব্ল্যাকমেল করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল। কানু এখনও আমাদের হেফাজতে আছে। পুলিশি হেফাজত থেকে কানু একজনের সঙ্গেই যোগাযোগ করেছিল। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে কানু আপনার ফোনেই ফোনটা করেছিল।'

সজল নন্দীকে কি কিছুটা নার্ভাস দেখাচ্ছে? সে উত্তেজিতভাবে বলল, ‘শ্ৰীকৃষ্ণবাবু আমার মক্কেল। উনি একজন সৎ নাগরিক। পুলিশ তাকে ইচ্ছে করে ফাঁসিয়েছে। আমি আমার মক্কেলকে আইনি পরামর্শ দিতেই পারি। শ্রীকৃষ্ণবাবু আইনি পরামর্শের জন্যে আমাকে ফোন করেছিলেন।’

‘আপনি কী করে আইনি পরামর্শ দেবেন? আপনি তো একজন নাম-কাটা উকিল। কারও হয়ে আদালতে দাঁড়ানোর অধিকার তো আপনার আর নেই।' সুভদ্ৰ আক্রমণাত্মক । ‘এই দুঃসময়ে অন্তত বন্ধু হিসেবে তো আমি শ্রীকৃষ্ণবাবুর পাশে দাঁড়াতে পারি। দু'একটা কথা বলতেই তো পারি তার সঙ্গে।'

সুভদ্র কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। আদিত্য তাকে হাত তুলে নিরস্ত করে বলল, ‘নিশ্চয় পারেন। অবশ্যই পারেন। কিন্তু তার মানে আপনি নিজেই স্বীকার করছেন যে কানু আপনার বন্ধু। যেহেতু কানু আপনার বন্ধু, তাই পুলিশ সন্দেহ করছে যে ব্ল্যাকমেলটা আপনারা দু'জনে মিলে করেছেন। ক্রিমিনাল কন্সপিরেসির সন্দেহে পুলিশ আপনাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জেরা করতেই তো পারে। তাই না?’

সজল নন্দী চুপ করে আছে। ভাবছে। অনেকক্ষণ চিন্তা করে সে বলল, “ঠিক আছে। আপনারা প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দেব। পুলিশের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি। বলুন কী জানতে চান।'

আদিত্য মনে মনে ভাবল সজল নন্দী লোকটা যতই ধূর্ত হোক, ফিজিকাল অ্যাসল্টকে নিশ্চয় খুব ভয় পায়। ও জানে তুলে নিয়ে গেলে পুলিশ ওর গায়ে হাত দিতে পারে। সেটাকে ও আটকাতে চাইছে। ও এটাও জানে ও যদি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে তা হলে পুলিশ ওকে চট করে তুলে নিয়ে যেতে পারবে না। যে সহযোগিতা করছে তাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেলে পুলিশেরই বিপদ। তাই আপাতত সহযোগিতা করাটাই ওর বেস্ট স্ট্র্যাটেজি।

‘কানুর প্রসঙ্গে পরে ফিরে আসব। আপাতত আপনাকে একটা অন্য প্রশ্ন করছি। বছর ছয়েক আগে আপনি বনানী দাস বলে এক মহিলার হয়ে মামলা লড়েছিলেন। মনে আছে?'

সজল নন্দী রীতিমত হকচকিয়ে গেছে। সে ভাবেনি, এতদিন পরে বনানী দাসের প্রসঙ্গ কেউ তুলতে পারে। নিজেকে খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই মনে আছে।'

‘তা হলে আপনার নিশ্চয় এটাও মনে আছে বনানী দাস মামলা করেছিল ডাঃ অসীমাভ রায়ের বিরুদ্ধে যে অসীমাভ রায়কে কানু ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা করে ধরা পড়ে গেছে। যে কানু আবার আপনার বন্ধু। এ সবই সমাপতন, কোয়েনসিডেন্স, কি বলুন?'

সজল নন্দী উত্তর দিল না। আদিত্য দেখল কড়া এসি চলা সত্ত্বেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

‘আচ্ছা অন্য একটা প্রশ্ন করছি। বনানী দাস সিঙ্গল বেঞ্চে হেরে গিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যেতে চেয়েছিল। হাই কোর্ট পাড়ায় সকলে জানত আপনি তার হয়ে দাঁড়াবেন।

কিন্তু আপনি কেসটা থেকে উইথড্র করলেন। বনানী দাসও আর কেসটা পারসিউ করল না। কেন বলুন তো?'

‘কেন পারসিউ করল না আমি কী করে জানব? হয়ত বনানী বুঝতে পেরেছিল সেটা জেতা যাবে না। বনানী কেসটা পারসিউ করল না বলে আমিও কেসটা থেকে সরে দাঁড়ালাম।'

‘ও তাই বুঝি? আচ্ছা, ওই সময় নাগাদ, মানে যখন বনানী দাস ডিভিশন বেঞ্চে যাবে কিনা ভাবছে, তখন আপনি একটা ইমমরাল কাজে জড়িয়ে পড়ে ওকালতির অধিকার হারান। ইমমরাল কাজটা কী ছিল, সজলবাবু?'

‘আমি কোনও দিন কোনও ইমমরাল বা ইললিগাল কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। আমার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত হয়েছিল। আমার কয়েকজন শত্রু চক্রান্ত করে আমার কেরিয়ারটাকেই শেষ করে দিল।'

“ঠিক আছে। মেনে নিলাম আপনি কখনও কোনও ইমমরাল বা ইললিগাল কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু এটা তো ঠিক যে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল আপনি একজন জজসাহেবকে ঘুষ দেবার চেষ্টা করেছেন। এবং অভিযোগটা কোর্টে প্রমাণিতও হয়েছিল।'

‘কোর্টে প্রমাণিত হলেই অভিযোগটা সত্যি হবে এমন কোনও মানে নেই। আপনাকে আমি ভুরি ভুরি উদাহরণ দেখাতে পারি যেখানে অভিযোগ কোর্টে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু আসামী আসলে নির্দোষ। '

“ঠিক আছে। এটাও মেনে নিলাম। তবে আপনাকেও মানতে হবে যে ওই ঘটনাটার ফলে ওকালতি করার অধিকার না হারালে আপনি বনানী দাসের কেসটা লড়তেন। আপনি হাইকোর্ট থেকে ডিবার্ড হয়ে গিয়েছিলেন বলেই কেসটা লড়েননি।'

সজল নন্দী উত্তর দিল না। গোঁজ হয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আদিত্য বলল, ‘আপনাকে অন্য একটা প্রশ্ন করছি। যে কেসটাতে আপনার বিরুদ্ধে জজসাহেবকে ঘুষ দেবার অভিযোগ উঠেছিল সেটা কোন কেস?'

'ঠিক মনে নেই।'

‘মনে নেই? ঠিক আছে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। শবনম বলে এক দেহোপজীবিনীর হয়ে আপনি একটা মামলা লড়ছিলেন।অভিযোগ, সেই মামলায় আপনি জজসাহেবকে ঘুষ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। মামলাটার ডিটেলটা একটু বলবেন?'

‘আপনি তো দেখছি সবই জানেন। আমি আর কী বলব?'

‘যেটুকু আদালতের রেকর্ডে আছে সেটুকু জানি। সেটা বলছি। এর বাইরে যদি কিছু থাকে আপনি যোগ করে দেবেন। শবনম নামক ওই মহিলা ব্লু ফিল্ম প্রোডিউস করত এবং তাতে নিজে অভিনয়ও করত। এতে তাকে সাহায্য করত কানু ওরফে শ্রীকৃষ্ণ ওরফে অসগর নামক এক ব্যক্তি যে এখন পুলিশের জিম্মায় আছে। পুলিশ এদের ধরেছিল এবং কোর্টে যখন কেসটা চলছিল তখন আপনার বিরুদ্ধে জজসাহেবকে ঘুষ দেবার অভিযোগ ওঠে এবং প্রমাণিত হয়। এদের হয়ে আপনি কয়েকবার দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু কেস শেষ হবার আগেই আপনার ওপর বিধিনিষেধ এসে যায়। বনানী দাসের কেসটার মতো এই কেসটাও আপনি শেষ অব্দি লড়তে পারেননি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রমাণের অভাবে শবনম এবং কানু ছাড়া পেয়ে যায়। এসব তো রেকর্ডেই রয়েছে। সকলেই জানে। যা রেকর্ডে নেই তাই নিয়ে আমার দুটো প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন হল, যেহেতু একই সময়ে বনানী এবং শবনম আপনার মক্কেল ছিল, তাই আপনার চেম্বারে কি দুজনের দেখা এবং ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল? দ্বিতীয় প্রশ্ন, শবনমের বর্তমান ঠিকানাটা কি আপনি জানেন?'

‘দুঃখিত। আপনার দু'টি প্রশ্নেরই উত্তর আমি জানি না। বনানী এবং শবনম দু'জনেই আমার ক্লায়েন্ট ছিল। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে দেখা বা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কিনা আমি কী করে বলব? দ্বিতীয়ত, শবনমের সঙ্গে বহুদিন আমার যোগাযোগ নেই। অতএব তার বর্তমান ঠিকানাটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

‘আপনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোঅপরেট করছেন না।' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুভদ্র মাজি মুখ খুলেছে।

‘আমি যেটা জানি না সেটা বলব কী করে? আমি সত্যিই জানি না।' ‘আমরা যেটা জানি সেটা তা হলে বলি?' আদিত্য মৃদু স্বরে বলল। সজল নন্দী ঈষৎ উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

‘আমরা জানি, আপনি, শবনম এবং কানু, এই তিনজন মিলে অশনি রায়ের বাবা অসীমাভ রায়কে ব্ল্যাকমেল করার চক্রান্ত করেছিলেন। এর জন্য রূপলেখা দত্ত নাম নিয়ে শবনম অশনির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। এবং সেই বন্ধুত্বের সূত্র ধরে অশনির সঙ্গে নিজের কিছু ইনক্রিমিনেটিং ছবি তোলায়। ছবিগুলো তোলা হয়েছিল নিউ টাউনের একটা নির্জন বাড়িতে যেখানে অন্য সময় ব্লু ফিল্মও শ্যুট করা হতো। পরে সেই ছবিগুলো দেখিয়ে অসীমাভ রায়কে ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা করা হয়।'

'দেখুন, আপনাদের গল্পে কানু যে সরাসরি আসছে সেটা বুঝতে পারছি। কারণ সে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। হয়ত কল্পনার জোরে শবনমকেও আপনারা গল্পে টেনে আনতে পারেন, কারণ আপনাদের গল্পটা দাঁড় করানোর জন্য একটি মহিলা চরিত্র দরকার। কিন্তু এর মধ্যে আমি আসছি কোথায়? এটা ঠিক যে কানু আমার কাছে কিছু পরামর্শ চেয়েছিল। কিন্তু তার থেকে তো এটা প্রমাণ হয় না যে আমি ওই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলাম।' সজল নন্দীর গলা শুনে মনে হল তার আত্মবিশ্বাস বাড়ছে।

'এখনও তো সব প্রমাণ আপনার সামনে রাখা হয়নি, সজলবাবু। সময় হলেই রাখা হবে। আপাতত আপনাকে জানাই, পুলিশ বনানী দাসের সন্ধান পেয়েছে। বনানী দাস মুখ খুললে আমাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ পেতে অসুবিধে হবে না।'

'পুলিশ বনানী দাসের সন্ধান পেয়েছে? আমি আপনাদের কথা বিশ্বাস করি না।'

'আমাদের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন, না অবিশ্বাস করবেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপাতত ক্রিমিনাল কন্সপিরেসির চার্জে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আপনাকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের সঙ্গে ওয়ারেন্ট আছে।' সুভদ্র গম্ভীর পুলিশি গলায় বলল।

(৩)

'কৃষ্ণনগরের সেন বেকারি থেকে আমরা কিন্তু শেষ অব্দি খুব বেশি কিছু পেলাম না। শুধু আগুন লাগলে তবু ফরেনসিক এক্সপার্টদের কিছু পাওয়ার সম্ভবনা ছিল। কিন্তু আগুন নেভানোর জন্যে দমকল এসে এত জল স্প্রে করেছে যে সমস্ত এভিডেন্স ধুয়ে মুছে গেছে।' গৌতম চায়ের কাপে একটা চুমুক দিল।

'প্রণব মাইতি আর পল্লব সেনের কী অবস্থা?' আদিত্যও চায়ে চুমুক দিল। 'জামিনে ছাড়া পেয়েছে। তবে ইনশিয়োরেন্স কম্পানি ওদের বিরুদ্ধে কেস করতে খুব একটা উৎসাহ দেখাচ্ছে না। মনে হয় আউট অফ কোর্ট কোনও সেটেলমেন্ট হয়েছে। আমরা সুয়ো মোটো একটা ইনটেন্ডেড ফ্রডের কেস করতেই পারি। কিন্তু ইনশিয়োরেন্স কম্পানি যদি কোঅপরেট না করে তা হলে কেসটা দাঁড়াবে না।'

'তার মানে সেন বেকারি ইনশিয়োরেন্স কম্পানির কাছে কোনও ক্লেম করছে না ।'

'সম্ভবত না।'

'তুই সেন বেকারির হিসেবপত্রগুলো দেখেছিস?'

'আমি নিজে এখনও দেখিনি। আমার ওই অ্যাকাউন্টিং স্টেটমেন্টগুলো দেখলেই মাথা ধরে যায়। সুভদ্রকে দেখতে বলেছিলাম। ও দেখে-টেকে বলল, কম্পানি বেশ লাভ করে। তবে রুটি বিক্রি করে নয়, শাড়ি বিক্রি করে। সেন বেকারি শুধু বাংলার শাড়ি নয়, আসাম-উড়িষ্যা থেকে শাড়ি প্রোকিওর করে ওই গ্লোবাল ট্রেডিংকে বিক্রি করে। আর হ্যাঁ, গ্লোবাল ট্রেডিং-এর পাঁচ বছরের হিসেবপত্র জোগাড় করে রেখেছি। এর জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। দিল্লির কানেকশান ব্যবহার করতে হয়েছে। ওরা তো ওদের ওয়েবসাইটে হিসেব-টিসেবগুলো দেয় না। তবে দিল্লিতে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স-এ হিসেবপত্র জমা দিতেই হয়। সেখান থেকে জোগাড় করতে হলো।'

'আমাকে গ্লোবাল ট্রেডিং-এর হিসেবপত্রের একটা কপি দিয়ে দে। আর সেন বেকারির হিসেবপত্রেরও একটা কপি। আমি ভাল করে দেখব। আচ্ছা, সেন বেকারির ফ্যাক্টরির মধ্যে যে শাড়ির গুদোমটা ছিল সেটা তো অক্ষতই আছে?'

'হ্যাঁ, সেটা অক্ষতই আছে। যেখানে আগুন লেগেছিল, গুদোমটা তার থেকে অনেকটা দূরে বলে ওই অব্দি আগুন ছড়াতে পারেনি।'

'আচ্ছা, পশ্চিমবঙ্গে এখন ড্রাগ ট্র্যাফিকিং-এর কী অবস্থা? তুই যে গ্যাংটার কথা বলেছিলি তারা কি এখনও পুরোদমে অপরেট করছে?'

‘পুরোদমে, পুরোদমে। তবে পেরিফেরিতে যে দলগুলো ছিল তাদের মধ্যে একটার অ্যাক্টিভিটি বেড়েছে। ফলে গ্যাং ওয়ারের ইনসিডেন্সও বেড়েছে। আমরা জেরবার হয়ে যাচ্ছি। তোর কথা শুনে ভেবেছিলাম সেন বেকারির কারখানা সার্চ করলে হয়ত একটা লিড পাওয়া যাবে। সেটাও হল না। আসলে কীভাবে ড্রাগটা ডিসট্রিবিউটেড হচ্ছে সেটা ধরতে পারলে কাজ অনেকটা এগিয়ে যেত।' আদিত্যর মনে হল গৌতম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

‘তুই আমাকে আর ক'টা দিন সময় দে। আমি তোকে কথা দিচ্ছি একটা কিছু পেয়ে যাব। একটা কথা। সেন বেকারির ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগার আগে ওখান থেকে দুটো সুটকেস নিয়ে একটা হালকা নীল, সাদা বা হালকা ছাই রঙের গাড়ি বেরিয়েছিল। আমি নদীয়ার এস পি কে মেসেজ করে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যেন গাড়িটাকে পুলিশ ধরে। ওটা কি ধরা পড়েছিল?'

‘না। ওরা বলছে, গাড়িটাকে ওরা ধরতে পারেনি। ঝড়-বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে গাড়িটা ওদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে।'

‘আমার কিন্তু মনে হয় লোকাল পুলিশের সঙ্গে সেন বেকারির আনডারস্ট্যানডিং আছে। তাই এস পি-র নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ডিউটিতে থাকা পুলিশ গাড়িটাকে ধরেনি। আমার বিশ্বাস গাড়িটাকে ধরতে পারলে সেন বেকারির বিরুদ্ধে সলিড এভিডেন্স পাওয়া যেত। আচ্ছা, তুই একটু খুঁজে বার করার চেষ্টা কর পাঁউরুটি ভর্তি যে ট্রাকগুলো সেন বেকারির ফ্যাক্টরি থেকে বেরোচ্ছে সেগুলো কোথায় যাচ্ছে। এই রকম একটা-দুটো ট্রাক আটক করতে পারলে খুব ভাল হয়।'

লালবাজার থেকে বেরিয়ে আদিত্য নিজের আপিসে ফিরে এল। দেড়টা বেজে গেছে। আপিসে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজায় টোকা। শ্যামল।

‘আপনার টিপিনটা এনে রেখেছিলাম। আমাকে আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। ষাট টাকা দেবেন।'

শ্যামল আদিত্যর লাঞ্চটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। শালপাতার থালায় দু'পিস স্যাঁকা পাঁউরুটি। শালপাতার চৌকো বাটিতে ঘুগনি। সঙ্গে থার্মোকলের প্লেটে কিছু কাটা ফল। পেয়ারা, শসা, পাকা পেঁপে, তরমুজ, কলা। ফলের ওপর একটা টুথপিক গাঁথা আছে।

শরীর খারাপ হবার পর আদিত্য বাড়ি থেকে টিপিন নিয়ে আসে। আজ কেয়া বেরিয়ে যাবার পরে কাজের মাসি ফোন করে জানাল আসতে পারবে না। অগত্যা বাইরের খাবারই ভরসা। লাঞ্চ আনার জন্যে আদিত্য লালবাজার থেকেই শ্যামলকে বলে দিয়েছিল। গৌতমকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হল, না হলে ও সাধারণত আদিত্যকে লাঞ্চ খাইয়ে দেয়।

আদিত্য সেঁকা পাঁউরুটির দিকে তাকিয়ে ছিল। আনস্লাইড্ কোয়াটার পাউন্ড রুটি চার ভাগ করে কাটা ।

‘এটা কোন কম্পানির পাঁউরুটি গো? সেন বেকারি?”

‘পাগল হয়েছেন? সেন বেকারির পাঁউরুটি এখন কুকুর বেড়ালও খাবে না। কিছু পাতাখোর মাতাল হয়ত খায়। তাদের তো আর অত হুঁস থাকে না কী খাচ্ছে। এটা পায়োনিয়ার কম্পানির রুটি। এর ওপরে আর রুটি হয় না। আমাদের জগন্নাথদা বেস্ট রুটি ছাড়া রাখে না।'

‘জগন্নাথ কিন্তু ঘুগনিটাও খাসা বানায়।' আদিত্য ঘুগনির ঝোলে পাঁউরুটি ডুবিয়ে মুখে তুলল। ‘আচ্ছা ডিলিশাস বলে একটা পাঁউরুটি আছে না? সেটা কেমন?'

‘সেটাও ভাল। তবে ডিলিশিয়াস এদিকে তেমন চলে না। নর্থ ক্যালকাটার দিকে ভাল চলে।' শ্যামলের জেনারেল নলেজ দেখে আদিত্য মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়।

সন্ধের ঝোঁকে আদিত্য আপিস বন্ধ করে রাস্তায় বেরোল। গৌতম ভুল বলেনি। সারা দুপুর, সারা বিকেল ওই দুটো কম্পানির হিসেবপত্র পরীক্ষা করতে করতে আদিত্যরও মাথা ধরে গেছে। তাই খোলা হাওয়ায় কিছুটা হাঁটা দরকার। আদিত্য বউবাজার স্ট্রিট ধরে হাঁটছিল। কিছু দিন ধরে কাবলি জুতোটা তলার দিক

থেকে খুলে আসছে। সারাব সারাব করেও সারান হচ্ছে না। কলেজ স্ট্রিটে নিশ্চয় একটা মুচি পাওয়া যাবে। আদিত্য কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছে বাঁ দিকে বেঁকল। তার অনুমান সঠিক। মেডিকাল কলেজের সামনে পৌঁছে দেখা গেল একটা মুচি বসে আছে।

"তিরিশ টাকা লাগবে সাহেব। আঠা লাগিয়ে ভালো করে সেলাই করে দেব। আর কোনও দিন ছিঁড়বে না।'

'কোনও দিন ছিঁড়বে না? ঠিক আছে। তা হলে তাই দাও।'

'ওই পাটিটা দেখি সাহেব? আরে এটাও তো খুলে আসছে। এটাও করে দিই?' 'কোথায় খুলে আসছে?'

'এই দেখুন না।' মুচি অন্য পাটিটা ধরে এমন একটা হেঁচকা টান মারল যে নতুন জুতো হলেও খুলে আসত। বলাই বাহুল্য এটাও খুলে এল।

'ঠিক আছে। এটাও করে দাও তা হলে। দুটো মিলিয়ে কিন্তু পঞ্চাশ টাকা দেব।' মুচি কিছু বলল না। আদিত্য ধরে নিল তার আপত্তি নেই। এখন আদিত্যর দুটো জুতোই মুচির দখলে।

'খালি পায়ে রাস্তায় দাঁড়াবেন না সাহেব। আমি আপনাকে চটি দিচ্ছি।'

রবারের এক জোড়া চটি। সেটা এতই ময়লা যে আদিত্যর মনে হল খালি পায়ে দাঁড়ালেই ভাল হতো। রাস্তাটা চটির ভেতরটার থেকে ঢের বেশি পরিষ্কার। উল্টোদিকে একটা রুটি-তরকারির দোকান। লেখা আছে, একটা রুটি চার টাকা, একটা রুটি (তরকারি সহ) পাঁচ টাকা। দুটো লোক স্তূপীকৃত আটা সামনে নিয়ে রুটি বানাতে বসেছে। একটা ধেড়ে ইঁদুর রুটির দোকানের মেঝে থেকে বেরিয়ে বিদ্যুৎগতিতে রাস্তা পার হয়ে ড্রেনের মধ্যে ঢুকে গেল। হঠাৎ দমকা হাওয়া দিচ্ছে। সারাদিন অসহ্য গুমোটের পর ঈশ্বরের উপহার। রাস্তায় খবর কাগজ উড়ছে। প্লাস্টিকের বোতল গড়িয়ে যাচ্ছে।

আদিত্য মুচির চটি পায়ে গলিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। এখনই বৃষ্টি নামলে মুস্কিল। সঙ্গে ছাতা নেই, অথচ কেয়ার জন্যে একটা শাড়ি কিনতেই হবে। আগামীকাল তাদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকী। অর্থাৎ ঠিক দু'বছর আগে ওই দিনে তাদের সই করে বিয়ে হয়েছিল। দেখতে দেখতে দু'বছর কেটে গেল? কী আশ্চর্য !

কেয়া একবার খুব ক্যাজুয়ালি বলেছিল তার একটাও আসাম সিল্ক নেই। কেয়া বলেছিল, যা দাম আসাম সিল্কের, কেনা যায়? আদিত্য ঠিক করেছে কেয়াকে এবার বিবাহবার্ষিকীতে একটা আসাম সিল্ক দেবে। কলেজ স্ট্রিটের মোড় থেকে শাড়িটা কেনা যেতে পারে। কেয়ার পছন্দ হবে তো? কিন্তু কেয়াকে দেখিয়ে কিনতে গেলে সারপ্রাইজ দেওয়া হবে না। তাছাড়া খুব দামী শাড়ি হলে কেয়া আপত্তি করতে পারে। কেয়াকে না জানিয়েই কিনতে হবে। কত দাম আসাম সিল্কের?

আসাম সিল্ক? সেন বেকারি গ্লোবাল ট্রেডিংকে আসাম সিল্ক বিক্রি করে। টাঙ্গাইল, ধনেখালি, মুর্শিদাবাদ সিল্ক ইত্যাদি অন্য শাড়িও বিক্রি করে। গ্লোবাল ট্রেডিং আবার সেই সব শাড়ি নিউ ইয়র্কের একটা কম্পানিকে বিক্রি করে দেয়।

একটা জিনিস আগে খেয়াল হয়নি, এখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ খেয়াল হচ্ছে। সেন বেকারির কাছ থেকে কেনা শাড়িগুলো গ্লোবাল ট্রেডিং সর্বদা ওই নিউ ইয়র্কের কম্পানিটাকেই বিক্রি করে। অন্য কোথাও নয়। অথচ অন্য শাড়ি, যেগুলো রাজস্থান থেকে, চেন্নাই থেকে, কর্নাটক থেকে কেনা সেগুলো গ্লোবাল ট্রেডিং অ্যামেরিকার অন্য শহরগুলোতেও বিক্রি করছে। অন্য কম্পানিকেও বিক্রি করছে। লস এঞ্জেলিসে, শিকাগোয়, টেক্সাসে। কিন্তু সেন বেকারির থেকে কেনা শাড়িগুলো শুধু নিউ ইয়র্কের ওই কম্পানিটাতেই বিক্রি হচ্ছে। এটা কেন হবে? অন্য শহরগুলোতে কি আসাম সিল্ক বা বাংলার টাঙ্গাইল-ধনেখালি-মুর্শিদাবাদ সিল্কের চাহিদা নেই? ব্যাপারটা আদিত্যকে ভাবাচ্ছে।

জুতো সারানো হয়ে গেছে। চিন্তামগ্ন পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আদিত্য কলেজ স্ট্রিট, মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে পৌঁছল। এটা তার পুরোনো মেসের পাড়া। এখানে এলে আদিত্য একটু স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। এর

পরের আধঘন্টা কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে খুব পুরোনো আর বনেদি একটা শাড়ির দোকানে ঢুকে শাড়ি বাছাই করতে কেটে গেল।

কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে একটা লাল টকটকে আসাম সিল্কের শাড়ি কিনে যখন কাউন্টারে টাকা দেবার জন্য আদিত্য ক্রেডিট কার্ড বার করেছে ঠিক তখনই সে সেন বেকারি এবং গ্লোবাল ট্রেডার্স-এর মধ্যে বেআইনি লেনদেনটা দেখতে পেল। হঠাৎ দেখতে পেয়ে গেল।

বাড়িতে ঢোকার মুখে সুভদ্রর ফোন।

'খবর আছে, আদিত্যদা।'

'বাড়িতে ঢুকছি। বাড়িতে ঢুকে তোমাকে ফোন করছি। রাখছি এখন।

বাড়িতে ঢুকে আদিত্য দেখল কেয়া তখনও ফেরেনি। কেয়া বলেছিল ইস্কুলের পরে কোথায় যেন যাবে। আদিত্য মন দিয়ে শোনেনি। ভাবল কেয়াকে ফোন করে জেনে নেবে। কিন্তু তার আগে সুভদ্রকে ফোন করতে হবে। কিন্তু তারও আগে কেয়ার শাড়িটা কোথাও একটা লুকিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু সবার আগে এক কাপ কফি।

'বলো এবার কী বলছিলে।' আদিত্য কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল। 'দুটো খবর দেবার ছিল আদিত্যদা। প্রথম খবর হল, শবনম বলে ওই মেয়েটার একটা সম্ভাব্য ঠিকানা পাওয়া গেছে। আমরা একশ শতাংশ নিশ্চিত নই যে এখানেই শবনমকে পাওয়া যাবে, তবে পাবার একটা সম্ভাবনা আছে।'

'এ তো দারুণ খবর। কোথায় পেলে ঠিকানাটা?"

'সজল নন্দীর কাছ থেকে পাওয়া গেল। এমনি দেয়নি। থার্ড ডিগ্রির ভয় দেখাতে হয়েছে। তবে থার্ড ডিগ্রি করতে হয়নি। প্রচণ্ড ভিতু লোকটা। একটু ভয় দেখাতেই গড়গড় করে সব বলে দিল।'

'কী বলল ?"

'বলল, কোলাঘাটের কাছে বোরোডাঙ্গি বলে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামে শবনম থাকে। একটা বাগানবাড়িতে। ফুলের ব্যবসা করে। ওখানে গিয়ে ফুল দিদিমনির বাড়ি বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে।'

'আমাদের ওখানে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে একটু খোঁজ খবর নেওয়া দরকার । তুমি কি কাউকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছ?'

'এখনও পাঠাইনি। ভাবছিলাম আপনাকে জিজ্ঞেস করে পাঠাব।'

'না পাঠিয়ে ভাল করেছ। পুলিশ, যত প্লেন ড্রেসেই থাকুক, লোকে ঠিক বুঝতে পারে। আর ছোট্ট জায়গা তো। পুলিশ ঘুরঘুর করলে সব জায়গায় খবর পৌঁছে যাবে। শবনমও জেনে যাবে। তার থেকে আমি বরং বিমলকে পাঠাই। ও ওখানে নেই-হয়ে ঘুরে আসুক। কেউ টের পাবে না। বিমলকে মনে আছে তো?'

'খুব মনে আছে। আমার একটাই আর্জি। তাড়াতাড়ি বিমলকে দিয়ে খবর আনিয়ে নিন। যাতে যত শিগগির সম্ভব আমরা ওখানে যেতে পারি।'

'সে তো নিশ্চয়। আমি এক্ষুনি বিমলকে ফোন করছি।' "ঠিক আছে। রাখছি আদিত্যদা।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি বললে না দুটো খবর দেবার আছে? দ্বিতীয় খবরটা কী?' "ওই দেখুন। ভুলেই গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় খবরটা হল, কানা মুমতাজ, কানু যাকে বলেছিল ব্ল্যাকমেলের মূল পাণ্ডা, মাস দুয়েক আগে দুবাইতে মারা গেছে। আমরা দেরিতে খবরটা পেয়েছি। মুমতাজের ক্যান্সার হয়েছিল। দুবাইতে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিল। মুমতাজ মারা যাবার পর ওর দলটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। ইনফাইটিং শুরু হয়েছে। সকলেই বস হতে চায়।'

'তার মানে কানু জানত কানা মুমতাজের ঘাড়ে দোষ চাপালে কোনও রিপারকাশান হবে না। অর্থাৎ মারের হাত থেকে বাঁচার জন্য কানু জেনে শুনেই মুমতাজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিল। সম্ভবত কানুর খুব ক্লোজ দু'একজন ছাড়া আর কেউ এই ব্ল্যাকমেলের ব্যাপারটায় ইনভলভড নয়।'

‘আমারও ঠিক এটাই মনে হচ্ছে।'

‘একটা কথা। সজল নন্দী এবং কানুকে দূরে দূরে রাখা হচ্ছে তো? কানু যেন কিছুতেই টের না পায় সজলকে পুলিশ ধরেছে।'

‘আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আদিত্যদা। দু'জনকে একেবারে আলাদা জায়গায় রাখা হয়েছে।'

সুভদ্রর নম্বরটা ডিসকানেক্ট করে আদিত্য বিমলের নম্বরটা লাগাল ।

‘রাস্তায় না বাড়িতে?' ওপার থেকে বিমল সাড়া দেবার পর আদিত্য জিজ্ঞেস করল।

‘এখনও বাড়িতে স্যার। এবার বেরোব।'

‘দু'মিনিট সময় নেব। খুব দরকার।'

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। দু'মিনিট কেন, দশ মিনিট নিন না। আমার তো সেই আটটা থেকে ডিউটি।'

“ঠিক আছে শোনো। কোলাঘাট জান তো?'

‘জানব না কেন স্যার? আমাদের কম্পানির কৈলাস হালদারের শ্বশুরবাড়ি। গেল বছর আমরা পিকনিক করতে গেছিলাম।'

‘খুব ভাল। ওই কোলাঘাটের কাছে বোরোডাঙ্গি বলে একটা গ্রাম আছে। সেখানে একটা বাগানওয়ালা বাড়িতে একজন মহিলা থাকেন। ফুলের চাষ করেন। ওখানে সবাই তাকে ফুল দিদিমনি বলে। এই মহিলার সম্বন্ধে খবর আনতে হবে। জানতে হবে তিনি এখনও ওখানে থাকেন কিনা। থাকলে, কতক্ষণ বাড়িতে থাকেন। কখনও বেরোন কিনা। তিনি লোক কেমন। কিন্তু খবরদার, ওই মহিলা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারেন তার সম্বন্ধে কেউ খোঁজ নিচ্ছে। পারবে তো খবর আনতে?'

‘কেন পারব না? নিশ্চয় পারব স্যার। কবে আপনার খবরটা দরকার?' ‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কাল হলে কাল। দু'তিন দিনের বেশি অপেক্ষা করতে পারব না।'

‘আমি কাল সকালেই কোলাঘাট চলে যাব। বিকেলের মধ্যে চলে আসব। এসে আপনাকে ফোন করব। আমার ডিউটি তো রাত্তিরে।'

বিমল লাইনটা কেটে দেবার পর আদিত্য ঘড়ির দিকে তাকাল। সাতটা বেজে গেছে। কেয়া এখনও ফিরল না। কেয়া ফিরে এলে এক সঙ্গে চা খাওয়া যেত। একটু খিদেও পেয়েছে।

আদিত্য কেয়াকে ফোন করতে যাচ্ছিল হঠাৎ ফোনটা নিজে থেকে বেজে উঠেছে। একটা নম্বর। অচেনা।

‘হ্যালো।’

'হ্যালো, আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে কথা বলতে পারি?' ওপারে পুরুষের গলা। তবে গলার আওয়াজটা পুরুষ আন্দাজে পাতলা।

‘আমি আদিত্য মজুমদার বলছি।'

‘মিঃ মজুমদার, আমার নাম সুপর্ণ ঘোষ। আমি সাউথ এশিয়ান ব্যাঙ্কে নিমগ্ন দাশগুপ্তর কলিগ। নিমগ্নর কাছ থেকে আপনার ফোন নম্বরটা পেয়েছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। বলুন কী দরকার।'

‘মিঃ মজুমদার, দরকারটা তো আমার নয়, আপনার।' টেলিফোনকারির কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ উষ্মা ফুটে উঠল। ‘আপনি জানতে চেয়েছিলেন মৃত্তিকা মিত্রর সঙ্গে অশনি রায়ের পরিচয় ছিল কিনা। আমি বলতে চাই, খুব গভীর পরিচয় ছিল কিনা আমি জানি না কিন্তু জানাশোনা নিশ্চয় ছিল। একটা সময় মৃত্তিকা মিত্রকে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই আমাদের ব্রাঞ্চে আসতে হতো। সেই সুবাদে জানাশোনা।'

‘এটা আপনি পুলিশকে আগে জানাননি?’

‘অবশ্যই জানিয়েছিলাম। পুলিশ আমাকে সাক্ষী হিসেবে কোর্টে ডেকেও ছিল। কিন্তু অরুণকান্তি ব্যানার্জীর জেরার সামনে আমি দাঁড়াতে পারলাম না।'

‘কেন দাঁড়াতে পারলেন না?'

‘দুটো কারণে। এক, আমি নির্দিষ্টভাবে বলতে পারলাম না ঠিক কবে এবং কোথায় অশনি রায়ের সঙ্গে মৃত্তিকা মিত্রকে কথা বলতে দেখেছি। দুই, অশনি রায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল ছিল না। অশনি রায় আমার বস ছিল এবং আমাকে পছন্দ করত না। ওর জন্যে আমি কিছুতেই প্রোমোশন পাচ্ছিলাম না। এই ব্যাপারটা ব্যাঙ্কে সকলেই জানত। অরুণকান্তি ব্যানার্জী বললেন, আমি ইচ্ছে করে অশনির বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছি কারণ অশনির ওপর আমার রাগ আছে। আর অশনি না থাকলে আমার প্রোমোশন পেতেও সুবিধে হবে।'

‘অশনি রায়ের ওপর কি আপনার সত্যিই রাগ ছিল?'

‘ছিল তো বটেই। এখনও আছে। ওর জন্যে আমার কেরিয়ারটা নষ্ট হয়ে গেছে।' ‘ঠিক আছে, সুপর্ণবাবু। আমাকে ফোন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।' ফোনটা ডিসকানেক্ট করে আদিত্য ভাবল সুপর্ণ ঘোষের ব্যাপারটা একটু ক্রস চেক করা দরকার। সে নিমগ্ন দাশগুপ্তর নম্বরটা লাগাল।

‘নিমগ্নবাবু, আদিত্য মজুমদার বলছি। আমি জানি আপনি খুব ব্যস্ত। জাস্ট দু'মিনিট

সময় আপনার কাছে চেয়ে নিচ্ছি।'

‘বলুন, বলুন। এখনও ঘন্টা তিনেক আপিসে থাকতে হবে। তার মধ্যে একটু ব্রেক নিয়ে আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলা যেতেই পারে।'

‘একটু আগে সুপর্ণ ঘোষ বলে একজন আপনার রেফারেন্সে ফোন করেছিলেন। বললেন, অশনি এবং মৃত্তিকা পরস্পরকে চিনত। উনি তার সাক্ষী। আপনি কি সুপর্ণবাবুকে আমার ফোন নম্বরটা দিয়েছিলেন?

ওপারে কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর নিমগ্ন ঘোষের গলা শোনা গেল, ‘আমি সুপর্ণ ঘোষকে আপনার ফোন নম্বর দিইনি। অন্য কয়েকজনকে দিয়েছিলাম তারা যদি বলতে পারে অশনির সঙ্গে মৃত্তিকা মিত্রকে কখনও দেখেছিল কিনা। সুপর্ণ নিশ্চয় তাদের কারোর থেকে আপনার নম্বরটা জোগাড় করেছে। এই সুপর্ণ ঘোষ লোকটি একটি নুইসেন্স। ও কখনও অশনির সঙ্গে মৃত্তিকা মিত্রকে কথা বলতে দেখেছিল কিনা আমি জানি না। কিন্তু এটা জানি যে ও ব্যাঙ্কে কোনও কাজ করে না। তাই সঙ্গত কারণেই অশনি ওকে প্রোমোশন দেয়নি। এই নিয়ে অশনির ওপর ওর প্রবল রাগ। এবং হয়ত সেই কারণেই আউট অফ দি ওয়ে গিয়ে ও অশনির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল। ইন ফ্যাক্ট, প্রোমোশন ওর এখনও হয়নি। তার মানে, অশনির জায়গায় পরে যারা এসেছিল তারাও ওর কাজে সন্তুষ্ট ছিল না। সুপর্ণ ঘোষের অবশ্য ধারণা ওর সম্বন্ধে অশনির কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট এত খারাপ ছিল যে পরের লোকেরা তার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ অশনিই নাকি ওর কেরিয়ারের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। আটার বুলশিট।'

‘অনেক ধন্যবাদ নিমগ্নবাবু। আপনি আমার খুব উপকার করলেন। ও একটা কথা। আপনাকে যে বলেছিলাম গ্লোবাল ট্রেডিং-এর অ্যাকাউন্টের পুরোনো ট্রানজাকশন গুলো দেখব, এখন মনে হচ্ছে তার আর প্রয়োজন হবে না। আপনাকে আবার ধন্যবাদ।'

“ঠিক আছে। দরকার হলে ফিল ফ্রি টু কল মি। তা হলে রাখি? বাই।'

প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। কেয়া গেল কোথায়? আদিত্য ফোনটা তুলে কেয়ার নম্বরটা লাগাতে যাবে এমন সময় সদর দরজায় চাবি ঘুরিয়ে ঢোকার শব্দ। কেয়া ফিরে এসেছে।

(৪)

বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে কেয়া আজ ছুটি নিয়েছে। আদিত্যর তো রোজই ছুটি। সারাদিনের ইটিনারারি কেয়াই ঠিক করেছে। এসব ব্যাপারে আদিত্য দেখেছে কেয়ার হাতে সিদ্ধান্তগুলো ছেড়ে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এতে শুধু যে পারিবারিক শান্তিরক্ষা হয় তাই নয়, আখেরে সিদ্ধান্তগুলোও সঠিক হয়।

কেয়া বলে দিয়েছে দুপুরে বাইরে লাঞ্চ খাওয়া হবে কিন্তু রাত্তিরের খাওয়াটা হবে বাড়িতে। শুধুমাত্র আজকের দিনটার জন্য আদিত্য তার পছন্দ অনুযায়ী খাবার অনুমতি পেয়েছে।

দুপুরে কোথায় খেতে যাওয়া হবে তাই নিয়ে ঈষৎ মনোমালিন্য শুরু হয়েছিল। আদিত্য ভেবেছিল কিছুদিন আগে সে আর গৌতম যে নতুন ইটালিয়ান রেস্তোরাঁতে খেতে গিয়েছিল সেখানে কেয়াকে নিয়ে যাবে। ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ শুনেই কেয়া বেঁকে বসেছে।

'আমি ওসব আজেবাজে গেঁড়ি-গুগলি খেতে পারব না।'

ইটালিয়ান রান্নায় গেঁড়ি-গুগলির প্রসঙ্গ কেন এল আদিত্য প্রথমে বুঝতে পারছিল না। পরে মনে পড়ল। কিছুদিন আগে এক এন আর আই বন্ধু আদিত্য আর কেয়াকে একটা পাঁচতারা হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে পায়েইয়া নামক স্প্যানিশ পদটি অর্ডার দিয়েছিল যাতে জাফরান মিশ্রিত স্পেনীয় ভাতের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি, স্কুইড এবং মাসেলস দেওয়া ছিল। আদিত্য খুব আহ্লাদ করে সেসব খেয়েছিল, এতটাই তার আহ্লাদ হয়েছিল যে কেয়া খাচ্ছে কিনা সে খেয়ালই করেনি। বাড়ি ফিরে কেয়া তুমুল চেঁচামেচি করে কয়েক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। তার নাকি খাওয়াই হয়নি। বলল, সে আর কোনও দিন ওইসব গেঁড়ি-গুগলি খেতে যাবে না।

আদিত্য কেয়াকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না স্পেন এবং ইটালি দু'টি আলাদা দেশ। তাদের খাদ্যাভ্যাস এবং রন্ধন প্রণালীও আলাদা। তাছাড়া ইটালিয়ান রেস্তোরাঁটিতে গেঁড়ি-গুগলি ছাড়াও অনেক কিছু পাওয়া যায়। কেয়ার সেই একটাই কথা। সে আর গেঁড়ি-গুগলি খাবে না ।

'তা হলে কী খাবে?' আদিত্য নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল।

'কেন? চাইনিজ?'

শুনে আদিত্য বেশ মুষড়ে পড়েছে। এমন বিশেষ একটা দিনে সেই চাইনিজ? আসলে চিনে খাবার খেতে আদিত্যর খুব একটা ভাল লাগে না। কোনও স্বাদের ভেরিয়েশন নেই। সব এক রকম।

অবশেষে আদিত্যর মাথায় একটা মতলব এসেছে। সে বলল, 'আমরা তা হলে আজ পার্ক স্ট্রিটে চিনে খেতে যাব। ওখানে একটা দোকান হয়েছে যেখানে নাকি বোম্বাইএর ফিল্ম স্টাররা খেতে আসছে।'

খবরটা কিছুদিন আগে কাগজে বেরিয়েছিল। আদিত্য পড়েছে। কেয়াও পড়েছে। পার্ক স্ট্রিটের ওই রেস্তোরাঁতে যাওয়া হবে শুনে কেয়া এক পায়ে খাড়া। আদিত্যর অবশ্য অন্য উদ্দেশ্য। ওই লেখাটাতেই সে পড়েছিল উক্ত রেস্তোরাঁটিতে একেবারে অথেন্টিক পিকিং ডাক পাওয়া যাচ্ছে। পিকিং ডাক-এর কথা আদিত্য বহু জায়গায় পড়েছে, কখনও বস্তুটা চেখে দেখা হয়নি।

খাওয়া ভালই জমল। তবে পিকিং ডাকের সমস্যা হচ্ছে পুরো প্লেট নিতেই হবে।

দু'জনে মিলে একখানা হাঁস খেয়ে ফেলা অসম্ভব। বেশিটাই বাড়ির জন্য প্যাক করে সঙ্গে নিয়ে নেওয়া হল।

খাওয়া শেষ করে গাড়িতে ওঠার আগে কেয়া বলল, 'একটা সিনেমা দেখলে হয়।'

আদিত্যরও আপত্তি নেই, কিন্তু অতক্ষণ গাড়ির ভেতরে থাকলে অবশিষ্ট পিকিং ডাক নির্ঘাত পচে যাবে। আদিত্য বলল, 'তার থেকে বরং বাড়ি ফিরে খাবারটা ফ্রিজে রেখে দিই। খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে ইভিনিং শো-এ সিনেমা দেখা যাবে।'

'ইভিনিং শো-এ সিনেমা গেলে রান্না করবে কে? আজ বরং সিনেমাটা থাক।' কেয়া ঠিক করে ফেলেছে বাড়ি ফিরে যাবে।

হঠাৎ আদিত্যর মনে পড়ে গেল এ-পাড়ায় একটা কাজ ছিল। সে বলল, 'হার্টকেয়ার-এ কিছু টাকা বাকি আছে। কিছু কনসিউমেবল আছে যেগুলোর খরচ ইনশিয়োরেন্স কম্পানি দেবে না। আমাকে হার্টকেয়ার থেকে ফোন করে বলল সেগুলোর দাম আমাদের দিতে হবে। এদিকে এলাম যখন টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে যাই।'

'কত টাকা চাইছে গো?'

'বলছে পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি। এক্স্যাক্ট অ্যামাউন্টটা ওখানে গেলে বলে দেবে।'

'টাকাটা কিন্তু আমি দেব। আমি ক্রেডিট কার্ড এনেছি।'

'তুমি কেন দেবে? আমি দিয়ে দিচ্ছি।'

'আমাকেই দিতে হবে। ঠনঠনিয়ায় মা কালির কাছে মানত করেছিলাম। বলেছিলাম, আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দাও মা। যা খরচ হয় সব আমি দেব। ঠনঠনিয়াতেও একটা পুজো দিতে হবে। সেটা আমি স্কুল থেকে এসে একদিন দিয়ে দেব। আজ নার্সিং হোমের টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে যাই।' গাড়িতে উঠে কেয়া আদিত্যর গায়ে গা লাগিয়ে বসল।

হার্টকেয়ার খুব বনেদি নার্সিং হোম। বাইরের চেহারাটা পুরোনো, কলোনিয়াল । ভেতরটা সেই কলোনিয়াল স্থাপত্য বজায় রেখেও রীতিমত আধুনিক। সব মিলিয়ে দেখার মতো আর্কিটেকচার। আদিত্য যখন এখানে রুগি হিসেবে ভর্তি ছিল তখন এসব দেখার সময় বা সুযোগ ছিল না। আজ খুঁটিয়ে দেখছে।

রিসেপশনে জিজ্ঞেস করতে বলল অ্যাকাউন্টস সেকশনে যাজ্ঞসেনী মল্লিকের কাছে যেতে হবে। তিনিই বলে দেবেন কী করতে হবে, কোথায় টাকা জমা দিতে হবে। একতলায় কাঁচের দেয়াল ঘেরা অফিস। তার একটা অংশে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট। এদিক ওদিক জিজ্ঞেস করে অবশেষে যাজ্ঞসেনী মল্লিককে খুঁজে বার করা গেল। বছর চল্লিশের একটি মেয়ে, কিউবিকল-এর মধ্যে বসে একমনে কম্পিউটারে কাজ

করছে।

'আমিই আপনাকে ফোন করেছিলাম। একটু দেখে বলছি আরও কত টাকা আপনাকে দিতে হবে।' আদিত্য নিজের নাম এবং উদ্দেশ্য জানাবার পর মেয়েটি বলল।

কম্পিউটারে মেয়েটি আদিত্যর হিসেবটা খুঁজছে। আদিত্য চারদিকে তাকিয়ে দেখল সকলেই মন দিয়ে কাজ করছে। কেউ গল্প করছে না, ফাঁকি দিচ্ছে না। আদিত্য ভাবল, এই হল প্রাইভেট সেক্টর। মিনিট কয়েক পর হিসেবটা খুঁজে পেয়ে মেয়েটি একটা হলদে স্টিক-ইট চিরকুটে একটা সংখ্যা লিখল। তার নিচে আদিত্যর নাম, পেসেন্ট নম্বর, নার্সিং হোমে ভর্তি হবার তারিখ।

'আপনাকে মোট পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশ নব্বই টাকা দিতে হবে। অ্যামাউন্টটা এখানে লেখা আছে। ক্যাশে গিয়ে আপনি এই কাগজটা দেখান। বলবেন আমি পাঠিয়েছি। ওরা টাকাটা জমা নিয়ে নেবে।' মেয়েটি আদিত্যর হাতে হলদে চিরকুটটা দিল।

'ক্রেডিট কার্ডে পে করতে পারব তো?" কেয়া জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই। আর একটা কথা। টাকাটা দেওয়া হয়ে গেলে ক্যাশ-এর প্রিন্টার থেকে ট্রিপ্লিকেট রিসিট বেরোবে। মানে তিনটে রিসিট, একটা পিঙ্ক কাগজে, একটা সাদা কাগজে, একটা সবুজ কাগজে। সবুজ রিসিটটা ক্যাশ রেখে দেবে। সাদা রিসিটটা আপনার। আর পিঙ্ক রিসিটটা আমার এখানে আসবে। আপনি যদি পিঙ্ক রিসিটটা চেয়ে নিয়ে এখানে আমাকে একটু পৌঁছে দিয়ে যান, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার কম্পিউটারে এনট্রি করে নেব। তা হলে আপনার অ্যাকাউন্টটাও ক্লোজড হয়ে যাবে। না হলে কী হয়, অনেক সময় এই ভাউচারগুলো দেরি করে আসে। কখনও আবার মিসপ্লেসডও হয়ে যায়। সেরকম হলে আপনার অ্যাকাউন্টটা ঝুলে থাকবে। তাই বলছিলাম হাতে হাতে আমাকে রিসিটটা পৌঁছে দিলে কাজটা হয়ে যায়। আপনাদের অসুবিধে হবে না তো?'

'না, না। অসুবিধে কীসের?" আদিত্য মনে মনে ভাবল, প্রাইভেট সেক্টরেও তা হলে ভুলভ্রান্তি হয়।

মিনিট দশেক পরে আদিত্য আর কেয়া গোলাপী কাগজটা নিয়ে আবার যখন যাজ্ঞসানী মল্লিকের কাছে ফিরে এল সে তখনও নিবিষ্ট হয়ে কম্পিউটারে কাজ করে যাচ্ছে।

"রিসিটটা নিয়ে এসেছি।' আদিত্য মৃদু গলায় বলল।

‘ও হ্যাঁ, থাঙ্ক ইউ।’ যাজ্ঞসেনী মল্লিক অনেকক্ষণ আদিত্যর দিয়ে তাকিয়ে আছে।

যেন কিছু বলতে চায় ।

“কিছু বলবেন ?’

‘হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। যদি কিছু মনে না করেন, জিজ্ঞেস করতে পারি।’

'বলুন না। কী জিজ্ঞেস করবেন?'

‘আচ্ছা আপনিই কি গোয়েন্দা আদিত্য মজুমদার ?

‘হ্যাঁ আমিই সেই অধম।' আদিত্য স্মিত হাসল। ভাবল, এই মেয়েটা নিশ্চয় তার কথা খবর কাগজে পড়েছে। আজকাল তার একটু একটু ফ্যান-ফলোয়িং হচ্ছে। ব্যাপারটাতে আদিত্য একটা ছেলেমানুষী মজা পায়। বিশেষ করে কেয়ার সামনে এই রকম একটা-দুটো ফ্যানের দেখা পেলে বেশ লাগে।

‘আমি কাগজে পড়লাম আপনি মৃত্তিকা মিত্র মার্ডার কেসটা তদন্ত করছেন। ঠিক বলছি তো?'

আদিত্য উপলব্ধি করল এই মেয়েটা ঠিক তার ফ্যান নয়, এর মনে অন্য কোনও প্রশ্ন আছে।

‘হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলছেন।' আদিত্য সতর্কভাবে বলল।

‘মৃত্তিকা আমার বন্ধু ছিল। আমরা একসঙ্গে কাজ করতাম।' মেয়েটি বিষণ্ণভাবে বলল।

‘কোথায় এক সঙ্গে কাজ করতেন?

“এখানে। এই হার্টকেয়ার নার্সিং হোমে। এদের ব্যবসা ভাল যাচ্ছিল না। পাঁচ-ছ'জন ছাঁটাই হল, তার মধ্যে মৃত্তিকাও ছিল। হঠাৎ একদিন অফিসে এসে শোনে ওর চাকরি নেই। এক মাসের নোটিস। আমাদের ম্যানেজমেন্ট কী ক্রুয়েল ভেবে দেখুন।' যাজ্ঞসেনী মল্লিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

‘তারপর?' আদিত্য খুব মন দিয়ে শুনছে।

‘মৃত্তিকা অনেক দিন বাড়িতে বসে ছিল। তারপর অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর একটা চাকরি পেয়ে গেল। ওর স্বামীর জানাশোনা একটা কম্পানিতে। মাইনেও এখানকার থেকে বেশি। আমরা ভাবলাম ভালই হল ওর। কিন্তু তার কয়েক বছর পরে এই রকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি।'

‘আচ্ছা, মৃত্তিকা মিত্র এখানে কী কাজ করতেন?'

‘মৃত্তিকা মেডিকাল রেকর্ডসটা দেখত। কম্পিউটারের ব্যাপারটা ও খুব ভাল বুঝত।' ‘উনি মানুষ কেমন ছিলেন?' ‘চমৎকার মানুষ। হাসিখুশি, আড্ডাবাজ। ওর এরকম পরিণতি হবে আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি।'

‘এই কম্পানি ছেড়ে যাবার পরেও কি মৃত্তিকার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল?' 'প্রথম প্রথম খুব ছিল। তারপর যা হয়। যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। যোগাযোগটা আস্তে আস্তে কমে এল।'

‘চাকরি চলে যাওয়া নিয়ে মৃত্তিকার কি কম্পানির ওপর রাগ ছিল?' ‘ঠিক রাগ বলব না। একটা অভিমান ছিল। আসলে মৃত্তিকা এত নরম মনের মেয়ে ছিল, ও কারও ওপর রাগ করতে পারত না।'

‘মৃত্তিকার সঙ্গে অন্য যাদের চাকরি চলে গিয়েছিল, তাদের কারও সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে?

‘না, খুব একটা নেই। তারা কোথায় চলে গেছে কে জানে? আসলে এরা কেউই খুব একটা এফিশিয়ন্ট ছিল না। তাই এদের চাকরি যাওয়া নিয়ে অফিসে খুব একটা কথা হয়নি।'

‘মৃত্তিকার চাকরি চলে যাওয়া নিয়ে হয়েছিল?'

‘খানিকটা তো অবশ্যই হয়েছিল। আমি এখনও মনে করি মৃত্তিকার সঙ্গে কম্পানি ভাল ব্যবহার করেনি। ওর মতো এফিশিয়ন্ট একটা মেয়েকে কখনও সরানো উচিত? ওকে সরিয়ে ম্যানেজমেন্ট কিছুদিন পরে ওর জায়গায় যাকে আনল সে নাকি কোনও এক মালিকের আত্মীয়। সেটা হতেই পারে, কিন্তু আমরা জানি সে ভীষণ ইনএফিশিয়ন্ট। শুধু মালিকের আত্মীয় বলে টিকে আছে।'

এইটুকু বলেই যাজ্ঞসেনী মুখে হাত চাপা দিল। দিয়ে বলল, ‘ইশ। আমি খুব বেশি কথা বলে ফেলছি। কেউ শুনে ফেললে চাকরি চলে যাবে।'

আরও দু'একটা কথার পর আদিত্যরা যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন প্রায় চারটে বাজে।

কেয়া তেল-কই রাঁধছে। রেসিপিটা সে কোনও এক রন্ধন পটিয়সীর সাইট থেকে পেয়েছে। ইলিশ ভাপে আগেই হয়ে গেছে। আদিত্য গান শুনছে। নিখিল ব্যানার্জী মালগুঞ্জি বাজাতে শুরু করেছেন। ১৯৮০ সালে মিউনিখে বাজিয়েছিলেন। ইউ টিউব-এ আছে। আদিত্য সেখান থেকে ডাউনলোড করে রেখেছিল। এতদিন ভাল করে শোনা হয়নি । দুটো গান্ধার লাগিয়ে, বাগেশ্রী-রাগেশ্রী মিশিয়ে নিখিল বন্দ্যোপাধায় একটা আশ্চর্য গল্প তৈরি করছিলেন, আদিত্য বুঁদ হয়ে শুনছিল, হঠাৎ ফোনটা বেসুরে বেজে উঠল।

'বিমল বলছি স্যার।'

‘বল কী খবর পেলে।' আদিত্য বাজনাটাকে পজে দিয়ে বলল।

‘যা জানতে বলেছিলেন মোটামুটি জেনে এসেছি স্যার।'

‘কী জানলে? কার কাছ থেকে জানলে ?

'তা হলে প্রথম থেকে গুছিয়ে বলি স্যার?”

‘ঠিক আছে, তাই বল।' কথাটা বলেই আদিত্য ঘড়ির দিকে তাকাল। ন'টা বাজে। রান্না হয়ে গেলেই কেয়া খেতে বসার জন্যে তাড়া লাগাবে। বিমলের একটু বাজে বকার স্বভাব আছে।

‘সেদিন বললাম না স্যার আমাদের কম্পানির কৈলাস হালদারের শ্বশুরবাড়ি কোলাঘাটে, তো প্রথমে সেখানেই গেলাম। কৈলাসের শালা ছেলেটা খুব ভাল। কলেজ স্ট্রিটের একটা জুতোর দোকানে কাজ করে। ওই পিকনিকের দিন আমার সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল। ভোরবেলা বেরিয়ে ওকে ধরলাম। আর একটু হলেই কাজে বেরিয়ে যেত। আমি বললাম, একটু দাঁড়াও না। কিছু কথা আছে। ও বলল, দাঁড়ানোর সময় নেই। ন'টা দশের লোকালটা ধরতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে স্টেশন অব্দি চল। যেতে যেতে বলবে। আমি আর কী করি? ওর সঙ্গে আবার হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন অব্দি চললাম।'

আদিত্য ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। বলল, “ওইসব ভনিতা ছেড়ে আসল কথাটা বল না।'

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি। স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ওকে বললাম, আমার এক বন্ধু ফুলের ব্যবসা করে। গড়িয়ায় দোকান। পুজো-পরবের দিনে, যখন ফুলের বিক্রি খুব বেড়ে যায়, আমিও ওর সঙ্গে হাত লাগিয়ে ফুল বিক্রি করি। বুঝতেই তো পারছ কম্পানি যা মাইনে দেয় তাতে চলে না। তা ভাবছি, পাকাপাকিভাবে আমার ওই বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারি করে ফুলের ব্যবসায় নামব। আমার তো রাত্তিরে ডিউটি, সকালটা ফাঁকাই থাকে। আর ফুল বিক্রি তো সকালেই হয়। কৈলাসের শালা বলল, তা এসব কথা আমাকে বলছ কেন? আমি বললুম, শুনেছি এখানে বোরোডাঙ্গি গ্রামে এক ফুল দিদিমনি আছে। ওখানে নাকি তার মস্ত ফুলের বাগান। হাওড়ার জগন্নাথ ঘাটে তার ফুলের খুব সুনাম। সেখান থেকেই নামটা শুনে এলুম। সরাসরি তার কাছে যাবার আগে ভাবলুম তোমাকে একবার জিজ্ঞেস করি। আমি যদি ওকে গিয়ে বলি আপনার বাগান থেকে ফুল কিনতে চাই, উনি রাজি হবেন?'

কেয়া ঘরে ঢুকেছে। বলল, “খাবার রেডি। আমি টেবিল সাজাচ্ছি। ফোন রেখে এবার খেতে এস। খাবারগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর খাওয়া যাবে না।'

‘আর পাঁচ মিনিট দাও। কথাটা সেরে নিই।' আদিত্য মুখটা করুণ করে বলল। ‘ঠিক আছে। আমি টেবিল সাজিয়ে চান করতে যাচ্ছি। তার মধ্যে ফোন সেরে নাও।'

আদিত্যকে কেয়ার সঙ্গে কথা বলতে শুনে বিমল চুপ করে গিয়েছিল। কেয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর আদিত্য আবার কথাবার্তা শুরু করার জন্যে বলল, ‘তারপর ?’

‘আমার কথা শুনে কৈলাসের শালা কিছুক্ষণ গুম মেরে রইল। তারপর বলল, শোনো, ওই ফুল দিদিমনির কথা আমি জানি। ওখানে তোমার সুবিধে হবে না। কেন হবে না? আমি জিজ্ঞেস করলুম। সে বলল, আমি অত কারণ-টারণ বলতে পারব না। শুধু এইটুকু বলতে পারি এদিককার দু'একজন ওখানে ফুল কিনতে গিয়ে

গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে। ওই আমার ট্রেন আসছে। আমি চললুম। এই কথা বলে কৈলাসের শালা ট্রেনে উঠে গেল। আমি বোকার মতো প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইলুম।'

'তারপর কী করলে? ফিরে এলে?”

'না, না। ফিরে আসব কেন? আমি কি অত সহজে ছেড়ে দেবার লোক? একে ওকে জিজ্ঞেস করে ওই ফুল দিদিমনির বাগানবাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। মস্ত বড় বাগান। পুরোটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। ভেতরে কী আছে বাইরে থেকে দেখার জো নেই। গেটে ষণ্ডামার্কা একজন দরোয়ান বসে আছে। তাকে বললুম, ভাই এখান থেকে কি ফুল কেনা যায়? লোকটাকে চোখে দেখে যতটা রুক্ষ-স্বভাবের মনে হয়েছিল, আসলে সে ততটা খেঁচুটে নয়। আমাকে ভালভাবেই বলল, এখান থেকে ফুল বিক্রি হয় না। নিউ মার্কেটের এক ব্যবসায়ী পুরো বাগানটার ইজারা নিয়ে নিয়েছে। যা ফুল হয় সে-ই ট্রাকে করে নিয়ে যায়। তার মানে ওখানকার ফুল জগন্নাথ ঘাটে যায়ই না। ভাগ্যিস লোকটাকে জগন্নাথ ঘাটের ঢপটা দিইনি। যাই হোক এর পরে তো আর কিছু বলার থাকে না। আমি মাথা নিচু করে চলে এলুম।

'কোথায় চলে এলে? কলকাতায় ? '

'না, না। ওই বাগানবাড়ির গেটের সামনে থেকে চলে এলুম। উল্টোদিকে একটা চায়ের দোকান। ভাবলুম কলকাতায় ফিরে যাবার আগে এক কাপ চা খেয়ে যাই। আমার ভাগ্য ভাল চায়ের দোকানিটা খুব গপ্পে। ওই সময় দোকানে খুব একটা ভিড়ও নেই। দোকানিটা আমাকে দেখে বলল, আপনাকে তো আগে এদিকে দেখিনি। নতুন এলেন নাকি। আমিও সুযোগ পেয়ে আমার ফুল কেনার গল্পটা ওকে খাইয়ে দিলাম। ও বলল, আরে বাবা আপনি একেবারে ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন। আমরা গেরামের লোকেরা জানিই না ওই বাগানের ভেতরে কী হয়। বাড়িটা অনেকদিন খালি পড়েছিল। ঝোপ-জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল। তখন পাঁচিল টপকে লোকে ওখানে হাগতে যেত। বছর দু'তিন আগে ওই মেয়েছেলেটা বাগানবাড়ি কিনে, জঙ্গল সাফ করে, নতুন পাঁচিল তুলে ওখানে ফুলের চাষ শুরু করে। কিন্তু গেরাম থেকে কাউকে কাজ দেয়নি। বাইরে থেকে মালি এনেছিল। মালিগুলো ভেতরেই থাকে। মেয়েছেলেটাও কারও সঙ্গে মেশে না। বাইরেই বেরোয় না। তবে পার্টিকে মোটা চাঁদা দেয় বলে ওকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না। বাইরের কেউ ওখানে আসে না? আমি জিজ্ঞেস করলুম। দোকানি বলল, ওই সপ্তাহে একদিন ট্রাক এসে ফুল নিয়ে যায়। আর মাঝে মাঝে সিনেমা পার্টি শুটিং করতে আসে। আমি বললাম, আরেব্বাবা। এখানে সিনেমার শুটিং হয়? স্টাররা আসে? দোকানি বলল, ধুস! যারা আসে তারা গাড়ির কালো কাঁচ তুলে আসে। আমরা দেখতেই পাই না, কে আসছে যাচ্ছে। তবে ওই ম্যাটাডরে ক্যামেরা-ট্যামেরা এলে দেখা যায়। আর হ্যাঁ। একা একটা লোক মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে আসে।'

'ওকি? তুমি এখনও ফোন নিয়ে বসে আছ? রাখ, এবার ফোনটা রাখ। কেয়া চান করে এসেছে।

'এক মিনিট। এক্ষুনি রেখে দিচ্ছি।' আদিত্য মোবাইল মুখ থেকে নামিয়ে কেয়ার দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর আবার মোবাইল কানে দিয়ে বলল, “আর কি কিছু বলার আছে তোমার?'

'নাঃ। মোটামুটি এইটুকুই।'

'ঠিক আছে। আমার এতেই কাজ হবে। শুধু আর একটা জিনিস তোমায় করতে হবে। তিরুপতি গার্ডস-এর চাকরিটা ছেড়ে দেবার সময় সোমনাথ ম্যানেজারকে বলেছিল আমার পাওনা টাকাটা আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেবেন। মনে আছে, এটা তুমিই আমাকে বলেছিলে?'

'মনে আছে স্যার।'

'আমাকে ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ডিটেলটা জোগাড় করে দিতে হবে।

'এটা মনে হয় পেরে যাব স্যার।'

'এবার দয়া করে ফোনটা রাখ।' কেয়া বেজায় ক্ষেপে গেছে।

‘রাখছি, রাখছি। আর একটা ফোন করব। দু'মিনিট লাগবে। তুমি ভাতটা মাইক্রোতে দাও।' আদিত্য বিমলের ফোনটা কেটে দিয়ে সুভদ্রর নম্বরটা লাগাল ।

‘বলুন আদিত্যদা।' সুভদ্রর গলা শুনে মনে হল সে খুশমেজাজে আছে। ‘একটা কাজ করে দিতে হবে। তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ঘটনার একটা কালানুক্রমিক তালিকা পাঠিয়েছি। যাকে বলে ক্রোনোলজি অফ ইভেন্টস। প্রত্যেকটা ঘটনার পাশে সেই ঘটনার মাস এবং বছরটা বসাতে হবে। এর জন্যে একটু দৌড়োদৌড়ি করতে হতে পারে। হয়ত দু’একজন লোকও এনগেজ করতে হবে। এই কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। এর জন্য তোমাকে আমি দু'দিন সময় দিলাম।'

নবম পরিচ্ছেদ

(১)

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে আদিত্যর কান্না পায়। কিন্তু একবার চোখ থেকে ঘুম ঝেড়ে উঠে পড়তে পারলে, মন্দ লাগে না। সুভদ্র আজ ভোর ছ'টায় গাড়ি নিয়ে এসেছিল। এখন তারা দ্বিতীয় হুগলি সেতু পার হচ্ছে।

গাড়িটা এসইউভি। সামনের সিটে ড্রাইভার ছাড়াও একজন বন্দুকধারী পুলিশ। একেবারে পেছনের সিটে আরও একজন। মাঝখানে দুটো বাকেট সিট। তার একটাতে আদিত্য, আর একটাতে সুভদ্র। তাদের গন্তব্য কোলাঘাটের কাছে বোরোডাঙ্গি গ্রাম।

ব্রিজের ওপর খুব বেশি গাড়ি নেই। নিচে নদীটাও প্রায় ফাঁকা। ভোরের নরম আলোয় চিকচিক করছে। বোয়া ভাসছে একটা দুটো। ব্রিজের মাঝপথে পৌঁছে সামনের সিটের পুলিশটা চোখ বুজে, জোড়হাত করে মা গঙ্গাকে প্রণাম করল। আদিত্যদের গাড়ি ভি আই পি লেন দিয়ে টোল প্লাজা পেরিয়ে যাচ্ছে। ব্রিজ থেকে নেমে আর একটু গিয়ে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে। এত সকালে সেটাও বেশ ফাঁকা। শুধু দু'একটা জায়গায়, যেখানে বাজার বসেছে, সেখানে একটু ভিড়। আকাশের এক কোণে কিছু মেঘ জমা হয়ে ছিল। গাড়ি বম্বে রোডে পড়ার আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ‘শবনম বলে এই মেয়েটাকে ধরতে পারলে আমরা ব্ল্যাকমেলের কেসটাকে সলভ করে ফেলব। হয়ত মৃত্তিকা মিত্রর কেসটা থেকে অশনি রায়কে অব্যাহতি দেবার মতো একটা অবস্থাও তৈরি হতে পারে।' সুভদ্র প্রায় নিজের মনে স্বগতোক্তি করল। আসলে সে বুঝতে চায় আদিত্য কী ভাবছে।

আদিত্য উত্তর দিচ্ছে না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

'আমি ঠিক বলছি তো, আদিত্যদা?”

‘কিছুটা ঠিক, পুরোটা ঠিক নয়।' আদিত্য যেন খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে কথা বলছে। ‘প্রথমত, শবনমকে ধরতে পারলে শুধু হবে না। ছবিগুলোও তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে। না হলে শবনম বলতে পারে তার অজান্তে কেউ ছবিগুলো তুলেছে। সে এইসবের সঙ্গে জড়িত নয়। দ্বিতীয়ত, অশনি রায় যদি শবনমকে রূপলেখা বলে আইডেন্টিফাই করেও, এটা তো প্রমাণ হয় না যে অশনি মৃত্তিকাকে খুন করেনি। এমন তো হতেই পারে, অশনি রূপলেখার সঙ্গে প্রেম করত এবং একই সঙ্গে, কোনও একটা কারণে, মৃত্তিকাকে খুন করেছিল?’

‘কিন্তু অশনি তো বলছে সে মৃত্তিকাকে খুব অল্পই চিনত। অশনি কি মিথ্যে বলছে?' ‘মিথ্যে বলছে না এটাই বা জোর দিয়ে বলি কী করে? অশনি যে ব্যাঙ্কে কাজ করত সেখানে কাজের সূত্রে মাঝে মাঝেই মৃত্তিকাকে যেতে হতো। দু'জন পরস্পরকে চেনার ব্যাপারটা তো অশনিই স্বীকার করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, দুজনের মধ্যে কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল? ব্যাঙ্কের একজন এই ব্যাপারে সাক্ষী দিয়েছিল। বলেছিল দু'জনে ঘনিষ্ঠই ছিল। কিন্তু অরুণপ্রকাশের জেরায় তার সাক্ষ্যটা দাঁড়ায়নি। আর একজন সাক্ষী আছে। বাঙ্গুর এভিনিউএর ওই ফ্ল্যাটের তৎকালীন সিকিউরিটি গার্ড। সে বলছে সে বোধহয় মৃত্তিকা এবং অশনিকে পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে এক সঙ্গে দেখেছে। তবে সে খুব নিশ্চিত নয়।'

‘কিন্তু মৃত্তিকাকে খুন করার ব্যাপারে অশনির মোটিভ কী হতে পারে?' ‘জানি না। ভাবতে হবে।' আদিত্য মুখে সেই যে কুলুপ আঁটল, কোলাঘাট পৌঁছনো অব্দি সে কুলুপ আর খুলল না।

কোলাঘাট পৌঁছে আদিত্য বলল, 'কাজে নামার আগে একটু চা-জলখাবার খেয়ে নিলে হতো না? সকালে তো ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি।'

পাঞ্জাবি ধারায় আলুর পরোটা এবং চা খেয়ে আদিত্যরা যখন বোরোডাঙ্গি গ্রামের সেই বাগানবাড়ির সামনে পৌঁছল তখনও আটটা বাজেনি। মেন গেট বন্ধ। চারদিকে উঁচু পাঁচিল। দরোয়ানকে দেখা যাচ্ছে না। একজন পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে গেট ধরে ভয়ঙ্কর ঝাঁকানি দিল। লোহার গেট ঝনঝন করে উঠল। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। পুলিশ দেখে উল্টোদিকের চা-ওলা দোকান ফেলে দৌড়ে এসেছে। আদিত্যরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে।

'এর মধ্যে তো দরোয়ান উঠে দরজার সামনে বসে থাকে। মালিরাও উঠে কাজ শুরু করে দেয়। আজ এদের হলটা কী ?' দোকানির স্বতঃপ্রণোদিত জিজ্ঞাসা আরও কয়েকবার সজোরে লোহার গেটে ধাক্কা দেওয়া হল। কোনও সাড়া শব্দ নেই ।

সুভদ্র একজন পুলিশকে বলল, 'তুমি গেট টপকে ভেতরে ঢুকে দরজা খুলে দাও।' পুলিশটি তার সহকর্মীর কাছে হাতের অস্ত্রটা গচ্ছিত রেখে প্রায় অনায়াসে গেট টপকে ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর আর তার সাড়াশব্দ নেই।

'অনিল? অনিল? গেলে কোথায়?' সুভদ্র গলা তুলে ডাকল। বন্ধ গেটের ওদিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই।

মিনিট পাঁচেক পরে, যখন সুভদ্র আর আদিত্য আলোচনা শুরু করেছে প্রথম পুলিশের খোঁজে দ্বিতীয় জনকেও পাঠাবে কিনা, হঠাৎ গেটটা শব্দ করে খুলে গেল। 'গেটে তালা দেওয়া ছিল স্যার। দরোয়ানের ঘর থেকে চাবি এনে খুললাম। তাই দেরি হয়ে গেল। খোলা গেট দিয়ে অনিল মুখ বাড়িয়েছে।

'দরোয়ান কী করছে?' আদিত্য খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'অঘোরে ঘুমোচ্ছে স্যার। মনে হচ্ছে কেউ কড়া ঘুমের ওষুধ স্প্রে করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। ও এমন বেভুল হয়ে ঘুমোচ্ছে, মনে হয় খুব সহজে উঠবে না।' আদিত্যদের দলটা বাগানবাড়ির ভেতরে ঢুকল। বাগানটাই বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে, বাড়ির অংশ কম। গেটের পাশেই দরোয়ানের ঘর। দরোয়ান বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। 'ভাগ্যিস দরোয়ানের দরজাটা খোলা ছিল। না হলে চাবিটাই পেতাম না।' অনিল নামক পুলিশটি নিজের মনেই বলল।

লাল, সাদা, হলুদ, ফুলের বাগানটা সত্যিই মনোরম। একদিকে গোলাপ গোলাপী। মাঝখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে রজনীগন্ধা, গাঁদা। অন্যদিকে জুঁই, বেল, আরও দু'একরকমের ফুল। বাগানের এক কোণে আর একটা ঘর, সম্ভবত মালিদের বাসস্থান। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, একটা জানলা খোলা রয়েছে। খোলা জানলা দিয়ে দেখা গেল দুটো মালি মেঝেতে বিছানা পেতে মরিয়া হয়ে ঘুমোচ্ছে।

'এদেরও মনে হচ্ছে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।' দ্বিতীয় পুলিশটি বলল। তার নাম আদিত্য এখনও জানে না।

'আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। বাড়ির ভেতরে যাওয়া যাক।' আদিত্যর গলায় রীতিমত উৎকণ্ঠা।

দোতলা বাড়ির সদর দরজাটা খোলা। একতলায় দুটো ঘর। একটাতে সোফাসেট পাতা। এটাই মনে হচ্ছে বসার ঘর। তার সংলগ্ন ঘরটাতে অব্যবহৃত হরেক রকম জিনিস ডাঁই করা রয়েছে। সাহেবরা যাকে বলে লাম্বার রুম। একতলায় আর কোনও ঘর নেই।

দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা প্রায়ান্ধকার। সম্ভবত জানলাগুলো বন্ধ রয়েছে বলে। নিচের বসার ঘরটার সাইজে ওপরেও একটা বড় ঘর। এক দিকে একটা খাটের ওপর সাদা বিছানা পাতা। কিন্তু এটাকে ঠিক শোবার ঘর বলে মনে হচ্ছে না। সংলগ্ন ঘরটা মনে হয় বেডরুম। ঘরে আলো জ্বলছে।

আদিত্যরা বেডরুমে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। মেঝের ওপর এক পুকুর রক্তের মধ্যে একটি মেয়ে পড়ে আছে। তার শরীরটা একটা উলটে পড়া চেয়ারের সঙ্গে নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা। যন্ত্রণায় তার মুখ-চোখ

বিকৃত। এ যদি শবনম হয়, তা হলে বোঝাই যাচ্ছে শবনম আর বেঁচে নেই।

প্রাথমিক ঝটকাটা কাটিয়ে উঠে সুভদ্র বলল, "আমাকে লালবাজারে ফোন করতে হবে আদিত্যদা। কয়েকটা ফরম্যালিটি আছে। ডাক্তার আসবে, ফটোগ্রাফার আসবে, ফরেন্সিক এক্সপার্ট আসবে। লাশ নিয়ে যাবার জন্যে একটা এম্বুলেন্সও লাগবে। আমি পাশের ঘর থেকে ফোনটা করে আসছি। এ ঘরে সিগনাল পাচ্ছি না।'

সুভদ্র চলে যেতে আদিত্য পুলিশ দু'জনকে বলল, "আপনারা একটু মেন গেটে পাহারা দিন। দেখুন বাইরের কেউ যেন বাড়ির ভেতরে ঢুকতে না পারে।'

পুলিশ দুজন চলে যাবার পর আদিত্য লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। চারদিকে চাপ চাপ রক্ত। এত রক্ত এল কোথা থেকে? সম্ভবত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে এই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। গালে, গলায়, ঘাড়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু কোনওটাই খুব গভীর নয়। তা হলে? আদিত্য হঠাৎ লক্ষ করল মৃতার ডান হাতের তিনটে আঙুলের নখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই এত রক্তপাত। এবং অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে মৃত্যু। অতিরিক্ত যন্ত্রণার ফলে মরার আগে এই মহিলা অমানুষিক কষ্ট পেয়েছে। এতটা কষ্ট ওকে কেন দেওয়া হল?

আদিত্য মৃতদেহের থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিল। টের পায়নি কখন সুভদ্র এই ঘরে ফিরে এসেছে।

'লালবাজার থেকে টিম আসছে। কিন্তু তার আগে লোকাল থানা থেকে হেল্প চলে আসবে। বাইরে মেন গেটের সামনে ভিড় জমতে শুরু করেছে। অনিল আর রাজু ওদিকটা সামলাচ্ছে। বলল, আপনিই ওদের গেটটা সামলাতে বলেছেন। লোকাল হেল্প এবং লালবাজার থেকে লোক যতক্ষণ না আসছে আমাদের এখানে থাকতে হবে।'

'তুমি লোকাল থানায় বলে একটা অ্যামবুলেন্স-এর ব্যবস্থা কর। দরোয়ান এবং মালিদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, দেখছি' বলে সুভদ্র আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ।

আদিত্য খুব মন দিয়ে একটা কিছু খুঁজছে। সুভদ্র ফিরে এসে বলল, "বিশেষ কিছু খুঁজছেন আদিত্যদা?'

'হ্যাঁ। এই মহিলা যদি শবনম হয় তা হলে আমার বিশ্বাস এই ঘরের কোথাও একটা লুকোনো ক্যামেরা থাকবে। সেই ক্যামেরাটাই খুঁজছি।'

'ক্যামেরা?'

'হ্যাঁ, লুকোনো ক্যামেরা। শবনম যেভাবে অশনির ছবি তুলেছিল তাতে মনে হয় এই ব্যাপারে ওর একটা এক্সপার্টিস ছিল। মানে, কাজটা ও আগেও করেছে। বলাই বাহুল্য ব্ল্যাকমেলিং-এর উদ্দেশ্যে। এই নির্জনে এসে ও কি ওর পুরোনো রোজগারের রাস্তাটা একেবারে ছেড়ে দেবে? বিশেষ করে ওই চা-ওলা বিমলকে বলেছিল, মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে একা একটা লোক আসে। তাই ভাবছিলাম এই ঘরে লুকোনো ক্যামেরা একটা থাকতেও পারে।'

অনেক খুঁজেও লুকোনো ক্যামেরা-ট্যামেরা কিছুই পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে লোকাল পুলিশ এসে গেছে। দরোয়ান এবং মালিদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ওষুধের প্রভাবে তারা এখনও অচৈতন্য হয়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ পরে লালবাজারের টিম এসে গেল। এদের মধ্যে পুলিশের ডাক্তারবাবু আদিত্যর চেনা।

মৃত্যুর কারণের ব্যাপারে ডাক্তারবাবু আদিত্যর সন্দেহটা মোটামুটি কনফার্ম করলেন। বললেন, "এটা তো দেখাই যাচ্ছে যে ডান হাতের তিনটে নখ তীক্ষ্ণ কোনও ছুরি দিয়ে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। ওপর ওপর দেখে মনে হচ্ছে এর ফলে যে অমানুষিক যন্ত্রণাটা হয়েছে সেটার কারণে সম্ভবত হার্ট ফেল হয়েছে। আবার

অতিরিক্ত রক্তপাতও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পোস্ট মর্টম না করলে নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর কারণটা বোঝা যাবে না।'

'এত নৃশংসতা একমাত্র কানা মুমতাজের গ্যাং-এর লোকেরাই করতে পারে। নিশ্চয় খবর গেছে ওই ব্ল্যাকমেলের কেসটার সঙ্গে কানু কানা মুমতাজের নাম জড়িয়ে দিয়েছিল।' সুভদ্র বলল।

আদিত্য উত্তর দিল না। তার চোখ এখনও ঘরের মধ্যে একটা লুকোনো ক্যামেরা খুঁজে যাচ্ছে। ছবি বা আয়না সরিয়ে তো দেখা হল। কোথাও কিছু নেই। পরিষ্কার সাদা দেয়াল, সেখানেও ফুটো-ফাটা নেই। আলমারির দরজাটা খোলা ছিল, ভেতরের ড্রয়ারগুলোও খোলা ছিল। খুনী একটা কিছু খুঁজেছে। হঠাৎ বিছানার ধারে সুইচ বোর্ডটার দিকে আদিত্যর চোখ পড়ল। আলোর সুইচ, এসির সুইচ, দুটো প্লাগ পয়েন্ট। তার মধ্যে একটা প্লাগ পয়েন্ট বেশ বড়। সাধারণত এত বড় প্লাগ পয়েন্ট রান্নাঘরে থাকে। এটা পনের অ্যাম্প-এর প্লাগ গ্রাইন্ডার, মিক্সার, রেফ্রিজারেটার ইত্যাদি যেগুলোতে বেশি ইলেকট্রিসিটি লাগে সেগুলো ব্যবহারের জন্যে। এটা এখানে কেন? প্লাগ পয়েন্টগুলোতে কোনও প্লাগ লাগানো নেই।

'এই সুইচ বোর্ডটা খোলা যাবে?' আদিত্য সুভদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল। 'একটা ছুরি বা স্ক্রু ড্রাইভার জোগাড় করতে পারবে?' সুভদ্র অনিলকে জিজ্ঞেস করল। 'এই সুইচ বোর্ডটা খুলে ফেলতে হবে।'

'দেখছি স্যার।" অনিল তার পকেট থেকে একটা ফোল্ডিং ছুরি বার করে ফেলেছে। সেটা দিয়ে একটু চাড় দিতেই সুইচ বোর্ডটা খুলে এল। কোনও সন্দেহ নেই ভেতরে যে ছোট্ট যন্ত্রটা রয়েছে সেটা একটা ভিডিও ক্যামেরা। ক্যামেরাটা এখনও চলছে। সুইচ বোর্ডের ভেতরে থাকলেও প্লাগের ফুটো দিয়ে বাইরে, ঘরের প্রায় পুরোটা, ক্যামেরার ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে ধরা পড়েছে।

'মনে হচ্ছে খুনের পুরো দৃশ্যটা এই ক্যামেরার মধ্যে ধরা আছে। একটু গবেষণা করলেই বোঝা যাবে ক্যামেরাটা চালু-বন্ধ করে কী করে। সে যাই হোক, খুনির চেহারাটা এবার দেখতে পেয়ে যাবে।'

'চেহারাটা না হয় দেখতে পেলাম। কিন্তু লোকটাকে কোথায় পাব?'

'কাজের ধরন দেখে মনে হচ্ছে এটা পেশাদার কোনও খুনির কাজ। দ্যাখো, তোমাদের রেকর্ডে লোকটার হদিশ পাও কিনা। খুনির পরিচয় জানাটা আসল সমস্যা নয়। আসল সমস্যা হল কে বা কারা খুনিকে নিয়োগ করেছে সেটা বার করা। সেটা জানতে পারলে খুনিকে ধরে ফেলা শক্ত হবে না। আমার একটা অনুমান আছে। তবে এখনই সেটা বলছি না।'

সেদিন বেশ রাত্তিরের দিকে সুভদ্রর ফোন এল। কেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। আদিত্য বসার ঘরে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'আদিত্যদা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?'

'না, না, ঘুমোইনি। তবে ঘুমোতে যাবার তোড়জোড় করছিলাম। আজ খুব ভোরে উঠেছিলাম তো। তাই ঘুম পেয়ে গেছে। তুমি বল। মনে হচ্ছে খবর আছে।'

'হ্যাঁ, কয়েকটা খবর দেবার ছিল। প্রথম খবর, খুন হওয়া মহিলাই শবনম । কানুকে মৃতদেহের ছবি দেখানো হয়েছিল। কানু সেটাকে শবনম বলে আইডেন্টিফাই করেছে। এবং তার পর থেকে কানু একেবারে ভেঙে পড়েছে। দ্বিতীয় খবর, শবনমের ছবি দেখে তাকে রূপলেখা দত্ত বলে অশনি রায় আইডেন্টিফাই করেছে।"

'বেশ, বেশ। তৃতীয় খবর?'

'তৃতীয় খবর, ক্যামেরার ছবিগুলো দেখা গেছে। খুনি মুখ ঢেকে ছিল। তবে কয়েকবার তার মুখ থেকে কাপড়টা সরে গিয়েছিল। তখন তার মুখটা দেখতে পেয়েছি। লোকটার নাম বিকাশ, সবাই বলে সাধু বিকাশ। পেশাদার খুনে। পুলিশ অনেক দিন বিকাশকে খুঁজছে। কিছু একটা পাবার জন্যে বিকাশ ওই মহিলার ওপর অকথ্য অত্যাচার করছিল। জিনিসটা একটা খাম। আলমারির ভেতরে একটা চোরা ড্রয়ারে লুকোনো ছিল।

ওই মহিলা কষ্ট সহ্য করতে না পেরে লুকোনো জায়গাটা বিকাশকে বলে দিতে বিকাশ খামটা হাতিয়ে নিয়ে চলে গেল। শবনম চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা ছিল। সেই অবস্থায় কাতরাতে কাতরাতে চেয়ার সুদ্ধু মাটিতে পড়ে গেল। ছটফট করতে করতে এক সময় স্থির হয়ে গেল। মনে হচ্ছে, সাধু বিকাশ শবনমকে খুন করতে চায়নি। কেবল ওই খামটা হাতাতে এসেছিল।'

'এই সাধু বিকাশ কি কানা মুমতাজের দলের লোক?'

'সেরকম কোনও ইনফরমেশন আমাদের কাছে নেই। সাধু বিকাশ কানা মুমতাজের দলের লোক হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, মুমতাজের গ্যাংটা প্রায় ভেঙেই গেছে। সেক্ষেত্রে এমন হতে পারে সাধু বিকাশ নিজের থেকেই কাজটা করেছে। হয়ত সে জানত শবনমের কাছে মূল্যবান কিছু আছে যেটা হাতাতে পারলে তার আখেরে লাভ আছে।'

'তোমরা কি অশনির সঙ্গে শবনমের ছবিগুলো শবনমের বাড়িতে পেয়েছ?' 'পাইনি। কোনও ছবিই পাইনি। অশনি বা অন্য কারও সঙ্গে শবনমের কোনও ঘনিষ্ঠ ছবিই আমরা পাইনি। সম্ভবত ছবিগুলোই বিকাশ নিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের আর একটু ভাল করে খুঁজতে হবে।'

'ঠিক আছে। এবার আমার কথাটা খুব মন দিয়ে শোনো। বলছিলাম না আমার একটা অনুমান আছে। সেই অনুযায়ী কিছু কিছু জায়গায় পুলিশ পাহারা বসাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'বেশ। আর কিছু?'

'হ্যাঁ। তোমাকে একদিন কষ্ট করে আবার কৃষ্ণনগর যেতে হবে। ঠিক কৃষ্ণনগর নয়, তার কাছে কৃষ্ণচন্দ্রপুরে, যেখানে সেন বেকারির আর একটা কারখানা ছিল এবং যেখানে রেখা দাস বলে মেয়েটি থাকত। ওখানে গিয়ে তমাল বিশ্বাস যে গল্পটা বলছে সেটা ভেরিফাই করতে হবে। ফিরে এসে আমাকে জানিও কী জানতে পারলে।' আরও কী কী করতে হবে সে ব্যাপারে এর পরের দশ মিনিট আদিত্য সুভদ্রকে কিছু নির্দেশ দিল।

পরের দিন অনেক বেলা অব্দি ঘুমোল আদিত্য। কেয়া স্কুলে বেরোনোর সময় ওকে ঘুম থেকে তুলে দিতে চেয়েছিল, আদিত্য বলেছে ও আজ বেরোবে না। আদিত্য যখন বিছানা ছেড়ে উঠল তখন দুপুর সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। তাও উঠতে ইচ্ছে করছিল না, কেয়া অন লাইনে কিছু একটা অর্ডার দিয়েছিল, সেটার ডেলিভারি এসেছে বলে উঠতেই হল। এই সময় আদিত্যরা কেউ বাড়ি থাকে না। তাই সাধারণত ডেলিভারিগুলো এরা নিচে দরোয়ানের কাছে রেখে যায়। হয়ত নিচে রেখে যাবার আগে একবার দেখে যায় বাড়িতে কেউ আছে কিনা।

আদিত্য প্যাকেটটা খাবার টেবিলে রেখে বাথরুমে ঢুকল। প্যাকেটটাতে কি আছে তার জানার উৎসাহ নেই। সম্ভবত, সাবান বা টুথপেস্ট কিংবা মেঝে পরিষ্কার করার কোনও লিকুইড। চিজ, টমেটো, পারসলি পাতা দিয়ে জম্পেস করে আদিত্য একটা ডবল ডিমের অমলেট বানাল, কেয়া উপস্থিত থাকলে নিশ্চয় দুটো ডিম খেতে দিত না। তারপর টোস্টারে দুটো পাঁউরুটি পুরে কেটলিতে কফির জল গরম করতে দিল। ব্রেকফাস্ট নাকি ব্রাঞ্চ ?

আপাতত আদিত্যর শুধু একটা কাজ বাকি আছে। সেটা দু'একদিন পরে করলেও চলবে। এখন সে প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে সুভদ্রর ফোনের জন্য অপেক্ষা করছে। সুভদ্রকে যে কাজগুলো করতে বলেছিল সেগুলো সে করতে পারল কি?

কেয়া ফোন করছে। 'তোমার শরীর খারাপ নাকি? বিছানা ছেড়ে উঠছিলে না কেন? কী ব্যাপার?'

'শরীর একদম ঠিক আছে। গতকাল ভাল ঘুম হয়নি তাই ঘুম পাচ্ছিল।' 'কিছু খেয়েছ?'

'অমলেট করে নিলাম একটা। আর টোস্ট।'

'এতে পেট ভরবে? বাড়িতে আছ যখন একটু ভাত খেলে পারতে। ভাত আর

মাছের ঝোল ফ্রিজে করা আছে। একটু গরম করে নিতে হবে।'

'ঠিক আছে। জানা রইল। এই তো সবে ঘুম থেকে উঠলাম। ব্রেকফাস্ট খেলাম। এবার চান করতে যাব। চান করে এসে যদি খিদে পায় তখন দেখা যাবে। তুমি কখন ফিরবে?'

'আজ পাঁচটার মধ্যে ফিরে আসব। টা টা।'

'টা টা।'

আদিত্য চান করে উঠে ল্যাপটপ খুলল। মেল চেক করল। কয়েকটা মেলের উত্তর দিল। খবর কাগজ পড়ল। গান শুনল। সুভদ্র ফোন করছে না। আদিত্য সুভদ্রর ফোনের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

কেয়া পাঁচটা বাজার কিছু আগেই ফিরে এল। আদিত্য কেয়ার সঙ্গে চা খেল। গল্প করল। কিন্তু তার মনটা সুভদ্রর ফোনের দিকে পড়ে আছে। দেখতে দেখতে সন্ধে সাতটা বেজে গেল সুভদ্রর ফোন এল না। আটটা বেজে গেল, ন'টা বেজে গেল। আদিত্য ভাবল নিজেই একবার সুভদ্রকে ফোন করবে। তারপর ভাবল থাক। সত্যি কোনও খবর থাকলে ও নিশ্চয় ফোন করত।

পরদিন সকাল সাড়ে ছ'টায় সুভদ্রর ফোন। 'আদিত্যদা খবর আছে। কাল অনেক রাত্তিরে খবরটা পেলাম তাই আর ফোন করিনি। টেলিফোনে সব কথা বলা যাবে না। আমি এই সাড়ে দশটার মধ্যে আপনার বাড়ি চলে আসছি। বেরিয়ে যাবেন না যেন।'

'আমার সেই ক্রোনোলজি অফ ইভেন্টস-এর কী হল? ওটা তৈরি করতে পারলে?' সাড়ে দশটা বললেও দশটার আগেই সুভদ্র চলে এসেছে। উত্তেজিত। ঘন্টা খানেক আলোচনা করার পর ঠিক হল আগামীকাল তারা উলুবেড়িয়া যাবে। মাস এবং বছর সহ ঘটনার তালিকা সুভদ্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

(২)

মৃত্তিকা মিত্রর মৃত্যুরহস্য সমাধান হয়ে যাবার পরে যখনই এই কেসটার কথা আদিত্য ভাবত তখনই তার মনে হত বোধহয় আর কোনও কেস-এ এত বেশিদিন ধরে সে ভুল রাস্তায় হাঁটেনি। বস্তুত, ভুল রাস্তাটা থেকে আদিত্য বেরোতেই পারত না, আর না বেরোতে পারলে রহস্যটারও সমাধান করতে পারত না, যদি না নেহাতই দৈবের বশে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা তার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিত। তার মানে তার নিজের কোনও কৃতিত্ব নেই। ভাবনাটা আদিত্যকে মাঝে মাঝে বিব্রত করে। তার থেকেও বড় কথা, তাকে বিনয়ী হতে বাধ্য করে। একটা গভীরতর প্রশ্ন উঠে আসে। আদিত্য ভাবে, ন্যায়বিচার হওয়াটা কি তা হলে নেহাতই কাকতালীয়? ভাগ্য নির্ভর? সে যেহেতু বিধাতার মঙ্গলসাধনে বিশ্বাস করে, তার ভাবতে ভাল লাগে আপতত যেটা কাকতালীয় মনে হচ্ছে তার পেছনে কোনও শুভশক্তি নিশ্চয় আছে। এসব কথা অবশ্য সে কোনও দিন কাউকে বলেনি। ব্যক্তিগত বিশ্বাস ব্যাপারটা এতটাই পবিত্র যে তার কথা কাউকে বলতে নেই ।

উলুবেড়িয়া ঘুরে আসার পরের তিন-চার দিন আদিত্য শুয়ে-বসে কাটাল। ঘুমিয়ে রইল বেলা আটটা অব্দি, দেরি করে আপিস গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ইন্টারনেটে খবর কাগজ পড়ল। গান শুনল সন্ধে পর্যন্ত। সুভদ্রর দেওয়া ঘটনাক্রমের বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বিবরণটি এইরকমঃ

তারিখসহ কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী

মে ২০১০	অশনি রায়ের মায়ের মৃত্যু
নভেম্বর ২০১০	মনোময় দাসের মৃত্যু
জানুয়ারি ২০১১	বনানী দাস মামলা করল
ফেব্রুয়ারি ২০১১	হার্টকেয়ার নার্সিং হোম থেকে মৃত্তিকা মিত্রর চাকরি গেল
অক্টোবর ২০১৩	লোয়ার কোর্টে বনানী দাসের পরাজয়, হাই কোর্টে আপিল
সেপ্টেম্বর ২০১৫	পুরোনো বান্ধবী অন্বেষার সঙ্গে অশনির ছাড়াছাড়ি
অক্টোবর ২০১৫	গ্লোবাল ট্রেডিং-এ মৃত্তিকার চাকরি শুরু
ডিসেম্বর ২০১৫	হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে বনানী দাসের পরাজয়
জুন, ২০১৬	রূপলেখার সঙ্গে অশনির প্রথম দেখা
ফেব্রুয়ারি ২০১৯	মৃত্তিকা ও পার্থ মিত্রর হত্যা
ফেব্রুয়ারি ২০১৯	অশনি গ্রেপ্তার
জানুয়ারি ২০২২	হাই কোর্ট সিঙ্গল বেঞ্চে অশনি বেকসুর খালাস
মার্চ ২০২২	দুর্ঘটনায় অরুণকান্তির মৃত্যু
এপ্রিল ২০২২	অশনি আদিত্য মজুমদারের চেম্বারে এসে সাহায্য চাইল

এর মধ্যে একদিন সুভদ্র ফোন করেছিল।

‘কাল কৃষ্ণচন্দ্রপুর ঘুরে এলাম আদিত্যদা।'

‘কী জানতে পারলে?”

‘তমাল বিশ্বাসের কাহিনিটা সত্যি হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।'

'কেন?'

“ওখানে গিয়ে জানলাম রেখা দাসের চরিত্রটা ভাল ছিল না। স্বামী বেঁচে থাকতেই সে নানা রকম লোকের সঙ্গে লটঘট করত। স্বামী মারা যাবার পর একেবারে মরিয়া হয়ে যায়। পুলিশ রিপোর্ট বলছে মেয়েটা মারা যাবার সময় প্রেগনেন্ট ছিল। তবে সেটা শুভব্রত সাহার দ্বারাই কিনা বলা শক্ত।'

‘মেয়েটা কি সুইসাইডই করেছিল?”

‘সেটাও পরিষ্কার নয়। মেয়েটার পেটে এবং একটা গ্লাসে ঠাণ্ডা পানীয়র সঙ্গে বিষ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেটা সে নিজেই খেয়েছিল না কেউ তাকে খাইয়ে দিয়েছিল সেটা স্পষ্ট নয়।'

মৃত্তিকার মৃত্যুরহস্য নিয়ে অশনি রায় আদিত্যর কাছে এসেছিল চৈত্র মাসের শেষ দিকে। আর এখন ভরা শ্রাবণ। আদিত্যর মনে হচ্ছে এতদিনে সেই রহস্যের সে সমাধান করতে পেরেছে। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি সারাদিন ধরে ঝরছে। গাছের পাতাগুলো সবুজ হয়ে উঠেছে। আদিত্য আমীর খাঁর মিয়া মল্লার শুনছিল। ১৯৫৮ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে গাওয়া। ইউ টিউবে আছে। সেই পুরোনো গান, করিম নাম তেরো। এত শান্তি, এত শান্তি আমীর খাঁর গানে, ঈশ্বরের মঙ্গলসাধনে বিশ্বাস না করে উপায় কী?

চার দিনের দিন খবর এল। আদিত্য এই খবরটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। এর পর গৌতমকে ফোন করে রহস্যের যবনিকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। খবরটা গৌতম নিশ্চয় আদিত্যর আগেই পেয়ে গেছে।

বিকেলের দিকে গৌতম নিজেই ফোন করেছে।

“তোর লোক কাল রাত্তিরে ধরা পড়েছে।'

‘জানি। সুভদ্র খবর দিয়েছে। তবে ডিটেলটা বলতে পারেনি। কোনও ক্যাজুয়ালটি হয়নি তো?'

'হয়নি মানে? আমাদের দুজন জখম। একজন কনসটেবল, একজন এ এস আই। দু'জনেরই গুলি লেগেছে। এ এস আই-এর অবস্থা সঙ্কটজনক। তোর লোকটাকে ঠিক শান্তশিষ্ট বলা চলে না।'

'আমি তো বলেই দিয়েছিলাম লোকটা বিপজ্জনক। যাক গে, ধরা তো পড়েছে। আমি বলছিলাম কী, কাল দুপুরে তোর অফিসে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করতে পারবি ? যবনিকা উত্তোলনের সময় হয়েছে।'

'অবশ্যই পারব। কাল আমার কোনও কাজ নেই। বড় কর্তা দিল্লি গেছেন। অতএব যখন তখন ডাক পড়বে না।'

'সেন বেকারির পল্লব সেন এবং প্রণব মাইতি বেল-এ আছে তো। তাদের নিশ্চয় মাঝে মাঝে থানায় হাজিরা দিতে হয়। কাল দুপুরে ওদের দু'জনকে লালবাজারে উপস্থিত থাকতে বলবি। আর সপুত্র অসীমাভ রায়ও যেন হাজির থাকেন। কানু এবং উকিল সজল নন্দীকেও থাকতে হবে। হয়ত তাদের দিয়ে একটা স্বীকারোক্তি করাতে হতে পারে। আর, লাস্ট বাট নট দ্য লীস্ট, তপস্বিনী করুণা, যাঁর সংসার-জীবনের নাম বনানী দাস, আমাকে কথা দিয়েছেন আসবেন। তিনি সরাসরি আমার বাড়িতে আসবেন, আমি তাঁকে সঙ্গে করে লালবাজার নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দুটোর সময় মিটিংটা রাখছি। লাঞ্চের ঠিক পরে। ঘন্টা দুয়েক-এ হয়ে যাবে আশা করি।'

'মনে হয় হয়ে যাবে। দেখা যাক। '

'আমার বিশ্বাস মৃত্তিকা মিত্র এবং তার স্বামী পার্থ মিত্রর মার্ডার কেসটা আমি সলভ করে ফেলেছি। আমার তদন্ত থেকে যেটা পেয়েছি সেটা আপনাদের বলব । কিন্তু তার আগে বলে নিই এখানে একাধিক কাহিনি জড়িয়ে আছে। সেগুলোও আমাকে বলতে দিতে হবে। একটা, বলাই বাহুল্য, মৃত্তিকা-পার্থর কাহিনি, কিন্তু সেটা ছাড়াও প্রাসঙ্গিকভাবে আরও দুটো গল্প এখানে এসে পড়বে।' আদিত্য থামল।

ঘরে অনেক মানুষ থাকা সত্ত্বেও শ্মশানের নীরবতা। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে আদিত্য আবার বলতে শুরু করল।

'মাস তিনেক আগে, রোদ্দুরে পুড়ে যাওয়া এক চৈত্র মাসের বিকেলে অশনি রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। মৃত্তিকা মিত্র, পার্থ মিত্র মামলার আসামী। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে বেকসুর খালাস হয়ে সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু পুলিশ কেসটা নিয়ে খুব শিগগির ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করবে এমন একটা খবর হাওয়ায় ভাসছে। তাই আমার বন্ধু অ্যাডিশানাল কমিশানার গৌতম দাশগুপ্ত আমার কাছে অশনিকে পাঠিয়েছে। আমি যদি অশনির সপক্ষে কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারি, ভবিষ্যতে কেসটা আবার আদালতে উঠলে মামলার সুবিধে হবে। আর আমি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ মৃত্তিকার আসল খুনিকে ধরে দিতে পারি তাহলে তো কথাই নেই। সেক্ষেত্রে হয়ত পুলিশ কেসটাই আর আদালতে তুলবে না। গৌতমের বিশ্বাস অশনি খুনটা করেনি। পরে সুভদ্র মাজির সঙ্গে কেসটা নিয়ে কথা হল । প্রাথমিক তদন্তটা সে-ই করেছিল। সুভদ্রও বলল তার বিশ্বাস অশনি খুনটা করেনি। বলে রাখি, গৌতম এবং সুভদ্রর বিবেচনার প্রতি আমার গভীর আস্থা।'

গৌতম মুচকি মুচকি হাসছে। সুভদ্রর মুখ গম্ভীর।

'গৌতমের বিশ্বাসটা ছিল একটা গাট ফিলিং, যদিও তার পেছনে কিছু যুক্তিও ছিল। সুভদ্রও তার বিশ্বাসের সপক্ষে কয়েকটা যুক্তি দিল। গৌতম এবং সুভদ্রর যুক্তিগুলো উড়িয়ে দেবার মতো নয়। এক নম্বর যুক্তি, মৃত্তিকা এবং তার স্বামীর আঘাতের চিহ্নগুলো দেখে মনে হয় খুনগুলো কোনও প্রফেশানাল অ্যাসাসিনের কাজ। দ্বিতীয়ত, একটা সিসি টিভির ফুটেজে দেখা গিয়েছিল খুনের কিছু পরে কেউ একজন বাড়ির পাঁচিল টপকে পালাচ্ছে। তৃতীয়ত, অশনিকে খুনি প্রমাণ করার ব্যাপারে পুলিশের ওপর একটা অদৃশ্য চাপ ছিল। সেটা আপাতত আসছিল সম্ভবত কোনও রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে। কিন্তু সেই নেতা কার কথায়

চাপটা দিচ্ছিলেন সেটা অজানা। চতুর্থত, অরুণকান্তি ব্যানার্জী, যিনি অশনির কেসটা লড়েছিলেন, হঠাৎ রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন। এটা কাকতালীয় নাও হতে পারে। সব মিলিয়ে আমিও প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করে ফেললাম অশনি রায় খুন করেনি।'

কথাগুলো বলে আদিত্য অশনির দিকে তাকাল। সে তার বাবার পাশে বসে মগ্ন হয়ে আদিত্যর কথা শুনছে। আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। পরের কথাগুলোর জন্যে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে। জানলায় শ্রাবণ মাসের দুপুর। রোদ্দুর নেই। মেঘে ঢাকা চিৎপুর। একটা ফাঁকা ট্র্যাম ঘন্টি বাজাতে বাজাতে নাখোদা মসজিদের দিকে চলে গেল। ট্র্যামরাস্তার ধারে সামান্য জল জমে আছে। আদিত্যর মনে পড়ে গেল হুতোমের সেই উক্তি, আকাশে মেঘ করলে চিৎপুরে জল জমে ।

আদিত্য আবার বলতে শুরু করেছে।

'আমি প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করলাম বটে অশনি খুন করেনি, কিন্তু কোথাও একটা খটকা রয়ে গেল। অশনিকে দেখে মনে হল ও পুরোটা সত্যি কথা বলছে না। অর্ধসত্য বলছে। এটা একটা ইনটুইশান, এমন একটা অনুভূতি যেটা চট করে ব্যাখ্যা করা যায় না। অবশ্য এই রকম মনে হবার পেছনে একটা কারণও ছিল। প্রথম দিন থেকেই অশনিকে আমার অতি-নাটকীয় মনে হচ্ছিল। যেন জোর করে অপ্রকৃতিস্থ হবার ভান করছে। হঠাৎ সব ভুলে যাচ্ছে, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সব মিলিয়ে ওর হাবভাবটা মনে হচ্ছিল বানানো। কিছু একটা লুকোনোর থাকলে তবেই মানুষ এরকম অভিনয় করে। যাই হোক, ব্যাপারটা আমি তখনকার মতো মনে মনে দূরে সরিয়ে রাখলাম। কারণ আরও প্রাথমিক একটা প্রশ্নের উত্তর আমাকে খুঁজতে হচ্ছিল।

'প্রশ্নটা এইরকম। যদি পুলিশের গল্পটা ঠিক না হয়, অর্থাৎ যদি ধরে নিই, পার্থ মিত্র তার স্ত্রী মৃত্তিকাকে এবং অশনি রায় তার প্রেমিকার স্বামী পার্থ মিত্রকে খুন করেনি, তাহলে প্রশ্ন হল, আসল খুনি কি দু'জনকেই খুন করতে চেয়েছিল? নাকি দু'জনের মধ্যে একজনকে? আর অন্যজন ওখানে ছিল বলে তাকেও খুন করতে বাধ্য হয়েছিল। মনে হল, দ্বিতীয়টা হবার সম্ভাবনাই বেশি। পার্থ এবং মৃত্তিকার মধ্যে একজনকে খুন করাটাই খুনির মূল উদ্দেশ্য ছিল। কাকে? আমার আরও মনে হল, পার্থকে খুন করাটাই খুনির মূল উদ্দেশ্য ছিল। মৃত্তিকাকে নয়। মৃত্তিকাকে খুন করা হয়েছিল কারণ সে অকুস্থলে উপস্থিত ছিল এবং খুনি কোনও সাক্ষী রাখতে চায়নি। আমার কেন এমন ধারণা হল খুলে বলছি। কিন্তু তার জন্যে আর একটা কাহিনি বলতে হবে।'

আদিত্য চায়ের কাপে চুমুক দিল। আবার বাইরে তাকাল। কিছুক্ষণ চুপ করে রয়েছে । 'আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। আমার পেশেন্টরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। এরা বহুদিন আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। এদের দিকটা একটু ভেবে দেখুন।' ডাঃ অসীমাভ রায় খানিকটা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন।

'ডাঃ রায়, আপনাকে অসুবিধের মধ্যে ফেলে দেবার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' আদিত্য দু'হাত জড়ো করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করল। 'কিন্তু আপনিও একটু ভেবে দেখুন, এটা আপনার ছেলের জীবন-মরণের ব্যাপার। কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনার এখানে থাকাটা সত্যিই জরুরি। না হলে আপনাকে আটকাতাম না। আমরা জানি আপনার সময়ের কতটা দাম। কিন্তু আজ প্লিজ আমাদের একটু সময় দিন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ডাঃ অসীমাভ রায় পকেট থেকে মোবাইল বার করে একটা নম্বর টিপলেন। মনে হয় ওঁর সেক্রেটারির নম্বর। 'আমার পেশেন্টদের বলে দাও আজ আমার চেম্বারে পৌঁছতে ঘন্টা দুয়েক দেরি হবে। ওরা একটু ঘুরে আসতে পারেন।'

ডাঃ অসীমাভ রায় মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখার পর আদিত্য আবার শুরু করল।

'হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম। আমার মনে হল, খুনির মুখ্য ভিকটিম ছিল পার্থ মিত্র। এই রকম মনে হওয়ার পেছনে আর একটা গল্প আছে। অশনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার কয়েকদিন পরে একটা রবিবারে আমি অশনির বাবার সঙ্গে ওদের বাড়িতে দেখা করতে গেলাম। সেদিনই বিকেলবেলা আমার স্ত্রী কেয়ার কাছে একটা ফোন এল। ওদের স্কুলের ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট অমলা তরফদারের ছেলে জয় তরফদার ড্রাগ ওভারডোজের ফলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিন্তু পুলিশি ঝামেলার ভয়ে কোনও হাসপাতাল বা নার্সিং হোম তাকে ভর্তি করছে না। আমরা যদি একটু সাহায্য করতে পারি। আমি গিয়ে ছেলেটাকে একটা নার্সিং হোমে ভর্তি করাতে পারলাম। সে যাত্রা ছেলেটা বেঁচে গেল। শশীধর মিশ্র বলে যে অফিসার কেসটা হ্যান্ডেল করছিলেন তিনি বললেন ইদানীং সারা পশ্চিমবঙ্গে ড্রাগ পেডলিং-এর সমস্যা হঠাৎ বেড়ে গেছে। এর কিছুদিন পরে আমার বন্ধু গৌতম দাশগুপ্ত আমাকে একই কথা বলল। বলল, পশ্চিমবঙ্গে এখন দুবে বলে কোনও এক ব্যক্তির গ্যাং ড্রাগের বাজারটা দখল করে নিয়েছে। এদের একটা রাইভাল গ্যাং-ও আছে, ইসমাইলের গ্যাং, কিন্তু তারা ফ্রিঞ্জে রয়েছে, মূল বাজারে ঢুকতে পারছে না। ইসমাইল সম্বন্ধে পুলিশ কিছুটা জানলেও দুবে সম্বন্ধে তাদের কোনও ধারণাই নেই। লোকটা সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে আছে। তাকে কেমন দেখতে, তার কত বয়েস, সবই অজানা। আমি এই হঠাৎ বেড়ে যাওয়া ড্রাগ পেডলিং-এর ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করার দায়িত্ব ফর্মালি গ্রহণ করলাম।

'দুবের গ্যাং-এর মূল অ্যাডভান্টেজ হল ওদের ডিসট্রিবিউশান নেটওয়ার্ক। কী ভাবে ড্রাগটা নেশাখোরদের কাছে পৌঁছচ্ছে, পুলিশ কিছুতেই তার হদিশ পাচ্ছিল না। অমলা তরফফার আমাকে একটা কথা বলেছিল যার তাৎপর্য তখন বুঝতে পারিনি । পরে একটু একটু করে বুঝতে পেরেছিলাম। অমলা তরফদার বলেছিল তার ছেলে জলখাবারে শুধু পাঁউরুটি খায়। মুড়ি, হাতরুটি এসব কিচ্ছু খায় না। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম জয় যে পাঁউরুটিটা খায় সেটা সেন বেকারির আনস্লাইসড কোয়ার্টার পাউন্ড লোফ। ওটা আসে জয়দের বাড়ির নিচের চায়ের দোকান থেকে।'

'আমাদের পাঁউরুটির গল্প শোনাবার জন্যে এখানে এতক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়েছে?' কানু হঠাৎ গর্জন করে উঠেছে।

'একটু পরেই বুঝতে পারবে কেন তোমাদের এখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এখন একদম চুপ করে বোসো। আবার গলার আওয়াজ শুনলে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে মুখে সেলোটেপ আটকে বসিয়ে রাখব।' গৌতম আরও জোরে গর্জন করে উঠল।

কানু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। উকিল সজল নন্দী তাকে হাত ধরে নিরস্ত করল। আদিত্য আবার বলতে শুরু করল।

'কিছুদিন পরে জয় তরফদার মারা গেল। মৃত্যুর কারণ সেই ড্রাগ ওভারডোজ। প্রশ্ন হল, জয় ড্রাগটা পাচ্ছিল কোথা থেকে? সে তো সারাদিন ঘরে বন্দি হয়ে থাকত। কিন্তু আমরা তার ঘরের দেয়ালে আলগা প্লাস্টার সরিয়ে তার আড়াল থেকে প্লাস্টিকে মোড়া হেরোইনের প্যাকেট পেয়েছি। আর একটা প্রশ্ন, ড্রাগের জন্যে সে পয়সা দিচ্ছিল কী ভাবে? তার নিজের রোজগার তো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

'দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা খুব সহজে পেয়ে গেলাম। এবং তার সূত্র ধরে প্রথম প্রশ্নের উত্তরটাও। অমলা তরফদার ঘুগনি-পাঁউরুটি কেনার টাকা দিত না। সে জানাল, নিচের চায়ের দোকান, যেখান থেকে জয়ের ঘুগনি-পাঁউরুটি আসত, সেখানে বেশ কিছু টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া ছিল। জয়ই এক সময় দিয়েছিল। ঘুগনি-পাঁউরুটির জন্যে কেউ অ্যাডভান্স দেয়? আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম ঘুগনি পাঁউরুটির মধ্যে দিয়ে হেরোইন আসত। কিন্তু ঘুগনির মধ্যে দিয়ে হেরোইন আসা সম্ভব নয়। এইভাবে হেরোইন পাঠাতে হলে অসংখ্য চা-ওলার হাতে হাতে হেরোইন দিয়ে আসতে হবে যাতে তারা সেটা ঘুগনিতে মিশিয়ে বিক্রি করতে পারে। ড্রাগ ডিসট্রিবিউশনের পক্ষে এটা খুবই আনাড়ি একটা উপায়। দুবে গ্যাং-এর দক্ষতার সঙ্গে এটা আদৌ যায় না।

তাছাড়া হেরোইন ঘুগনির সঙ্গে মিশলে তার কতটা পোটেন্সি থাকে তা নিয়েও সন্দেহ আছে। সব থেকে বড় কথা, ড্রাগটা যে ছোট ছোট প্লাসটিকের প্যাকেটে ডিসট্রিবিউটেড হয় সেটা আমরা জয় তরফদারের ঘরেই তো দেখতে পেলাম। ঘুগনি বাদ দিলে পড়ে থাকে পাঁউরুটি। বেক করার সময় কোয়ার্টার পাউন্ড আনস্লাইসড লোফের মধ্যে একটা হেরোইনের প্যাকেট ভরে দেওয়া খুবই সহজ কাজ। কিন্তু তার জন্যে সেন বেকারিকেও এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। তাই না প্রণববাবু?'

প্রণব মাইতি মুখ নিচু করে আছে। পল্লব সেনের মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো কালো।

'আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে সেন বেকারির আনস্লাইসড পাঁউরুটি ছাড়া কিছু ঢুকতোই না। আহা, কী স্বাদ ছিল সেই পাউরুটিতে। অথচ আমাদের পাড়ার দোকানদার বাবলু বলল আজকাল সেন বেকারির পাঁউরুটি কেউ কেনেই না। সেন বেকারির পাঁউরুটির থেকে নাকি দেড় ইঞ্চির মরা আরশোলা বেরিয়েছে। আমাদের আপিসের দরোয়ান শ্যামলও বলল পাতাখোর কিংবা মাতাল ছাড়া সেন বেকারির পাঁউরুটি আজকাল আর কেউ খায় না। তার মানে কম্পানিও ভাল চলার কথা নয়। অথচ সেন বেকারির মালিক পল্লব সেনের সঙ্গে আলাপ হবার পর দেখলাম তাঁর জীবনযাত্রায় ঠাটবাটের অভাব নেই। পক্ষী নিরীক্ষণ করে এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনে তিনি যথেষ্ট বিলাসিতার মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন। প্রশ্ন হল, সেন কম্পানির পাঁউরুটি যদি না চলে তা হলে তাঁর বিলাসিতার অর্থটা আসছে কোথা থেকে?'

পল্লব সেন কিছু একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন।

গৌতম বলল, "আমরা খবর নিয়ে দেখেছি পল্লব সেন নামেই এম ডি। ব্যবসা চালায় জেনারেল ম্যানেজার প্রণব মাইতি। আমার মনে হয় উনিই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। তবে আইনের হাত থেকে পল্লব সেনও রেহাই পাবেন না।' 'আপনি যে অভিযোগ করলেন সে ব্যাপারে আপনার কাছে কোনও প্রমাণ আছে?' প্রণব মাইতি ঠাণ্ডা গলায় বলল।

'আছে বৈকি। নিশ্চয় আছে। প্রমাণ ছাড়া এত বড় অভিযোগ করা যায়? আমরা সেন বেকারির কয়েকটা পাঁউরুটি ভর্তি ট্রাক আটক করেছি। দু'ধরনের পাঁউরুটি পাওয়া গেছে। ওপর ওপর দুটোর মধ্যে খুব সূক্ষ্ম তফাত। দু'ধরনের পাঁউরুটির প্যাকেটেই মাথায় টুপিওলা বেকারের ছবি। কিন্তু একটাতে বেকারের গোঁফ আছে, আর একটাতে নেই। গোঁফওলা বেকারের ছবি দেওয়া পাঁউরুটিগুলোর ভেতরে হেরোইনের প্যাকেট পাওয়া গেছে। এর বেশি প্রমাণ আর কি দরকার আছে?'

প্রণব মাইতি এবং পল্লব সেন দুজনেই চুপ করে রইল।

আদিত্য বলল, "কিছুদিন আগে আপনাদের রাইভাল গ্যাং আপনাদের ফ্যাক্টরির সামনে থেকে একটা ট্রাক লুট করেছিল। সেটা পাঁউরুটির জন্যে নয়, পাঁউরুটির ভেতরের জিনিসটার জন্যে। তাই না?'

প্রণব মাইতি এখনও চুপ। পল্লব সেন বলল, 'আমি কিন্তু এসব কিছুই জানতাম না।' তার কথার উত্তর না দিয়ে আদিত্য আবার বলতে শুরু করেছে।

'ড্রাগ পেডলিং-এর ব্যাপারে আমাদের আরও কিছু বলার আছে, কিন্তু আপাতত পার্থ মিত্র, মৃত্তিকা মিত্রর হত্যারহস্য প্রসঙ্গে ফিরে আসি। পার্থ মিত্রর কম্পানি সেন বেকারির হেরোইন পোরা পাঁউরুটি বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট করত। অর্থাৎ ড্রাগ ব্যবসার সঙ্গে পার্থ মিত্রর কম্পানি আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ছিল। ড্রাগ মাফিয়াদের মধ্যে যথেষ্ট রেশারেশি আছে, তার জেরে মাঝে মধ্যেই লাশ-টাস পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে হল, পার্থ মিত্রর মৃত্যুটা এই রকমই একটা ড্রাগ রিলেটেড মার্ডার। হয়ত ইসমাইলের গ্যাং-এর কেউ পার্থকে মেরেছিল। কিংবা হয়ত পার্থ টাকার লোভে ইসমাইলের কাছে তার দলের কিছু গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছিল। এবং সেটা জানতে পেরে দুবের লোকই পার্থকে মেরে ফেলেছিল। যেটাই হোক, আমি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলাম খুনির প্রাইমারি টার্গেট ছিল পার্থ মিত্র। মৃত্তিকার খুনটা ইনসিডেন্টাল, ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া।'

'কিন্তু তা হলে এর মধ্যে অশনি রায় এল কী করে?' সুভদ্র খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। একেবারে সঠিক প্রশ্ন। সেই প্রশ্নেরই এবার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে একটু চা পাওয়া যাবে? গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে।' আদিত্যর শেষের কথাগুলো গৌতমকে লক্ষ করে।

'চা আসছে। বলে দিচ্ছি।' গৌতম তার টেবিল-সংলগ্ন কলিং বেলটা বাজাল।

(৩)

আদিত্য জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিচে, চিৎপুর রোডে, মস্ত ট্র্যাফিক জ্যাম। টিকি খুলে গিয়ে একটা ট্র্যাম রাস্তার মাঝখানে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার পেছনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে লরি-বাস-ঠেলাগাড়ি। এগোনোর উপায় নেই জেনেও কেউ কেউ ক্রমাগত হর্ন দিয়ে যাচ্ছে। কেউ অকারণে চেঁচাচ্ছে। ট্র্যামের কনডাকটার গাড়ি থেকে নেমে ওভারহেড তারের সঙ্গে ট্র্যামের বিচ্ছিন্ন টিকিটার সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে। কিছু লোক তাকে উচ্চকণ্ঠে উৎসাহ দিচ্ছে। সব মিলিয়ে তুমুল হট্টগোল। আদিত্য ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। একেবারে উল্টো ছবি। শান্ততা। কেউ কেউ চাপা গলায় কথা বলছে। বাকিরা চুপ করে আছে। চা এসে গেল।

'অশনি রায় কীভাবে মৃত্তিকার সঙ্গে যুক্ত হল সেটা জানার আগে বোঝা দরকার সেন বেকারি কী করে হেরোইনের জন্য পেমেন্ট করত।' আদিত্য চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে আবার শুরু করল। 'হেরোইনটা সম্ভবত আসত সেন্ট্রাল অ্যামেরিকার কোনও দেশ থেকে। নিউ ইয়র্ক থেকে সেই কনসাইনমেন্টের পেমেন্ট হতো। পেমেন্টের উপায়টা বেশ অভিনব। ড্রাগের টাকা পেমেন্ট করার জন্যে সেন বেকারি শাড়ির ব্যবসায় নেমেছিল। গ্লোবাল ট্রেডিং কম্পানি বলে একটি সংস্থার মাধ্যমে তারা নিউ ইয়র্কে শাড়ি রপ্তানি করত। গ্লোবাল ট্রেডিং অন্য আরও অনেক শহরে শাড়ি রপ্তানি করত বটে কিন্তু সেন বেকারির থেকে কেনা শাড়িগুলো শুধুমাত্র নিউ ইয়র্কের ওই বিশেষ কম্পানিটিকেই বিক্রি করত। এবং লক্ষ্যনীয় হল, বাজারে শাড়ির যা দাম তার অর্ধেকেরও কম দামে নিউ ইয়র্কের ওই কম্পানিটিকে শাড়িগুলো বিক্রি করা হতো। বাকি টাকাটা নিউ ইয়র্কের ওই কম্পানি হেরোইনের দাম বাবদ সেনট্রাল অ্যামেরিকায় পাঠিয়ে দিত।

'হেরোইনটা সম্ভবত ইস্টের সঙ্গে নদীপথে বাংলাদেশ থেকে আসত। একবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে গিয়ে শুভব্রত সাহাকে দেখতে পেয়েছিলাম। শুভব্রতর ছবি আমি অনন্যা সাহার ড্রয়িংরুমে একবার মাত্র দেখেছিলাম। তাই ডায়মন্ডহারবারে তাকে দেখে প্রথমটা চিনতে পারিনি। যাই হোক, আমার ধারণা শুভব্রত জানত ইস্টের সঙ্গে সঙ্গে সে সেন বেকারির ফ্যাক্টরিতে হেরোইনও পৌঁছে দিচ্ছে। এটা নিয়ে তার টেনশন ছিল। রাত্তিরে ঘুম হতো না।'

'এই ট্রানজাকশনের ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছে আদিত্যদা। আর একটু বুঝিয়ে বলবেন?' সুভদ্র বলল।

'একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি। ধরো নিউ ইয়র্কে একটা বালুচরী শাড়ির দাম আড়াইশ ডলার। সেন বেকারি সেটা গ্লোবাল ট্রেডিং-এর মাধ্যমে নিউ ইয়র্কের ওই কম্পানিকে একশ ডলারে বিক্রি করল। অর্থাৎ শাড়ি পেয়ে নিউ ইয়র্কের ওই কম্পানি গ্লোবাল ট্রেডিংকে দিল একশ ডলার, যার থেকে কুড়ি ডলার কমিশন কেটে নিয়ে গ্লোবাল ট্রেডিং সেন বেকারিকে দিল আশি ডলার। সেন বেকারি নিশ্চয় নিউ ইয়র্কের ওই কম্পানিটাকে খয়রাতি করবে না। তা হলে প্রশ্ন হল, আড়াইশ ডলারের দেড়শ' ডলার গেল কোথায়? বস্তুত, নিউ ইয়র্কের ওই কম্পানি বাকি দেড়শ ডলার পাঠিয়ে দিল সেন্ট্রাল অ্যামেরিকায় হেরোইন প্রস্তুতকারকদের কাছে। তারা তখন দেড়শ' ডলারের হেরোইন চোরাপথে, বাংলাদেশ থেকে নদীপথে, সেন বেকারির কাছে পৌঁছে দিল।

'চমৎকার, চমৎকার। তা তুই এই চেনটা ধরলি কী করে?' গৌতম অভিভূত। 'এমনিতে ধরতে পারতাম না। গ্লোবাল ট্রেডিং-এর হিসেবপত্র ভাল করে দেখেও ধরতে পারতাম না। তারপর একদিন কেয়ার জন্যে শাড়ি কিনতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম সেন বেকারির থেকে কেনা শাড়িগুলো গ্লোবাল আশ্চর্য কম দামে নিউ

ইয়র্কে বিক্রি করছে। অন্য শহরে কিন্তু সেন বেকারির থেকে কেনা শাড়িও বিক্রি করছে না, আবার কম দামও নিচ্ছে না।'

'আচ্ছা, আদিত্যদা, এই ট্র্যানজ্যাকশনটা নিশ্চয় কোনো ব্যাঙ্ক দিয়ে হতো। তা হলে কেউ এটা লক্ষ করল না কেন ?

'একদম ঠিক জায়গায় ধরেছ। ব্যাঙ্কের চোখ এড়িয়ে দিনের পর দিন এই আন্ডার-ইনভয়েসিংটা করা সম্ভব নয়। এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে ব্যাঙ্কের কাউকে থাকতেই হবে। অশনি রায়ের ব্যাঙ্কে গ্লোবালের অ্যাকাউন্ট ছিল। এটা তো হতেই পারে, এই ট্র্যানজ্যাকশনটার মধ্যে অশনিও ছিল এবং তার লিঙ্ক ছিল মৃত্তিকা। ভুললে চলবে না, মৃত্তিকা গ্লোবাল ট্রেডিং-এই কাজ করত। ধরা যাক, বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বলে দুবে পার্থকে খুন করতে চেয়েছিল এবং তার সঙ্গে তার বউকেও, যে কিনা গ্লোবাল ট্রেডিং সংক্রান্ত লেনদেনের ব্যপারটা জানত। কিন্তু অশনিও তো ওই ব্যাপারে খানিকটা ওয়াকিবহাল ছিল। তাকে ছেড়ে রাখা যায় না। তাই তাকে পার্থর খুনে ফাঁসানো হল। খুন দুটো এমনভাবে করা হল যাতে মনে হয় পার্থ রাগের মাথায় মৃত্তিকাকে খুন করেছে এবং পার্থকে খুন করেছে অশনি। এতে অশনিকে জেলে পোরা হল আবার ওই জোড়া খুনের জন্য একটা বলির পাঁঠাও তৈরি হল। দুবে ধরে নিয়েছিল, অশনি কখনই ওই বেআইনি ট্রানজ্যাকশনটার কথা পুলিশের কাছে বলবে না। বললে সে নিজেই আরও ফেঁসে যাবে।'

'চুপ করুন। এগুলো মিথ্যে কথা। আপনি বানিয়ে বানিয়ে বলছেন। আমি কোনও দিন কোনও শেডি ডিলের মধ্যে থাকিনি।' অশনি রায় হঠাৎ প্রতিবাদ করে উঠল।

'আপনি এসব কী যা তা বলছেন? আমার ছেলে হঠাৎ কেন ওসব করতে যাবে? ওর কি টাকার অভাব?' অসীমাভ রায়ও রুখে উঠেছেন।

'আপনারা দয়া করে একটু ধৈর্য ধরে বসুন। আমার বলা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। আমি এখন অব্দি একটা সম্ভাবনার কথা বলেছি। এই সম্ভাবনাটা অবশ্যই আর একটু খতিয়ে দেখব। বিশেষ করে যখন আপনারা এত আপত্তি করছেন। কিন্তু তার আগে আমার গল্পটা শেষ করতে দিন। প্লিজ।'

বাবা-ছেলে গুম হয়ে বসে রইল। আদিত্য আবার বলতে শুরু করল।

'আর একটা গল্প আছে। রূপলেখা দত্তর গল্প। অশনির পুরোনো বান্ধবী তাকে ছেড়ে চলে যাবার পর রূপলেখা দত্ত বলে এক মহিলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। মহিলা বলেছিলেন তিনি বিবাহিতা। তবু অশনি মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। অশনির কথা অনুযায়ী, যে রাত্তিরে মৃত্তিকা এবং পার্থ খুন হয়, সেই রাত্তিরে বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ-এর ওই বাড়িটাতে রূপলেখা অশনিকে ডেকেছিল। অশনি জানত ওটাই রূপলেখার বাড়ি। গিয়ে দেখে একটি নারী ও একটি পুরুষ খুন হয়ে পড়ে আছে। অশনির বয়ান অনুযায়ী মেয়েটি তার অল্প চেনা এবং পুরুষটি সম্পূর্ণ অচেনা। ওই খুনের ঘটনার পর থেকে রূপলেখা দত্ত সম্পূর্ণ নিখোঁজ হয়ে যায়।'

আদিত্য খেয়াল করল অশনি এবং তার বাবা খুব মন দিয়ে তার কথা শুনছে। 'আমরা রূপলেখা দত্তর রহস্য সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছি। রূপলেখার আসল নাম শবনম। সে একজন দেহোপজীবিনী। দু'-দুবার মামলায় হেরে গিয়ে বনানী দাস মরিয়া হয়ে তাকে নিযুক্ত করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, শবনম রূপলেখা সেজে অশনির ঘনিষ্ঠ হয়ে কিছু নোংরা ছবি তুলবে যাতে অশনিকে পরিষ্কার দেখা যাবে কিন্তু শবনমকে দেখা যাবে না। পরে এই ছবিগুলো দিয়ে অশনির বাবাকে অপদস্থ করা হবে। ঠিক বলছি তো দিদি?'

শেষের কথাগুলো আদিত্য তপস্বিনী করুণা ওরফে বনানী দাসের উদ্দেশে বলল। তপস্বিনী করুণা এতক্ষণ চুপ করে নতমস্তকে ঘরের এক কোণে বসে ছিল। এবার খুব মৃদুভাবে তার গলার স্বর শোনা গেল।

'মাতাজি আমাকে মরণ থেকে তুলে এনে নতুন জীবন দিয়েছেন। প্রতিহিংসার আগুন আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। আমি আর মানুষ ছিলাম না। সেই অবস্থায় আমাকে ওই উকিলবাবু নরকের পথে নিয়ে

গিয়েছিলেন। আমার পাপের সীমা নেই। আমি সব কথা মাতাজিকে বলেছি। উনি বলেছেন, পুলিশের কাছে সব কিছু খুলে বলতে। মাতাজি বলেছেন, পুলিশের কাছে সব কথা খুলে বললে তবেই আমি শান্তি পাব।' বনানী দাস চুপ করলেন। তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

'দিদি, আপনাকে যদি দু'একটা প্রশ্ন করি আপনি কি তার উত্তর দেবেন?' আদিত্য সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করল।

বনানী দাস আদিত্যর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। নীরবে প্রশ্নের অপেক্ষা করছে।"শবনমের সঙ্গে আপনার কোথায় প্রথম আলাপ?'

'উকিলবাবুর চেম্বারে। উকিলবাবুই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।' 'উকিলবাবু মানে সজল নন্দী? ওই ওখানে যিনি বসে আছেন?'

বনানী দাস এক ঝলক সজল নন্দীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'শবনমকে ব্যবহার করে অসীমাভ রায়কে ব্ল্যাকমেল করার প্ল্যানটা কি সজল নন্দীই আপনাকে দেন?

'শবনমকে নিযুক্ত করার পরিকল্পনাটা উকিলবাবুর। কিন্তু অসীমাভ রায়কে ব্ল্যাকমেল করার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল অসীমাভ রায়কে অপমান করা, হেনস্থা করা, এমন একটা অবস্থা তৈরি করা যাতে অসীমাভ রায় আর লোকসমাজে মুখ দেখাতে না পারে। ভেবেছিলাম, ছবিগুলো হাতে পেলে আমি বিভিন্ন জায়গায় ওগুলো পাঠিয়ে দেব।'

'ছবিগুলো কি আপনি হাতে পেয়েছিলেন ?

'হ্যাঁ। পেয়েছিলাম। ছবিগুলো দেখে আমার গা গুলিয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারছিলাম ছবি পাঠানোর কাজটা ছবিগুলোর থেকেও নোংরা। তবু ছবিগুলো আমি পাঠাতাম। আমার মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন তখনও দাউদাউ করে জ্বলছিল। আমার মধ্যে যা কিছু ভাল ছিল সেই আগুনে পুড়ে গিয়েছিল।

'কিন্তু ছবিগুলো আপনি পাঠাননি।'

'না। পাঠাইনি। পাঠানোর আগেই অসীমাভ রায়ের ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল । খুনের দায়ে তার জেল হল। আমি ভাবলাম অসীমাভ রায় তার কৃতকর্মের সাজা তো পেয়েই গেল। তা হলে আমি আর ওই সব নোংরামির মধ্যে থাকব কেন? এর কিছুদিন পরে মাতাজির দর্শন পাই। উনি আমাকে ওঁর চরণে আশ্রয় দেন। আমি নতুন জীবন পেলাম।'

'ছবিগুলো কি হল?'

'ওই নোংরা ছবিগুলো আমি নিজের কাছে রাখতে চাইনি। ওগুলো আমি পুড়িয়ে ফেলেছিলাম।'

'তার মানে, আপনাকে ছবিগুলো আপনাকে দেবার আগে শবনম ওগুলোর কপি রেখেছিল। বলা তো যায় না, কখন কাজে লেগে যায়। শবনমের মতো মহিলার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। তবে এর পেছনে কানু বা উকিলবাবুর পরামর্শ থাকাটা আশ্চর্য নয়।'

কানু ও সজল নন্দী নিশ্চুপ।

'আচ্ছা, উকিলবাবুর পাশে যিনি বসে আছেন তাকে আপনি চেনেন?' আদিত্য সজল নন্দীর পাশে বসে থাকা কানুর দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'না, ওকে আমি চিনি না। তবে মনে হচ্ছে কয়েকবার যেন শবনমের সঙ্গে উকিলবাবুর চেম্বারে দেখেছি।'

'এসব কিন্তু আপনারা কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না।' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সজল নন্দী মুখ খুলেছে।

'সজলবাবু, আমরা কী প্রমাণ করতে পারব আর কী পারব না সে সব পরে দেখা যাবে। আপাতত আপনি চুপ করে বসুন। আমার গল্প এখনও শেষ হয়নি। 'আগের কাহিনিতে ফিরে যাচ্ছি। ধরা যাক, অশনি রায় রূপলেখারূপী শবনমের সঙ্গে প্রেম করছে এবং একই সঙ্গে ড্রাগের পেমেন্ট-এর জন্য গ্লোবালকে আনডারইনভয়েসিং-এ সাহায্য করছে। পেশার কারণে মৃত্তিকাকে সে চেনে কিন্তু সম্পর্কটা খুব গভীর কিছু

নয়। এই সময় দুবে ঠিক করল পার্থ এবং মৃত্তিকাকে খুন করা হবে এবং সেই খুনের দায়টা চাপানো হবে অশনির ওপর। দুবের লোক অশনিকে ফলো করে জানতে পারল অশনির সঙ্গে একজন মহিলার জোরদার অ্যাফেয়ার চলছে। আরও জানতে পারল, মহিলাটি আসলে একজন বাজারের মেয়ে, তার আসল নাম শবনম।

'দুবের লোক টাকা দিয়ে শবনমকে বশ করল। শবনম একটা মোবাইলের মাধ্যমে অশনির সঙ্গে যোগাযোগ করত যেটা রূপলেখা দত্তর নামে রেজিস্টার্ড। সেই মোবাইলটাতে শবনম আর অশনির যে ছবিগুলো ছিল সেগুলো শবনম আগেই মুছে দিয়েছিল। কিন্তু অশনির সঙ্গে চ্যাটগুলো মোবাইলে রেখে দিয়েছিল। দুবের নির্দেশে খুনের রাত্তিরে রূপলেখা অশনিকে ফোন করে বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ-এর ওই বাড়িটাতে আসতে বলল। অশনি যখন ওখানে পৌঁছল তখনও খুনি পালাবার সুযোগ পায়নি। সে অশনিকে অজ্ঞান করে ড্রেনপাইপ বেয়ে পালিয়ে গেল। যাবার সময় অশনিকে ফাঁসানোর জন্যে রূপলেখার মোবাইলটা রেখে গেল। মোবাইলটা যেহেতু রূপলেখা দত্তর নামে রেজিস্টার্ড, পুলিশ ধরে নিল মৃত্তিকা মিত্রই রূপলেখা দত্ত নাম নিয়ে অশনির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক করেছিল। সেই অবৈধ সম্পর্কের জেরে প্রথমে পার্থ মিত্র তার স্ত্রীকে খুন করে এবং তাই দেখে উত্তেজনার বশে অশনি পার্থ মিত্রকে মেরে ফ্যালে। কিন্তু পুলিশের কেস সাজানোয় কিছু ফাঁক ছিল বলে অশনি ছাড়া পেয়ে যায়।

'অর্থাৎ আমার এই গল্পটা যদি সত্যি হয় তা হলে অশনি খুন করেনি বটে কিন্তু সে গ্লোবাল ট্রেডিং এবং সেন বেকারির বেআইনি লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু পুলিশের কাছে সে সেই কথা স্বীকার করেনি।'

'আমি আবার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি কোনওদিন কোনও বেআইনি লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না।' অশনি রায়ের গলাটা এবার ক্লান্ত শোনাল।

'বললাম তো আমরা আপনার প্রতিবাদটা খতিয়ে দেখব। তার আগে দয়া করে আমাকে শেষ করতে দিন।' আদিত্যর গলাটাও একটু ক্লান্ত শোনাল 'কতক্ষণে আপনি শেষ করবেন? আপনি বলে যাচ্ছেন তো বলেই যাচ্ছেন।' এবার কানু উদ্ধত গলায় বলল।

'এই এটার মুখে একটা সেলোটেপ আটকে দে তো। এটা বড্ড কথা বলছে।' গৌতমের গলা পুলিশি কর্কশ।

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন কর্তব্যরত কনসটেবল এগিয়ে আসছিল। কানু বিপদ বুঝে দু'হাত জড়ো করে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে স্যার। এবারের মতো মাফ করে দিন স্যার। আর কথা বলব না।'

গৌতমের ইশারায় কনসটেবল দু'জন পিছিয়ে গেছে। ঘরের আবহাওয়া একটু শান্ত হতে আদিত্য আবার শুরু করল।

'সেই নোংরা ছবিগুলো, যেগুলো বনানী দাস পুড়িয়ে ফেলেছিল, কিন্তু শবনমের কাছে যেগুলোর কপি ছিল, অশনি রায় জেলে যাবার পর সেগুলো মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিল। ওগুলো ব্যবহার করে অসীমাভ রায়কে ব্ল্যাকমেল করাটা শক্ত ছিল। জেলে যাবার ফলে অশনির সুনাম তো এমনিতেই ধূলিসাৎ, ছবিগুলো বাইরে এলে তার সুনামের আরও কী এমন ক্ষতি হবে? এই অবস্থায় অসীমাভ রায়ও ব্ল্যাকমেলের টাকা দিতে চাইবেন না। পুরো পরিশ্রমটাই বৃথা যাবে। এইসব ভেবে শবনম ছবিগুলো আর ব্যবহার করেনি। তারপর যখন হাই কোর্ট অশনিকে বেকসুর খালাস করে দিল, সে তার পুরোনো সুনামও অনেকটা ফিরে পেল। চাকরিটাও ফিরে পাবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিল। তখন শবনম ভাবল ছবিগুলো ব্যবহার করে এখন কিছু পয়সা রোজগার করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে তার সঙ্গে ছিল কানু এবং উপদেষ্টা হিসেবে সজল নন্দী। ব্ল্যাকমেলের টাকা আনতে গিয়ে কানু ধরা পড়ল, সজলকেও আমরা পুলিশ কাস্টডিতে নিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, কানু এবং সজল যখন পুলিশ কাস্টডিতে সেই সময় শবনম খুন হল। যে শবনমকে খুন করল সে ছবিগুলোও নিয়ে গেল। শবনমকে কে খুন করল? এ ব্যাপারে সুভদ্র কিছু বলবে।'

'আমরা সিসি ক্যামেরায় দেখতে পেয়েছি সাধু বিকাশ বলে একজন পুরোনো ক্রিমিনাল কিছু একটা পাবার জন্য শবনমকে টর্চার করছে। অমানুষিক টর্চারের ফলেই শবনমের মৃত্যু হয়েছিল। আর সম্ভবত শবনমকে টর্চার করা হয়েছিল ওই ছবিগুলোর জন্যেই। এবং যেহেতু অনেক খুঁজেও ছবিগুলো আমরা শবনমের বাড়িতে পাইনি, ধরে নেওয়া যায় ছবিগুলো সাধু বিকাশ নিয়ে গেছে। প্রশ্ন হল, সাধু বিকাশ কি কোনও জায়গা থেকে খবর পেয়ে নিজেই ছবিগুলো হস্তগত করতে গিয়েছিল নাকি কেউ তাকে নিয়োগ করেছিল?' সুভদ্র থামল।

'এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়েছি। উত্তরটা পরে বলব। তার আগে মৃত্তিকা মিত্র, পার্থ মিত্রর হত্যারহস্যে ফিরে যাওয়া যাক।' আদিত্য আবার বলতে শুরু করল। 'এখন এই রহস্যের দুটো আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি। একটা পুলিশের ব্যাখ্যা যেটা বলছে মৃত্তিকাকে খুন করেছে পার্থ এবং পার্থকে অশনি। এই ব্যাখ্যাটায় কিছু মৌলিক গলদ আছে। প্রথম গলদ, দুটো খুনই পেশাদার হাতের কাজ। এত প্রিসিশন অশনির পক্ষে অসম্ভব। দু'নম্বর গলদ, পাঁচিল টপকে যে লোকটা পালাল তার ব্যাপারে পুলিশ কোনও ব্যাখ্যা দিচ্ছে না। তিন নম্বর গলদ, অশনি যদি খুন করে থাকে, তা হলে সে তার হাতের ছাপ সুদ্ধু রিভলভারটা অকুস্থলে ফেলে আসবে কেন। আরও প্রশ্ন আছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ, যেটাতে দেখা যাচ্ছে লোকটা পাঁচিল টপকে পালাচ্ছে, প্রথমে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে কোনও এক যাদুমন্ত্রে ব্যারিস্টার অরুণকান্তি ব্যানার্জী সেটা কোর্টে প্রোডিউস করলেন। এটা কী করে হল? অরুণকান্তির দুর্ঘটনাটাও কি কাকতালীয়? কেসটা নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যাবার জন্যে পুলিশের ওপর কোথা থেকে চাপ আসছে? সব মিলিয়ে পুলিশের ব্যাখ্যাটা ধোপে টিকছে না।'

'তা হলে কি অন্য ব্যাখ্যাটাই ঠিক? মানে তুই যেটা বললি?' গৌতমকে কিছুটা বিভ্রান্ত মনে হল।

'অন্য ব্যাখ্যাটাতেও অনেকগুলো ফাঁক আছে। সেগুলো এক এক করে বলছি।' অশনি আর তার বাবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আদিত্য বলতে শুরু করল।

'প্রথম ফাঁক, পার্থ মিত্র নিঃসন্দেহে সেন বেকারির ড্রাগ পেডলিং-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু সে তার স্ত্রীকেও এই কাজে যুক্ত করতে চেয়েছিল এটা মনে করার কারণ নেই। কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী বলছে গ্লোবাল ট্রেডিং-এর কাজে সে যোগ দিয়েছিল ২০১৫ সালের অক্টোবরে। কিন্তু তার আগে চার বছর আট মাস মৃত্তিকা বেকার হয়ে বাড়িতে বসেছিল। অনেক আগেই পার্থ মৃত্তিকাকে গ্লোবালে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারত। কিন্তু পার্থ এটা চায়নি। শেষে উপায় না দেখে খানিকটা অনিচ্ছা নিয়েই পার্থ মৃত্তিকাকে গ্লোবাল-এর চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই কাজের সূত্রে গ্লোবালের মালিককে পার্থ মিত্র চিনত। কিন্তু পার্থ চাইত না তার স্ত্রী তার আসল কাজের ব্যাপারটা জানতে পারুক। মৃত্তিকা গ্লোবাল-এ চাকরি করলে যে সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। তাই মৃত্তিকা বাড়িতে বেকার বসে থাকা সত্ত্বেও পার্থ অনেকদিন মৃত্তিকার গ্লোবাল-এ চাকরি করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়নি। এর থেকে মনে হয় মৃত্তিকা ড্রাগ ব্যবসার সঙ্গে আদৌ যুক্ত ছিল না।

ঘরের সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে।

'দ্বিতীয় ফাঁক, মৃত্তিকা যখন গ্লোবালে চাকরি করছে তখন এমন কিছু ঘটেনি যাতে অশনির অনেক টাকার দরকার হবে। টাকার দরকার তার হতে পারত যখন প্রথম বান্ধবী অন্বেষার সঙ্গে তার সম্পর্কটা ভেঙে যায়নি। অশনি নিজে এবং তার বন্ধু নিমগ্ন দাশগুপ্ত আমাদের বলেছে অন্বেষা ভীষণ ডিমান্ডিং ছিল। কাজেই এই সময় যদি মৃত্তিকার মাধ্যমে অশনি বেআইনি আন্ডার-ইনভয়েসিং অর্থাৎ শাড়ির দাম কমিয়ে দেখানোর কাজে জড়িয়ে পড়ত, সেটা তবু মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু সুভদ্রকে অশনি জানিয়েছে যে অন্বেষার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়েছে ২০১৫-র সেপ্টেম্বরে, আর আমরা জানি তার একমাস পরে মৃত্তিকা গ্লোবাল-এ যোগ দিয়েছিল। ততদিনে অশনির টাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সে কেন মৃত্তিকার প্রস্তাবে রাজি হয়ে বিপথে

যাবে? মনে রাখতে হবে, অশনির দ্বিতীয় বান্ধবী রূপলেখা তার প্রথম বান্ধবী অন্বেষার মতো ডিমান্ডিং ছিল না। এটা অশনিই আমাকে বলেছে।

'তৃতীয় ফাঁক, মোবাইলটা কেন কয়েকদিন পরে একটা লুকোনো জায়গা থেকে পাওয়া গেল? কেউ যদি অশনিকে ফাঁসানোর জন্যে মোবাইলটা মৃত্তিকার বাড়িতে ফেলে যায় তা হলে তো সে সেটা প্রকাশ্য জায়গায় ফেলে রাখবে। লুকিয়ে রাখবে কেন?

'সব থেকে বড় কথা, দুবে যদি সত্যি সত্যি অশনির মুখ বন্ধ করতে চাইত তা হলে সরাসরি তাকে মেরে ফেললেই তো পারত। তাকে বাঁচিয়ে রাখা মানেই রিস্ক, কখন সে পুলিশের কাছে কী বলে ফেলবে কে বলতে পারে? আর দুবে বা তার গ্যাং ইতিমধ্যেই এত মানুষ মেরেছে যে আর একটা মানুষ মারতে তাদের খুব অনীহা হবে বলে মনে হয় না। আরও প্রশ্ন, দুবের লোকজনই যদি সব গন্ডগোলের মূলে থাকে তা হলে ধরে নিতে হবে তারা শবনমকেও খুন করিয়েছে। কিন্তু তারা খামোকা শবনমকে খুন করাতে যাবে কেন? ছবিগুলোই বা নিতে যাবে কেন?

'সব মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছে দ্বিতীয় এই ব্যাখ্যাটাও ধোপে টিকছে না।' আদিত্য চুপ করল। ঘরে কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর সেই নীরবতা ভেঙে গৌতম বলল, 'যা ব্বাবা। তা হলে আমরা তো সেই ব্যাক টু স্কোয়্যার ওয়ান।'

(৪)

'বেশ কিছুদিন কিন্তু আমি ওই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটাই সত্যি বলে ধরে নিয়ে যে ফাঁকগুলো বললাম সেগুলো ভরাট করার চেষ্টা করছিলাম। বলাই বাহুল্য, ফাঁকগুলো ভরাট করতে পারছিলাম না, কারণ ফাঁকগুলো ভরাট করার নয়। সম্ভবত কোনও কেসেই আমি এতদিন ধরে ভুল রাস্তায় হাঁটিনি। তারপর একেবারে ভাগ্যের বশে এমন একটা ঘটনা ঘটল এবং তার ফলে এমন একটা জিনিস আমি জানতে পারলাম যাতে মৃত্তিকা-পার্থর মৃত্যুরহস্যটা এক মুহূর্তে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।' আদিত্য একটু থেমে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল।

'কী ঘটনা? কী জানতে পারলি?' গৌতম আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছে না।

'আমার ভুলটার কথা আগে বলি। আমি ধরেই নিয়েছিলাম মৃত্তিকা-পার্থর হত্যারহস্যের সঙ্গে দুবে গ্যাং-এর ড্রাগ পেডলিং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটাই আমার ভুল। সত্যি এটাই যে মৃত্তিকা-পার্থর হত্যারহস্যের সঙ্গে দুবে গ্যাং-এর ড্রাগ পেডলিং-এর কোনও সম্পর্ক নেই। একটা ইনটুইশন আমাকে চালিত করছিল। আমার ইনটুইশন আমাকে বলছিল, অশনি মিথ্যে কথা বলছে। সে আসলে ভাল করেই মৃত্তিকাকে চিনত। মানে যতটা চিনত সে বলছে তার থেকে অনেক বেশি চিনত। এই ইনটুইশনের দ্বারা চালিত হয়ে আমি ড্রাগ পেডলিং-এর সঙ্গে মৃত্তিকা-পার্থর খুনটা জড়িয়ে ফেলেছিলাম। আমার ইনটিউশনটা ভুল ছিল না। কিন্তু সেটার থেকে ঠিক ইঙ্গিতটা আমি নিতে পারিনি।

'অর্থাৎ অশনি মৃত্তিকাকে ভাল করেই চিনত। অশনি পুলিশকে মিথ্যে বলছিল।' অশনি রায় কাঠ হয়ে বসে আছে। তার বাবার মুখেও উদ্বেগের চিহ্ন। আদিত্য আবার বলতে শুরু করেছে।

'আমি ভেবেছিলাম ড্রাগ পেডলিং নিয়ে রেশারেশির জেরে খুনি মূলত পার্থ মিত্রকেই খুন করতে চেয়েছিল। মৃত্তিকা সেখানে উপস্থিত ছিল বলে সেও খুন হয়ে যায়। আসল ঘটনাটা ঠিক উল্টো। খুনি মৃত্তিকাকেই খুন করতে গিয়েছিল। সেই রাত্তিরে পার্থর বাড়িতে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু তার ফ্লাইট ক্যানসেলড হয়ে যাবার ফলে সে বাড়ি ফিরে আসে। এবং মৃত্তিকার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও খুন হয়ে যায়। খুনী সাক্ষী রাখতে চায়নি।'

'খুনি ওই ফ্ল্যাটে ঢুকল কী করে?' গৌতম জিজ্ঞেস করল।

‘খুনি সকাল থেকে ওই ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে উঠে ট্যাঙ্কের পাশে লুকিয়ে ছিল। তারপর রাত্তিরে ড্রেন পাইপ বেয়ে মৃত্তিকাদের বারান্দায় নামে এবং বারান্দা থেকে শোবার ঘরে ঢোকে। মৃত্তিকা তখন তার শোবার ঘরেই ছিল। আর তার স্বামী পার্থ ছিল বাথরুমে। খুনির সঙ্গে রিভলভর ছিল, কিন্তু সে সেটা ব্যবহার করতে চায়নি, পাছে শব্দে লোকজন জেগে যায়। খুনি পেশাদার। সে ক্যাবিনেট থেকে একটা ফুলদানি তুলে নিয়ে নিপুণ দক্ষতায় মৃত্তিকার মাথায় মারে এবং মৃত্তিকা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। ঠিক এই সময় শোবার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দরজা খুলে পার্থ বেরিয়ে আসে। খুনির ধারণা ছিল পার্থ শহরের বাইরে। সে জানত না পার্থর ফ্লাইট ক্যানসেলড হয়ে গেছে। তাই সে কিছুটা চমকে যায় এবং উপায় না দেখে রিভলভর বার করে পার্থকে গুলি করে। আমার বিশ্বাস এর ঠিক পরেই কলিং বেল বেজে ওঠে। কলিং বেল বাজাচ্ছিল অশনি রায়। খুনি তাকে বাড়িতে ঢুকিয়ে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে দেয়। তারপর রিভলভরে অজ্ঞান অশনির হাতের ছাপ তুলে রিভলভরটা মেঝেতে ফেলে রেখে ড্রেন পাইপ বেয়ে নিচে নেমে পাঁচিল টপকে চম্পট দেয়।'

‘তার মানে অশনি রায় সত্যি কথাই বলেছিল।' সুভদ্র মন্তব্য করল। ‘পুরোটা নয়। আংশিক সত্যি বলেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, অশনি কেন অত রাত্তিরে মৃত্তিকা-পার্থর ফ্ল্যাটে গিয়েছিল? আর এখানেই অশনি মিথ্যে বলছে। সত্যিটা হল, অশনি অত রাত্তিরে মৃত্তিকার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল কারণ মৃত্তিকা তাকে যেতে বলেছিল।'

‘মৃত্তিকা যেতে বলেছিল!' গৌতম সত্যিই অবাক।

‘হ্যাঁ, মৃত্তিকাই যেতে বলেছিল।'

'কেন?'

‘অশনির সঙ্গে তার কিছু কথা ছিল যে কথাগুলো সে স্বামীর উপস্থিতিতেই অশনিকে বলতে চেয়েছিল। এদিকে তার স্বামী পার্থ কাজে ব্যস্ত থাকে। সেন বেকারির হেরোইন ভরা পাঁউরুটি ডিসট্রিবিউট করা কম কাজ তো নয়। কাজেই পার্থকে পাওয়া যায় না। হঠাৎ সেই রাত্তিরে পার্থ মিত্রর ফ্লাইট ক্যানসেলড হল। মৃত্তিকা ভাবল আজ রাত্তিরেই অশনিকে ডেকে কথাটা বলে দিই। এই ভেবে সে অশনিকে ফোন করল। অশনি তখন রূপলেখার সঙ্গে ডিনার সেরে বাড়ি ফিরছিল। মৃত্তিকার ফোন পেয়ে অশনি গাড়ি ঘুরিয়ে বাঙ্গুর অ্যাভিনিউতে এসে পৌঁছল। ততক্ষণে মৃত্তিকা এবং পার্থ খুন হয়ে গেছে। ঠিক বলছি তো অশনিবাবু?' শেষ কথাগুলো বলাই বাহুল্য অশনির উদ্দেশে।

অশনি নিরুত্তর। অসীমাভ রায় চিন্তায় ডুবে আছে।

‘তুই আর হেঁয়ালি না করে পরিষ্কারভাবে বল কেন মৃত্তিকা অশনি রায়ের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল।' এবার গৌতমের গলা।

‘বলছি, বলছি। তার আগে বলি ভাগ্যক্রমে কোন ঘটনা আমাকে ঠিক পথে নিয়ে এল। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে হার্টকেয়ার নার্সিং হোমে একটা বিল মেটাতে গিয়েছিলাম। ওখানে কিছুদিন আগে ডাঃ অসীমাভ রায় আমাকে অ্যাঞ্জিও করে স্টেন্ট বসিয়েছিলেন। সেই সংক্রান্ত বিল। বিল মেটাতে গিয়ে যাজ্ঞসেনী মল্লিক বলে একজনের সঙ্গে আলাপ হল। যাজ্ঞসেনী হার্টকেয়ার-এর অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। কথায় কথায় যাজ্ঞসেনী বলল, এক সময় মৃত্তিকা মিত্র হার্টকেয়ারের মেডিকাল রেকর্ডস-এর দায়িত্বে ছিল। বলতে গেলে প্রায় বিনা কারণে তার চাকরিটা চলে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি পুরো ছবিটা চোখের সামনে দেখতে পেলাম।' ‘কী ছবি দেখলেন? কী ছবি?' অনেকক্ষণ পরে অসীমাভ রায়ের গলা শোনা গেল।

‘ছবিটা আপনার জন্যে খুব গৌরবজনক নয় ডাঃ রায়। আপনি হার্টকেয়ারের আট আনা অংশীদার। নামে ও বেনামে। বাকি অংশীদার আপনার বন্ধু বিখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জেন ডাঃ সমীরণ সান্যাল। সেটাও নামে এবং বেনামে। এটাই সত্যি যে আপনারা দু'জনে মিলে টাকার লোভে মনোময় দাসকে অপরেশন করার পথে ঠেলে দিয়েছিলেন। মনোময় দাসের শারীরিক অবস্থা আদৌ অপরেশনের উপযুক্ত ছিল না। সেটা জেনেও

যখন আপনারা মনোময় দাসকে অপরেশন করানোর পরামর্শ দিলেন তখন বলা যেতেই পারে আপনারা তাকে টাকার লোভে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছিলেন।'

'আপনি প্রলাপ বকছেন। আমি আপনার নামে মানহানির মামলা করব।' অসীমাভ রায় গর্জে উঠেছেন।

'ইচ্ছে হলে নিশ্চয় করবেন। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এখনও শেষ হয়নি। বলতে পারেন সবে শুরু হয়েছে। আপনি আগে মন দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো শুনুন। তারপর যা মনে হবে করবেন। বনানী দাস যখন মামলা করল তখন প্রথমেই হার্টকেয়ারের মেডিকাল রেকর্ডস-এর দায়িত্বে থাকা মৃত্তিকা মিত্রকে আপনারা বিনা কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। আপাতদৃষ্টিতে বিনা কারণে, কিন্তু আসলে খুব জরুরি একটা কারণ ছিল। আপনারা মনোময় দাসের মেডিকাল টেস্টের রিপোর্টগুলো বদলে দিয়েছিলেন। না হলে আপনারা কোর্টে দাঁড়াতে পারতেন না। এখন, মৃত্তিকা মিত্রর মতো কম্পিউটার-দক্ষ কর্মী থাকলে আপনারা এই বদলটা চুপিচুপি করতে পারতেন না। মৃত্তিকা ঠিক ধরে ফেলত। তাই মৃত্তিকাকে আপনারা ছাঁটাই করে দিলেন। বেচারা জানতেও পারল না কেন তার চাকরি গেল। এই ষড়যন্ত্রে আরও কতজন যুক্ত ছিল এবং এই ধরনের কাজ আপনারা আরও কতবার করেছেন, সেসব নিয়ে অবশ্যই তদন্ত হবে। তবে আমার বিশ্বাস এই ধরনের কাণ্ড আপনারা আরও ঘটিয়েছেন। না হলে একজন অপদার্থ কিন্তু বিশ্বস্ত কর্মচারীকে মেডিকাল রেকর্ডের দায়িত্বে বসিয়ে রাখতেন না। যাই হোক, আপাতত মৃত্তিকার সেটা নিয়ে বলি।'

অসীমাভ রায়ের ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। তিনি কথা বলছেন না। শুধু হাতের মুঠি খুলছেন, বন্ধ করছেন। একটু জিরিয়ে নিয়ে আদিত্য আবার বলতে শুরু করল।

'চার বছর আট মাস মৃত্তিকা বাড়িতে বেকার হয়ে বসেছিল। তারপর গ্লোবাল ট্রেডিং-এ একটা চাকরি পেল। নিজের দক্ষতা দিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি উন্নতি করছিল মৃত্তিকা। তারপর একদিন অশনি রায়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। নেহাতই কাজের সূত্রে পরিচয়। শুরুতে তার থেকে বেশি আর কিছু ছিল না। পরে অশনি এবং মৃত্তিকার মধ্যে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। আমার অনুমান, প্রথম প্রেমিকার কাছ থেকে দাগা খাওয়ার পর অশনি নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা হারায় এবং প্লেবয়-সুলভ একটা প্রবণতা তার মধ্যে তৈরি হয়। অর্থাৎ মেয়ে দেখলেই তার ফ্লার্ট করতে ইচ্ছে করত। মৃত্তিকার ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। অশনির চেহারাটা মেয়ে পটানো তো ছিলই।' 'কিন্তু মৃত্তিকা তো বিবাহিত। সে অশনিকে পাত্তা দেবে কেন?' গৌতম জিজ্ঞেস করল।

'আমার ধারণা, পার্থ তার স্ত্রীকে খুব বেশি সঙ্গ দিতে পারত না। তাই মৃত্তিকা একাকীত্বে ভুগত। অশনির মতো মার্জিত সুপুরুষের সঙ্গ তার ভালই লাগত। তার বেশি হয়ত আর কিছু নয়।'

'বেশ। তারপর ? '

'কথায়, কথায় অশনি রায়ের কাছ থেকে মৃত্তিকা প্রথম বনানী দাসের মামলার ব্যাপারটা জানতে পারে। এটাও শোনে যে কোর্টে মেডিকাল রিপোর্ট দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছিল মনোময় দাস অপরেশনের জন্যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। চকিতে তার মনে পড়ে যায় মনোময় দাসের যে রিপোর্টগুলো সে নার্সিং হোমের কম্পিউটারে তুলে রেখেছিল সেগুলো ঠিক এই রকম ছিল না। বুদ্ধিমতী মৃত্তিকা ধীরে ধীরে এটাও বুঝতে পারে কেন তাকে হার্টকেয়ার থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। সে একদিন অসীমাভ রায়ের সঙ্গে দেখা করে বলল, সে এতদিনে পুরো ষড়যন্ত্রটা ধরতে পেরেছে। অসীমাভ রায় যদি পাবলিকলি তাঁর দোষ স্বীকার না করেন তাহলে মৃত্তিকা তাঁকে এক্সপোজ করে দেবে। ঠিক এই কথাগুলোই সে বলেছিল কিনা জানি না। তবে এই ধরনের কিছু একটা নিশ্চয় বলেছিল। অসীমাভ রায় মৃত্তিকাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর চোখে মৃত্তিকার বাঁচার অধিকার আর রইল না।'

'এসব কথা কি শুধুই আপনার কল্পনাপ্রসূত, নাকি প্রমাণ-টমান কিছু আছে?' 'কিছু প্রমাণ জোগাড় না করে কি এত কথা বলছি? প্রমাণের প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগে আমার অভিযোগগুলো বলে নিই।

'অসীমাভ রায়ের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে মৃত্তিকা ভাবল কোথায় যাবে ? পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ কি তার কথা বিশ্বাস করবে? মনে হয় না। অনেক ভেবেচিন্তে সে ঠিক করল অসীমাভ রায়ের ছেলে অশনিকেই সে সব কথা জানাবে। সেই মতো সে অশনির সঙ্গে যোগাযোগ করল। খানিকটা আভাসও দিল সে কী নিয়ে কথা বলতে চায়। আমার ধারণা অশনি ব্যাপারটা শুনে খুব অবাক হয়নি, কারণ সে তার বাবাকে খানিকটা চিনত। কিন্তু ব্যাপারটা এতটাই সিরিয়াস, বিশেষ করে অসীমাভ রায়ের কাছ থেকে বিতাড়িত হবার পরে, যে মৃত্তিকা তার কথাগুলো একা একা বলতে চায়নি। স্বামীর উপস্থিতিতে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু পার্থকে তো পাওয়াই যায় না। শেষে সেই রাত্তিরে ফ্লাইট বাতিল হয়ে গিয়ে হঠাৎ পার্থ বাড়ি ফিরে আসাতে মৃত্তিকার মনে হল অশনিকে কথাগুলো বলার এটাই উপযুক্ত সময়। সে অশনিকে ফোন করে তার বাড়িতে আসতে বলল। মৃত্তিকার ফোন পাবার পর অশনি তার বাড়িতে পৌঁছনোর আগেই অসীমাভ রায়ের ভাড়াটে খুনি, পুলিশের খাতায় যার নাম সাধু বিকাশ, মৃত্তিকা এবং পার্থ মিত্রকে খুন করে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস, বাবার খুনের দায় নিরপরাধ ছেলের ঘাড়ে এসে পড়ল। এবং অশনি পুলিশের কাছে পুরো সত্যটা বলল না, পাছে তার বাবার আসল চেহারাটা সবার সামনে বেরিয়ে আসে। এর জন্যে অবশ্য তাকে তিন বছর জেল খাটতে হয়েছে। বাবার পাপে ছেলের শাস্তি। নিরাপরাধ ছেলে শাস্তি পাচ্ছে দেখেও বাবা কিন্তু তার দোষ স্বীকার করল না। অসীমাভ রায় নিজেকে এতটাই ভালবাসে।' 'আরও ভেবে দেখুন আদিত্যদা, বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রেমিকাকে, মানে রূপলেখাকে খুনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে এতটুকু ইতস্তত করেনি অশনি। যখন সে পুলিশকে মিথ্যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে রূপলেখা তাকে ওই বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে ডেকে এনেছে, তখন তো সে জানতই না যে রূপলেখা একজন ফ্রড।' সুভদ্র বলল।

'আসলে কী জান? অশনির সঙ্গে রূপলেখার সম্পর্কটা ছিল মূলত শারীরিক। ওদের মনের যোগ কখনই হয়নি। এটা আমি অশনির সামনেই বলব।' আদিত্য চিন্তা করার গলায় বলল।

'আবার বলছি, কোনও প্রমাণ আছে তোমার কাছে, নাকি এমনিই ঝোঁকের মাথায় বকবক করে যাচ্ছ?' রাগের মাথায় অসীমাভ রায় আদিত্যকে তুমি সম্বোধন করে ফেলেছেন।

'ঠিক প্রমাণ নেই। তবে একজন সাক্ষী আছে। তাকে আপনার চেম্বারের সামনে থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তার নাম সাধু বিকাশ। সে স্বীকার করেছে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে মৃত্তিকা, পার্থ এবং শবনমকে খুন করেছে। হ্যাঁ, ওই ছবিগুলো হস্তগত করার জন্য আপনিই সাধু বিকাশকে দিয়ে শবনমকেও খুন করান। ছবিগুলো নিয়ে সে যখন আপনার কাছে যাচ্ছিল সেই সময় পুলিশ তাকে ছবিসুদ্ধু গ্রেপ্তার করে। সাধু বিকাশ এখন আমাদের প্রধান সাক্ষী।'

'আর একজন সাক্ষীও আছে আদিত্যদা। তার কথা ভুলে গেলেন? আপনিই তো তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চেক করতে বললেন।' সুভদ্র মনে করিয়ে দিল।

'ও হ্যাঁ, তার কথা ভুলেই যাচ্ছিলাম। সেও তার অপরাধ স্বীকার করেছে। মক্কেলের নাম সোমনাথ বাগ। মৃত্তিকা এবং পার্থ যখন খুন হয় তখন সে বাঙ্গুর এভিনিউ-এর ওই বাড়িটায় সিকিউরিটির দায়িত্বে ছিল। তাকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে সাধু বিকাশ খুন হওয়ার দিন সকালবেলা বাড়ির ছাতে উঠে জলের ট্যাঙ্কের পেছনে লুকিয়ে ছিল। যখন সাধু বিকাশ ঢুকছিল তখন কয়েক মিনিটের জন্যে সোমনাথ সিসি ক্যামেরাটা বন্ধ করে দেয়। যে টাকাটা সাধু বিকাশ সোমনাথকে দিয়েছিল সেটা বলাই বাহুল্য অসীমাভ রায়ের। অনেক পরে, যখন আমি সোমনাথকে আবিষ্কার করলাম, তার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম, তখন সে বুঝল কেসটা নিয়ে আবার ঘাঁটাঘাটি হচ্ছে। সে ভয় পেয়ে গেল। ঠিক করল, সে চিরতরে উধাও হয়ে যাবে। তিন বছর আগে অসীমাভর কাছ থেকে সে অনেক টাকা পেয়েছিল। সোমনাথ সাবধানী লোক। টাকাটা এতদিন সে খরচ করেনি। ব্যাঙ্কেও রাখেনি। মনে হয়, নগদে কোথাও একটা লুকিয়ে রেখেছিল। এবার ওই টাকা দিয়ে সে দেশে ফিরে গিয়ে একটা দোকান খুলল। সোমনাথ বাগ পুলিশের কাছে তার অপরাধ স্বীকার করেছে।

'অসীমাভ রায় সোমনাথ বাগের সঙ্গে সরাসরি ডিল করলেন?' গৌতমের প্রশ্ন। 'না, না। একেবারেই নয়। অসীমাভ রায় তো দূরের কথা সাধু বিকাশের সঙ্গেও কখনও সোমনাথ বাগ কথাবার্তা বলেনি। সোমনাথ ওদের পরিচয় জানতই না। একজন তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে কথাবার্তা হয়েছিল। বস্তুত, সোমনাথ জানত না যার কাছ থেকে সে টাকা নিচ্ছে তার ছেলেই অশনি যে কিনা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। এটা সে জানত না বলেই আমাকে বলেছিল অশনি এবং মৃত্তিকাকে সে একসঙ্গে দেখেছে। অর্থাৎ অশনিকে প্রোটেকশন দেবার কথাটা তার মাথায় আসেনি। অশনি আর মৃত্তিকাকে এক সঙ্গে দেখার কথাটা অবশ্য সত্যি।'

'একটা জিনিস কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না। যে সিসি ক্যামেরার ফুটেজটাতে দেখা গেল একটা লোক পাঁচিল টপকে পালাচ্ছে, যেটা প্রথমে পাওয়া যায়নি, পরে ব্যারিস্টার অরুণকান্তি ব্যানার্জী কোর্টে প্রোডিউস করেছিলেন, সেটা কোথায় ছিল?' গৌতমের প্রশ্ন।

'এটার একটা উত্তর আমার কাছে আছে। উত্তরটা আমার অনুমান। কিন্তু মনে হয় অনুমানটা খুব ভুল হবে না। আমার অনুমান, সিসি ক্যামেরার ফুটেজটা সোমনাথ বাগ সরিয়ে রেখেছিল যাতে সাধু বিকাশের ওপর কোনও সন্দেহ না পড়ে। ক্যামেরটা মাঝে মাঝে খারাপ হয়ে যেত। সোমনাথ তার সুযোগ নিয়েছিল। ফুটেজটা নিয়ে সোমনাথ অসীমাভ রায়ের কাছে জমা দিয়েছিল। বলাই বাহুল্য সেই তৃতীয় ব্যক্তিটির মাধ্যমে। ফুটেজটা অসীমাভ রায়ের কাছেই ছিল। পরে যখন অসীমাভ রায় দেখলেন তার নিজের ছেলেই খুনের দায়ে ফেঁসে যাচ্ছে তখন তিনি ফুটেজটা কোথা থেকে পেয়েছেন সে বিষয়ে কিছু একটা গল্প বানিয়ে সেটা ব্যারিস্টার সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। আমার অনুমান ঠিক কিনা অসীমাভ রায় বলতে পারবেন।'

অসীমাভ রায় কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন।

'আমার একটা প্রশ্ন ছিল আদিত্যদা। ব্যারিস্টার অরুণকান্তি ব্যানার্জীর মৃত্যুটা কি নিছকই একটা অ্যাকসিডেন্ট নাকি ওটার পেছনেও কোনও ফাউল প্লে আছে?' সুভদ্র জিজ্ঞেস করল।

আদিত্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অসীমাভ রায়ের দিকে তাকাল। অসীমাভ রায় চোখ নামিয়ে নিয়েছেন।

'ব্যারিস্টার সাহেবের মৃত্যুটাও নিছক অ্যাকসিডেন্ট নয়। এই অ্যাকসিডেন্টটা ঘটানো হয়েছিল। সাধু বিকাশ ডাক্তারবাবুর নির্দেশে লোক দিয়ে এটা ঘটিয়েছিল। গৌতম বলল একটু অগে সাধু সেকথা স্বীকার করেছে।'

'ব্যারিস্টার সাহেবকে মারার দরকার হল কেন?' অবাক হয়ে যাওয়া গলায় অশনি প্রশ্ন করল।

'যখন শোনা গেল পুলিশ অ্যাপিল করবে, কেসটা আবার ব্যারিস্টার সাহেবের কাছে গেল। কেসটা নিয়ে তাঁর কিছু অস্বস্তি ছিল। এবার তিনি পুরোদমে তদন্ত শুরু করলেন যেটা তিনি আগে সময়ের অভাবে করতে পারেননি। তিনি জানতে পারলেন মৃত্তিকা এক সময় হার্টকেয়ারে কাজ করত। ব্যারিস্টার সাহেবের ঝকঝকে মাথা। অচিরেই তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্তিকা মিত্র, পার্থ মিত্রের খুনের পেছনে কে বা কারা আছে। তিনি সরাসরি পুলিশের কাছে যেতে পারতেন। কিন্তু হাজার হলেও অসীমাভ রায় তাঁর পুরোনো বন্ধু। সেই বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি বন্ধুকে গিয়ে বললেন তিনি সবটাই বুঝতে পেরেছেন। এবং কেসটা আবার আদালতে উঠলে তিনি আসল সত্যটা প্রকাশ করার জন্যই অশনির হয়ে লড়বেন। অসীমাভ যেন তৈরি থাকে। এর ফলে অসীমাভ রায়ের চোখে ব্যারিস্টার সাহেবেরও বেঁচে থাকার অধিকার রইল না। ঠিক মৃত্তিকারই মতো।'

আদিত্য চুপ করল। সকলেই চুপ করে আছে। হঠাৎ সুভদ্র বলে উঠল, 'স্যার, আমি মেসেজ পেলাম একটু আগে ডাঃ সন্দীপন সান্যালকেও পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।' কথাগুলো গৌতমের উদ্দেশে।

'আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। আমি কি আসতে পারি?" বনানী দাস কিঞ্চিত দুর্বল গলায় বললেন।

"নিশ্চয় দিদি। অবশ্যই আপনি আসতে পারেন। একটা বেআইনি কাজ করতে গিয়েও আপনি শেষ পর্যন্ত করেননি। যেহেতু কাজটা আপনি করেননি, পুলিশ ও আপনাকে চার্জ করতে পারবে না। কী রে গৌতম ঠিক বলছি তো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছিস। পুলিশ বনানী দাসের বিরুদ্ধে কোনও চার্জ দেবে না।'

‘তবে দিদি, একটা ব্যাপার আমার কিন্তু খেয়াল করা উচিত ছিল। একজন সাধারণ গৃহবধূ যখন একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমাজ-সংসার সব ছেড়ে এত তীব্রভাবে লড়াই করেন, তখন এটাই ধরে নেওয়া স্বাভাবিক ছিল যে তাঁর ক্ষোভটা সত্যিকারের। প্রথমেই আমরা ধরে নিলাম স্বামীর শোকে ওই গৃহবধূ পাগল হয়ে গেছেন। সত্যি-মিথ্যের মধ্যে আর তফাৎ করতে পারছেন না। এই ধরে নেওয়াটা আমার বিরাট একটা ভুল ছিল।'

তপস্বিনী করুণার চোখে একটা পুরোনো আগুন দপ করে জ্বলে উঠে আবার নিবে গেল।

‘আমাদেরও তো এখানে আর কোনও কাজ নেই। আমাদেরই বা এখানে বসিয়ে রেখেছেন কেন?' তপস্বিনী করুণা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর সজল নন্দী বিরক্ত গলায় বলল।

‘আপনারা তো ব্ল্যাকমেলিং-এর চার্জ থেকে ছাড়া পাচ্ছেন না। সেই আবার গিয়ে লক-আপেই তো ঢুকবেন। এত তাড়া কীসের? তবু যখন জিজ্ঞেস করলেন, জানিয়ে রাখি কেন আপনাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। দেখুন সজলবাবু, উকিল হিসেবে আপনার রেপিউটেশন ভাল ছিল না। নানারকম অনৈতিক এবং বেআইনি কাজের সঙ্গে আপনি যুক্ত ছিলেন। আপনার ওকালতির লাইসেন্সটা হয়ত অনেক আগেই বাতিল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওটা যে শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়েছিল তার পেছনে পরিষ্কারভাবে অসীমাভ রায়ের হাত ছিল। এইটুকু জানানোর জন্যেই আপনাকে বসিয়ে রেখেছিলাম।'

‘আর আমরা কেন এখনও বসে আছি?' প্রণব মাইতি উদ্ধত গলায় বললেন। ‘আপনারাও এখনি ছাড়া পাচ্ছেন না। আপনাদের বিরুদ্ধে তো শুধু ইনশিয়োরেন্স ফ্রডের চার্জ নেই, আরও অনেক গুরুতর ড্রাগ ট্র্যাফিকিং-এর চার্জ রয়েছে। সেই চার্জে আপনাদের আবার গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

‘আমাকেও ড্রাগ ট্র্যাফিকিং-এর চার্জে গ্রেপ্তার করা হবে? আমি কিন্তু এসবের বিন্দুবিসর্গ জানতাম না।' পল্লব সেন অসহায়ভাবে বললেন।

‘হয়ত আপনি সত্যি কথা বলছেন। কিন্তু আপনি দুর্জনের অসদুপায়ে অর্জন করা অর্থ ভোগ করেছেন। এত সহজে আপনি ছাড়া পাবেন না। কিছু শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। আপনার দাদার মৃত্যুর পর যখন আপনাদের ব্যবসা পুরোপুরি প্রণব মাইতির হাতে চলে গেল আপনার একবারও মনে হল না ব্যবসাটা কীভাবে চলছে? আপনার বিলাসবহুল জীবনযাপনের টাকাটা আসছে কোথা থেকে? পল্লববাবু আপনি তো বোকা লোক নন। আপনি কখনও কখনও নিশ্চয় টের পেয়েছিলেন ব্যবসাটা ঠিক পথে চলছে না। আপনি ইচ্ছে করেই চোখ বন্ধ করে ছিলেন। কারণ সেটাই আপনার পক্ষে সুবিধেজনক ছিল। পুলিশ আপনাকে সহজে ছাড়বে না, পল্লববাবু।

পল্লব সেন মাথা নিচু করে আছেন।

‘সত্যিটা হল, আপনার ব্যবসাটা যে সৎ পথে চলছে না এটা আপনি জানতেন।

আর জানতেন বলেই আমরা কৃষ্ণনগর যাবার আগে আমাদের আসল পরিচয় আপনি প্রণব মাইতিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। না হলে প্রণব নন্দীর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না আমরা নকল পরিচয় দিচ্ছি। যে প্রণব নন্দী শুভব্রত সাহার ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে গিয়ে এতটাই ঝুলিয়ে দিল, সেই লোকটাই আমাদের দেখা মাত্র বুঝে ফেলল আমরা যা বলছি আসলে আমরা তা নই, এটা বিশ্বাস করা শক্ত। আমি যে আপনাকে বলেছিলাম আমরা ছদ্ম-পরিচয়ে যাব, আসলে সেটা একটা ফাঁদ। আপনি কতটা ইনোসেন্ট সেটা বোঝার জন্য।'

‘কিন্তু একটা সমস্যা তো রয়েই গেল। আমরা তো এখনও জানতে পারলাম না দুবে লোকটা কে?' সুভদ্র বলল।

‘দুবে কে আমরা জানতে পেরেছি তো। তাকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছে। তুমিই তো কাল ফোন করে আমাকে খবরটা দিলে।'

'আমি খবর দিলাম? আপনি শুধু জেনে দিতে বলেছিলেন আপনি যে লোকটাকে অ্যারেস্ট করতে বলেছিলেন পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছে কিনা। আমি আপনাকে জানিয়েছিলাম, হ্যাঁ, লোকটা অ্যারেস্টেড হয়েছে। আমি সেইটুকুই জানি এর বেশি আর কিচ্ছু জানি না।'

'গৌতম কিন্তু সব জানে।' আদিত্য মিটিমিটি হাসছে। 'দুবে তোমার চেনা লোক, সুভদ্র। লোকটা অত্যন্ত বিপদজনক। গৌতম বলল গ্রেপ্তার হবার আগে ও দুজন পুলিশকে ভাল মতো জখম করেছে। তুমি কি আন্দাজ করতে পারছ লোকটা কে?'

সুভদ্র হতভম্ভ মুখ করে বসে আছে।

'আচ্ছা প্রণববাবু আপনি তো সেন বেকারির আসল ব্যবসার ব্যাপারটা সবই জানতেন। কী করতে হবে সে ব্যাপারে কি আপনার কাছে ওপর থেকে নির্দেশ আসত?'

প্রণব মাইতি মুখ টিপে বসে আছে।

'আপনি বলবেন না, তাই না? ঠিক আছে আপনার হয়ে আমি বলে দিচ্ছি। কোনও অদৃশ্য কর্তৃপক্ষের থেকে আপনার কাছে নির্দেশ আসত। কী করতে হবে, কীভাবে চলতে হবে। কে নির্দেশ দিচ্ছে আপনি জানতেন না। কিন্তু যে নির্দেশ দিচ্ছে সে আপনার খুঁটিনাটি কাজের খবর রাখত। তার নির্দেশে আপনি শুভব্রত সাহার খুনটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তারই নির্দেশে আপনি দু-দু'টো কারখানায় আগুন লাগিয়েছিলেন যাতে কোথাও কোনও হেরোইনের ট্রেস না থাকে। তারই নির্দেশে আপনি গেস্ট হাউসে আগুন লাগিয়েছিলেন যাতে আমরা দু'জন পুড়ে মরে যাই। আপনার পাশে বসেই লোকটা কাজ করত। আপনার ওপর সারাদিন নজর রাখত । কিন্তু আপনি ঘূণাক্ষরেও টের পাননি যে আপনার সেক্রেটারি তমাল বিশ্বাসই আসলে আপনার অদৃশ্য বস ড্রাগ মাফিয়া দুবে।'

ঘরে অখণ্ড নীরবতা। প্রণব মাইতির মুখে যতটা না গ্লানি তার থেকে ঢের বেশি বিস্ময়।

'শুভব্রত সাহা কেন খুন হয়েছিল জানেন? শুভব্রত তমাল বিশ্বাসের আসল পরিচয়টা কোনও ভাবে জেনে ফেলেছিল। আসলে তমাল বিশ্বাসের একটা অত্যন্ত বিলাসবহুল নাইট-লাইফ ছিল। অত টাকা রোজগার করলে খরচা করতে হবে তো। সেটাই শুভব্রতর চোখে পড়ে গিয়েছিল। কাছেই থাকত বলে হয়ত। আপনার ওপর নির্দেশ এল শুভব্রতর কেসটা ধামাচাপা দিতে। আপনি কাজটা ভাল ভাবে করতে পারলেন না। একদিকে রটিয়ে দিলেন শুভব্রত টাকা চুরি করে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তাই আত্মহত্যা করেছে। অন্য দিকে তার স্ত্রীর মুখ বন্ধ করার জন্যে তাকে কম্পানি থেকে অনেকগুলো টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললেন। একবারও ভেবে দেখলেন না দুটো পরস্পর বিরোধী। টাকা চুরি করে আত্মহত্যা করলে কোনও কম্পানিই কমপেনসেশন দেয় না। দুবে বুঝতে পারল আমি সন্দেহ করছি। তাই সে অন্য একটা গল্প ফাঁদল। এক পুরুষের জীবনে দুই নারীর সাবেক গল্প। সুভদ্র খোঁজ নিয়ে জানল গল্পটা সত্যি হলেও হতে পারে। দুবে সুভদ্রকে আর আমাকে গেস্ট হাউসে আগুন লাগিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। মরে গেলে ল্যাঠা চুকেই যেত। কিন্তু যদি বেঁচে যাই সেই সম্ভাবনাটার কথা ভেবে দুবে আমাদের ওই গল্পটা বলেছিল। তার দুর্ভাগ্য আমরা বেঁচেও গেলাম, গল্পটাও বিশ্বাস করলাম না।'

কিছুক্ষণ পরে যখন গৌতমের ঘরে গৌতম, আদিত্য আর সুভদ্র ছাড়া অন্য সবাই বেরিয়ে গেছে, সুভদ্র বলল, 'আদিত্যদা আপনি তো সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে দিলেন, কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর এখনও পেলাম না। প্রশ্নটা এতই ডেলিকেট যে বাইরের লোকের সামনে করতেও পারছিলাম না। প্রশ্নটা হল, অশনিকে দোষী প্রতিপন্ন করার জন্য কে পুলিশকে এত চাপ দিচ্ছিল? চাপ যে দিচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমি নিজে সেই চাপ অনুভব করেছি।'

'হ্যাঁ, চাপ একটা অবশ্যই ছিল এবং আমার ধারণা সেটা আসছিল কোনও পলিটিশিয়ান মারফত দুবের দল-এর কাছ থেকে। সত্যিটা এই যে দুবে ধরে নিয়েছিল পার্থ মিত্রর খুনটা তার রাইভাল গ্যাং ইসমাইলের

দলের কাজ। অসীমাভ রায়ের কথাটা তার মাথাতে আসেনি। এখন খুনের তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ যদি জেনে যায় পার্থর সঙ্গে ড্রাগ মাফিয়াদের যোগ আছে এবং সেই ড্রাগ মাফিয়ারা সেন বেকারির মধ্যে দিয়ে অপরেট করে তা হলে দুবের সমূহ বিপদ। তাই সে যতটা পারে কেসটাকে অন্য দিকে অর্থাৎ অশনির বিরুদ্ধে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। একই কারণে তার লোক সল্ট অ্যান্ড পেপার-এর মালকিন মালা সরকারকে ভয় দেখাচ্ছিল। এবং একই কারণে গ্লোবাল ট্রেডিং-এর ব্যালেন্স শিট জোগাড় করাটাও তোমাদের পক্ষে এত শক্ত হয়ে গিয়েছিল।'

'আচ্ছা এই এত কাণ্ড ঘটে গেল। এর মধ্যে ইসমাইলের দলটা কি একেবারে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসেছিল? তারা কি কিছুই করছিল না?' গৌতম জিজ্ঞেস করল। 'করছিল। তাদের মতো করে করছিল। দুবের দলের একটা পাঁউরুটি ভর্তি ট্রাক তারা একবার লুট করেছিল। বলাই বাহুল্য, পাঁউরুটির মধ্যে হেরোইনের প্যাকেট ভর্তি ছিল। পরে দুবে খুব সাবধান হয়ে গিয়ে পাহারাদার বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এছাড়াও তাদের আরও কীর্তি আছে। আমি অচেনা একটা মেয়ের কাছ থেকে একটা ফোন পেলাম। সে বলল তার নাম মিতা অধিকারী। সে গ্লোবাল ট্রেডিং-এ কাজ করে, অশনিকে চেনে, অশনির বান্ধবীকেও দেখেছে। দুজনে একসঙ্গে তাদের দোকানে নাকি শাড়ী কিনতে এসেছিল। মেয়েটা অবশ্য জনত না অশনি রূপলেখাকে কখনও কোনও দামী উপহার দেয়নি। যাই হোক, মেয়েটা বলল, অশনির সেই রহস্যময়ী বান্ধবীকে আজকাল নাকি গ্লোবাল ট্রেডিং-এর মালিক মুকেশ ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। মিতা অধিকারী কলকাতায় তাদের একসঙ্গে দেখেছে। আমি গ্লোবাল ট্রেডিং-এ খোঁজ নিয়ে জানলাম মিতা অধিকারী বলে তাদের একজন কর্মচারী আছে বটে কিন্তু সে দু'বছর হল কলকাতায় আসেনি। অর্থাৎ যে মেয়েটা আমাকে ফোন করেছিল সে ভুয়ো। কেন একজন এত কষ্ট করে নাম ভাঁড়িয়ে আমাকে ফোন করবে? এতে তার লাভ কী? একটু ভাবতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। মেয়েটি গ্লোবাল ট্রেডিং-এর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিল। যেন বলতে চাইছিল গ্লোবাল ট্রেডিং-এর কার্যকলাপগুলো ভাল করে তদন্ত করে দেখা দরকার। ইসমাইলের গ্যাং ছাড়া আর কে এরকম চাইতে পারে? আমি বুঝতে পারলাম ওই মেয়েটি আসলে ইসমাইলের দলের।'

'একটা জিনিস কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। রূপলেখার মোবাইলটা মৃত্তিকার ফ্ল্যাটে গেল কী করে?' গৌতম জিজ্ঞেস করল।

'এটা বেশ শক্ত প্রশ্ন। তবে উত্তরটা সুভদ্র আর আমি তদন্ত করে বার করেছি। এক কথায় উত্তর হল, ওটা খুনের রাত্তিরে মৃত্তিকার ফ্ল্যাটে ছিলই না। ব্যাপারটা এই রকম। খুনের রাত্তিরে অশনির গাড়িটা মৃত্তিকার ফ্ল্যাটের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। রাস্তার সিসি ক্যামেরায় ওটার ছবি ধরা পড়ে। সেই সূত্র ধরে পুলিশ অশনির কাছে আসে এবং তার মোবাইলটা কব্জা করে। দেখা যায় ওই মোবাইলটা থেকে অশনি রূপলেখার মোবাইলে বারবার কল করেছে। ইতিমধ্যে কিন্তু দুবে টাকা-পয়সা দিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে পুলিশের একটা অংশকে কিনে ফেলেছে। সুভদ্রকে তদন্ত থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। তার বদলে এমন কাউকে তদন্তের ভার দেওয়া হল যে দুবের কথা শুনে চলবে।

'রূপলেখার মোবাইল কিন্তু তখনও খোলা রয়েছে, কারণ সে মৃত্তিকা-পার্থর খুন হওয়ার কথা কাগজে পড়লেও এর সঙ্গে অশনি যে জড়িয়ে পড়েছে সে কথা তখনও জানে না। দুবের কথা শুনে চলা পুলিশ রূপলেখার মোবাইল ট্রেস করে তার বাড়ি পৌঁছে গেল। রূপলেখার মনে পাপ, সে পুলিশ দেখেই পেছনের দরজা দিয়ে পালাল। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে মোবাইলটা ফেলে গেল। পুলিশ মোবাইলটা নিয়ে এল। পরে দুবের নির্দেশ মতো সেই পুলিশ রূপলেখার মোবাইলটা মৃত্তিকার বাড়িতে লুকিয়ে রেখে আসে এবং কিছুদিন পরে নিজেই খুঁজে বার করে। বলাই বাহুল্য, অশনিকে ভাল মতো ফাঁসানোর জন্যে এটা করা হয়।

'আরও একটা প্রশ্ন, আদিত্যদা। অসীমাভ রায় যদি সাধু বিকাশকে দিয়েই ছবিগুলো উদ্ধার করবে ঠিক করে থাকে, তা হলে সে ব্ল্যাকমেলের ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য নিতে গেল কেন ?

‘নিতে গেল তার কারণ সে জানত না সাধু বিকাশ কত তাড়াতাড়ি ছবিগুলোর হদিশ করতে পারবে। অথচ খুব তাড়াতাড়ি ব্ল্যাকমেলারকে আটকানো দরকার ছিল। তার জন্য পুলিশের সাহায্য ছাড়া উপায় কী?'

আদিত্য থামল। একটু থেমে বলল, ‘এবার বাড়ি যাই। একে দেরি হল, তার ওপর মোবাইলটাও বন্ধ রেখেছিলাম। কেয়ার কাছে আজ প্রচণ্ড ঝাড় খেতে হবে।' ‘ঠিক আছে, আয়। আমি যথাস্থানে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। ড্রাগ-মাফিয়াদের কেসটা সভ্ করার জন্য ওই ট্রাস্টের কাছ থেকে তোর প্রাপ্য টাকাটা খুব শিগগির পেয়ে যাবি। তবে অসীমাভ রায়ের কাছ থেকে তোর পারিশ্রমিকটা বোধহয় মার গেল।' ‘আমি কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী অশনি রায়কে নির্দোষ প্রমাণ করে দিয়েছি। টাকাটা আমাকে দিয়ে দেওয়া উচিত।' আদিত্য একটু হেসে হাত নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আদিত্যর এখনও ধূমপানের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ মেটেনি। বৃষ্টি-বাদলার দিনে কিংবা গুরুভোজনের পর কিংবা গভীরভাবে কিছু চিন্তা করার সময় তার সিগারেট খাবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে। কেয়ার কথা ভেবে সে ইচ্ছেটা দমন করে। সে জানে সে ছাড়া সত্যিই কেয়ার আর কেউ নেই। এটা ভাবলে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি তার একটা দায়িত্ব চলে আসে। এমনিতেই তার পেশায় যথেষ্ট শারীরিক ঝুঁকি আছে। সিগারেট খেয়ে সেই ঝুঁকিটা বাড়াবার কোনও মানে হয় না ।

আদিত্যর অবচেতনে ধূমপানের ইচ্ছেটা আরও প্রবলভাবে থেকে গেছে। তার প্রমাণ আদিত্য এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখে সে সিগারেট খাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেই সে শিউরে ওঠে। ভাবে, তাহলে তো আমি সিগারেট ছাড়িনি। ওই তো আমি সিগারেট খাচ্ছি। আর সেই গ্লানি বোধে ঘুমটা ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে গেলে বুঝতে পারে আসলে সে সিগারেট ধরেনি। ওটা স্বপ্ন ছিল।

মৃত্তিকার মৃত্যুরহস্য কী ভাবে উদ্ঘাটিত হল সেই গল্প কেয়াকে শোনানোর পর আদিত্য বলছিল, 'দ্যাখো, সিগারেট খাওয়ারও কিছু ভাল দিক আছে। আমি যদি সিগারেট না খেতাম তা হলে হার্টকেয়ারে ভর্তি হতে হত না। আর হার্টকেয়ারে ভর্তি হতে না হলে সেখানে বকেয়া বিল মেটাতেও যেতাম না। আর বকেয়া বিল মেটাতে না গেলে যাজ্ঞসেনী মল্লিকের সঙ্গে দেখাই হতো না। আর যাজ্ঞসেনী মল্লিকের সঙ্গে দেখা না হলে মৃত্তিকার মৃত্যুরহস্যও সমাধান করতে পারতাম না।'

‘তুমি কি আবার সিগারেট খাবার ধান্দা করছ নাকি?' কেয়া সন্দেহের গলায় বলল । ‘আবার যদি সিগারেট ধরো আমি আমাদের স্কুলের বারান্দা থেকে নিচে ঝাঁপ দেব। এটা যেন মনে থাকে।

‘না, না। মজা করছিলাম। সিগারেট না খেতে পারলে এখনও মাঝে মাঝে কষ্ট হয় ঠিকই, কিন্তু তোমাকে কষ্ট দেবার কষ্ট তার থেকে অনেক বেশি।' আদিত্য নিরীহভাবে হাসল। তারপর কেয়ার হাতে নিজের হাতটা ছোঁয়াল।

না। আদিত্য বাস্তবে আর কোনও দিন সিগারেট খাবে না। শুধু স্বপ্নে দু’একটা খেয়ে ফেলতে পারে। ওটার ওপর তো তার হাত নেই।

—

সমাপ্ত